প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারী ১৯৬০

প্রচ্ছদ প্রবীর সেন

স্বপ্নদীপের পক্ষে মিতা সাহা কর্তৃক ৭/ই. শীতলা লেন কলকাতা-৫ থেকে
প্রকাশিত এবং জি. এস. এস. প্রিন্টার্সের পক্ষে সত্য নারায়ণ পাল
কর্তৃক ৮ অমর বসু সরণী কলকাতা-৭ থেকে মুদ্রিত।

১

অনুতাপের তিক্তফল সবাইকে কখনো না কখনো ভোগ করতে হয়, কিন্তু অন্যেরা যখন কুকর্মের জন্যে অনুতাপ করে তখন দারোগা কৃষ্ণচন্দ্র নিজের ভালোমানষির জন্যে পস্তাচ্ছিলেন। পঁচিশ বছর ধরে থানার দারোগাগিরি করছেন—কোনদিন অসৎ পথে পা বাড়ান নি। যৌবনকালেও তিনি ভোগ-বিলাসের পথে না গিয়ে নিঃস্পৃহ ভাবে নিজের কর্তব্যপালন করেছেন। কিন্তু এতদিন পরে আজ নিজের সরলতা ও বিবেকের জন্যে আফশোস করছিলেন। তাঁর স্ত্রী গঙ্গাজলী সতীসাধ্বী স্ত্রী। সে সর্বদা স্বামীকে অসৎপথ থেকে টেনে রাখত। এ সময় সেও চিন্তায় ডুবে ছিল। তার মনে হচ্ছিল যে আজীবন এই সচ্চরিত্রতার বুঝি কোন দাম নেই।

দারোগা কৃষ্ণচন্দ্র রসিক, উদার আর সজ্জন। অধীন কর্মচারিদের সঙ্গে তিনি নিজের ভাইয়ের মত ব্যবহার করতেন। কিন্তু তাদের কাছে এ ভালবাসার কোন দাম ছিল না। তারা বলতো যে পেটই যদি না ভরলো তো এই ভালো ব্যবহার নিয়ে কি করবো—চাটবো? কড়া কথা, গাল মন্দ, কঠিন কাজ সবই সইতে রাজী আছি কিন্তু পেট ভরা চাই। শুকনো রুটি রুপোর থালায় করে পরিবেশন করলেই তো আর লুচি হয়ে যায় না।

দারোগাজীর বড় সাহেবও তাঁর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। অন্য থানায় গেলে তাঁর বড় আদর যত্ন হত; তাঁর পেসকার, মুহুরী, আর্দালী সকলেরই ভূরিভোজন হত। পেস্কার মুহুরীর নজরানা মিলত, আর্দালী বখশিস পেত আর বড়সাহেবরাও নিত্য ডালি পেতেন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের থানায় এমন আদর অভ্যর্থনা কোথায়? তিনি ভোজ্য বা ডালি কিছুই দিতেন না। যে নিজে নেয় না সে দেবে কোথা থেকে? দারোগা কৃষ্ণচন্দ্রের এই শুষ্কতাকে লোকে অহঙ্কার বলে মনে করত।

এত নির্লোভ হলেও দারোগাজী কিন্তু ব্যয়কুণ্ঠ স্বভাবের ছিলেন না। তিনি নিজে বিলাসী ছিলেন না বটে কিন্তু পরিবারের সকলকে স্বচ্ছন্দে রাখা নিজের কর্তব্য মনে করতেন। তিনি নিজে ছাড়া ঘরে ছিল তিনটি প্রাণী—স্ত্রী আর দুই মেয়ে। মেয়েদের তিনি প্রাণের চেয়েও ভালবাসতেন। তাদের জন্যে শহর থেকে ভালো ভালো জামাকাপড় আর নানারকম জিনিষ প্রায়ই আনাতেন। বাজারে নতুন ফ্যাশানের কাপড় দেখতে পেলে তিনি ধৈর্য ধরতে পারতেন না, মেয়েদের জন্যে কিনে ফেলতেন। ঘরে জিনিষ জড়ো করার বাতিক ছিল তাঁর।

সারা বাড়ী টেবিল চেয়ার আলমারিতে ঠাসা। দামী পাথরের কলমদান, ঝান্সীর কার্পেট, আগ্রার সতরঞ্চি নজরে পড়লেই তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন। লুটের ধন পাবার জন্যেও কেউ এতো ব্যগ্র হয় না। মেয়েদের লেখাপড়া আর সেলাই শেখাবার জন্যে এক মেমসাহেবকে রেখেছিলেন। নিজেও মাঝে মাঝে তাদের পরীক্ষা নিতেন।

গঙ্গাজলী ছিল বুদ্ধিমতী স্ত্রী। সে একটু হাত টেনে খরচ করবার পরামর্শ দিত। জীবনে আর কিছুও যদি না করতে হয় মেয়েদের বিয়ে তো দিতেই হবে। তখন কার কাছে হাত পেতে ঘুরবে? এখন তো ওদের মলমলের জুতো পরাচ্ছ, পরে কি হাল হবে তা ভেবে দেখেছ? দারোগাবাবু এসব কথা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলতেন যে ভাবে সব চলছে ওটাও সেইভাবেই হয়ে যাবে। কখনো বা রাগ করে বলতেন, এ সব কথা বলে আমার চিন্তা বাড়িয়ো না।

এই ভাবেই দিন কাটছিল। মেয়েদুটো যেন পদ্মফুলের মতো ফুটে উঠতে লাগল। বড় মেয়ে সুমন সুন্দর, চঞ্চল আর অভিমানিনী। ছোট মেয়ে শান্তা সরল, গম্ভীর ও শান্ত। সুমন সকলের ওপর টেক্কা দিতে চাইত। দুই বোনের জন্যে বাজার থেকে একই রকম শাড়ি এলে তার মুখ ভার হত। শান্তা যা পায় তাতেই খুশী।

গঙ্গাজলী সেকালের মতো শীঘ্র কন্যাদায় মুক্ত হতে চাইত। কিন্তু দারোগাবাবু বলতেন, এরা এখনো বিয়ের যোগ্য হয়নি। শাস্ত্রে লেখে যে ষোল বছর বয়েসের আগে মেয়েদের বিয়ে দিলে পাপ হয়। এইভাবে মনকে বুঝিয়ে তিনি এড়িয়ে যেতেন। সংবাদপত্রে পণপ্রথার বিরুদ্ধে বড় বড় প্রবন্ধ পড়ে তিনি খুব খুশী হতেন। গঙ্গাজলীকে বলতেন যে দু' এক বছরের মধ্যেই এই কুপ্রথা উঠে যাবে। ভাবনার কোন দরকার নেই। এই ভাবেই সুমন ষোল বছরে পা দিল।

কৃষ্ণচন্দ্র দেখলেন যে আর এড়িয়ে যাওয়া চলে না। সামর্থ থাকার ফলে যে নিশ্চিন্ততা আসে সেটা তাঁর ছিল না। তিনি পূর্বাপর বিবেচনা করতে পারতেন না। দারোগাবাবুর অবস্থা হল সেই পথিকের মতো যে সারাদিন গাছতলায় ঘুমিয়ে উঠে সামনে উঁচু পাহাড় দেখে ঘাবড়ে যায়। পাত্রের খোঁজে ছুটোছুটি শুরু হল, কয়েকটি পাত্রের কোষ্ঠীও জোগাড় করলেন। তিনি চাইছিলেন শিক্ষিত পরিবার। তিনি ভাবতেন যে এমন ঘরে পণের কথাই উঠবে না কিন্তু তিনি আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে বরের মূল্য শিক্ষার অনুপাতে চড়ে। রাশি, বর্ণ মিলে যাবার পর যখন লেনদেনের প্রশ্ন উঠত তখন কৃষ্ণচন্দ্র চোখে অন্ধকার দেখতেন। কেউ চার হাজার শোনাতেন, কেউ পাঁচ হাজার, কেউবা তারও বেশী। বেচারী নিরাশ হয়ে ফিরতেন, আজ দু-মাস ধরে দুশ্চিন্তায় কাটাচ্ছেন, দিশেহারা অবস্থা। শিক্ষিত সজ্জন নিঃসন্দেহে তাঁকে সহানুভূতি জানাতেন কিন্তু এমন ছুতো দেখাতেন যে দারোগাবাবুকে নিরুত্তর হতে হত। এক ভদ্রলোক বললেন

—মশাই, আমি স্বয়ং এই কুপ্রথার ঘোর বিরোধী, কিন্তু কি করি, এই গত বছর মেয়ের বিয়ে দিলাম, দু' হাজার শুধু বরপণই দিতে হল, খাওয়া দাওয়াতে আরো দু' হাজার ; এখন আপনিই বলুন কি করে এই ক্ষতি সামলাই।

অন্য ভদ্রলোকটি এঁর চেয়েও বেশি ন্যায়পরায়ণ, তিনি বললেন—দারোগাবাবু, আমি ছেলেকে বড় করেছি তার লেখাপড়ার জন্যে হাজার হাজার টাকা খরচ করেছি। এর ফলে আমার ছেলের যা লাভ হবে আপনার মেয়েও তো তার ভাগীদার হবে। তা আপনিই বলুন এর সমস্ত ভার একলা আমার ঘাড়ে পড়ে কেন ?

কৃষ্ণচন্দ্রের নিজের সাধুতার জন্যে অনুতাপ হল। সৎপথে থাকার অহংকার ধুলোয় মিশে গেল, তিনি ভাবছিলেন যদি পাপের ভয় না করতাম তো আজকে আমায় এমন ঘা খেতে হত না। স্বামী স্ত্রী দুজনেই চিন্তায় দিশেহারা। অনেক পরে কৃষ্ণচন্দ্র বললেন—সংসারে সৎপথে থাকার ফল দেখা গেল। যদি আজ আমি লুট করে ঘর ভরিয়ে রাখতাম তবে লোকে আমার সঙ্গে কুটুম্বিতা করা নিজের সৌভাগ্য মনে করত ; আর তা করিনি বলে লোকে মুখ তুলে কথা বলতে চায় না। ভগবানের দরবারে এটাই ন্যায়। এখন উপায় মাত্র দুটি—হয় সুমনকে কোন গরীবের হাতে দিতে হবে, আর না হয় সোনার পাখী ধরতে হবে। প্রথমটা তো করা যাবে না, তাই সোনার পাখীর খোঁজে লেগে পড়ি। ধর্মের ফল পেয়েছি, সৎপথে থাকার ফলও দেখলাম। এবার থেকে লোকের উপর অত্যাচার চালাব, প্রচুর ঘুষ নেব, এই শেষ উপায়। সংসার তো এই চায় হয়তো ঈশ্বরও তাই চান। তাই সই, আজ থেকে অন্য সকলে যা করে আমিও তাই করবো।

গঙ্গাজলী মাথা নিচু করে স্বামীর কথা শুনে দুঃখ পাচ্ছিল। তার চোখে জল।

২

দারোগার এলাকায় এক মোহন্ত রামদাস থাকতেন। সাধুদের এক গদীর মোহন্ত। তাঁদের সব কারবার 'শ্রীবাঁকে বিহারীজী' বিগ্রহের নামে হত। 'শ্রীবাঁকে বিহারীজী' লেনদেনের ব্যবসা করতেন আর শতকরা ৩২টাকার কম সুদ নিতেন না। তিনি খাজনা আদায় করতেন ; বন্ধকী দলিলপত্র লেখাতেন। তাঁর প্রাপ্য না দেবার সাহস কারও হত না বা নিজের প্রাপ্য পাবার জন্যে তাঁর ওপর জোর খাটানো যেত না। 'শ্রীবাঁকে বিহারীজী' রুষ্ট হলে সেই এলাকায় বাস করা কঠিন হত। মোহন্ত রামদাসের আস্তানায় দশ-বিশ জন মোটা তাজা

সাধু স্থায়ীভাবে থাকত। তারা আখড়ায় ডন-বৈঠক করত, মোষের টাটকা দুধ খেত, সন্ধ্যায় ভাঙ দুধ দিয়ে পিষত আর গাঁজা চরসের কলকে কখনো ঠাণ্ডা হতে পেত না। এমন বলবান গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মাথা তোলবার সাহস কার?

সরকারী বড়মহলে মোহন্তজীর খুব আদর ছিল। 'শ্রীবাঁকে বিহারীজী' তাঁদের প্রচুর মোতিচুরের লাড্ডু আর মোহনভোগ খাওয়াতেন। তাঁর প্রসাদ নিতে অস্বীকার করবার সাহস কার? ঠাকুর সংসারে এসে সাংসারিক রীতি মেনেই চলতেন।

মোহন্ত রামদাস যখন নিজের জমিদারী পরিদর্শনে বের হতেন তখন তাঁর মিছিল রাজকীয় ঠাটবাটের সঙ্গে চলত। সব চেয়ে আগে হাতীর পিঠে 'শ্রীবাঁকে বিহারীজী' সওয়ার হতেন, তার পিছনেই পালকীতে মোহন্তজী থাকতেন। তারপর ঘোড়ার পিঠে সাধু সেনা হাতে রামনামের ঝাণ্ডায়—বিচিত্র শোভা হত। উটের পিঠে জিনিষপত্র, তাঁবু, সামিয়ানা চাপানো হত। এ দল যে গ্রামে গিয়ে থাকত, সেখানকার লোকেদের ওপর দুর্ভাগ্যের বোঝা নামত।

এ বছর মোহন্ত তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছিলেন। ফিরে এসে এক বিরাট যজ্ঞ করেন। যজ্ঞকুণ্ড একমাস ধরে জ্বলল, কয়েকমাস কড়া উনুন থেকে নামল না, পুরো দশ হাজার মহাত্মা নিমন্ত্রিত ছিলেন। এই যজ্ঞের জন্যে এলাকার প্রত্যেক প্রজার হাল পিছু পাঁচ টাকা করে চাঁদা ধার্য হয়েছিল। কেউ সানন্দে দিল, কেউ ধার করে দিল। যার ছিল না তাকে হাতচিঠায় সই করতে হল। 'শ্রীবাঁকে বিহারীজী'র আজ্ঞা অমান্য করার সাহস কার? তবে ঠাকুরজীকে হার মানতে হল এক গোয়ালার কাছে, যার নাম চৈতু। একে গরীব তায় বুড়ো। ক'বছর ধরে তার ফসল নষ্ট হয়েছিল। কিছুদিন আগেই 'শ্রীবাঁকে বিহারীজী' খাজনা বৃদ্ধির নালিশ ঠুকে তার ঋণের বোঝা বাড়িয়ে দিয়েছেন। সে চাঁদা দিতে অস্বীকার করল, এমন কি হাতচিঠাও লিখল না। ঠাকুরজী কি এমন বিদ্রোহীকে ক্ষমা করতে পারেন? একদিন কয়েকজন সাধু তাকে ধরে নিয়ে এল। ঠাকুরের দরজার সামনে তার ওপর প্রহার পড়তে লাগল। চৈতুও রেগে গেল। হাত বাঁধা ছিল বলে মুখেই সে লাথি ঘুষির জবাব দিতে লাগল। আর কথা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত চুপ করল না। এত কষ্ট দিয়েও ঠাকুরজী সন্তুষ্ট হলেন না, সেই রাতে তার প্রাণও হরণ করলেন। সকালেই চৌকিদার থানায় এত্তেলা দিল।

দারোগা কৃষ্ণচন্দ্রের মনে হল যেন ঈশ্বর আগ বাড়িয়ে তার হাতে সোনার পাখী তুলে দিলেন, তদন্ত করতে চললেন।

কিন্তু ঐ এলাকার মোহন্তের প্রভাব এত বেশি যে দারোগাবাবুর সাক্ষী মিলল না। লোকে চুপিচুপি এসে সব বৃত্তান্ত শুনিয়ে যায় কিন্তু বিবৃতি দিতে লেখাপড়ার মধ্যে যেতে চায়না।

এইভাবে তিন চার দিন কেটে গেল। মোহন্ত প্রথমে তো গ্যাঁট হয়ে বসেছিলেন। ব্যাপারটা প্রকাশ হবে না ভেবে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু

যখন তিনি জানতে পারলেন যে দারোগা কয়েকজন ভাগিয়ে নিয়েছে তখন কিছুটা নরম হলেন। নিজের মোক্তারকে দারোগার কাছে পাঠালেন। কুবেরের শরণ নিলেন, লেনদেনের কথা চলতে লাগল। কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, আপনারা জানেন তো আমি ঘুষকে কালো সাপ বলে মনে করি। মোক্তার বললে, তা তো জানি কিন্তু সাধুসন্তের উপর তো কৃপা করা উচিত। এরপর দুজনের কথা চাপা গলায় চললো, মোক্তার বললে, না হুজুর, পাঁচ হাজার বড় বেশী। মোহন্তজীকে তো আপনি চেনেন। যদি উনি জিদ ধরেন তবে যদি ফাঁসীও হয়ে যায় তবু তিলমাত্র নড়বেন না। এমন করুন যাতে তাঁর কষ্ট না হয় আর আপনারও কাজ উদ্ধার হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তিন হাজারে কথা পাকা হল।

কিন্তু কড়া ওষুধ কিনে আনা, আর তার আরক তৈরী করে সেটা খাওয়ার মধ্যে পার্থক্য অনেক। মোক্তার তো মোহন্তের কাছে গেল আর কৃষ্ণচন্দ্র ভাবতে লাগলেন। এ আমি কি করতে যাচ্ছি?

একদিকে ছিল অঢেল টাকা আর চিন্তা ব্যাধির হাত থেকে মুক্তির আশা, অন্যদিকে আত্মার সর্বনাশ আর পরিণামের ভয়। হ্যাঁ না কিছুই স্থির করতে পারছিলেন না।

আজন্ম নির্লোভ থাকার পর এখন আত্মাকে বলি দিতে দারোগাবাবুর বেশ দুঃখ হচ্ছিল। তিনি ভাবছিলেন যে এই যদি করতে হল তবে পঁচিশ বছর আগে কেন করলাম না, তা হলে আজ সোনার দেওয়াল তৈরী হয়ে যেত। জমিদারি কিনতে পারতাম। এতদিন ত্যাগের আনন্দ লাভের পর বুড়ো বয়সে এই কলঙ্ক। কিন্তু মন বলছিল, এতে তোমার কি দোষ? তুমি যতদিন পেরেছ ততদিন তো ঠিক পথেই চলেছ। ভোগ বিলাসের জন্যে তো অধর্ম করনি, কিন্তু যখন দেশ, কাল, প্রথা আর তোমার বন্ধুদের লোভ তোমাকে কুপথে টেনে নিয়ে যায়, তখন তোমার কি দোষ? তোমার আত্মা তো এখনও পবিত্র। তুমি ঈশ্বরের সামনে এখনও নিরপরাধ। এই সব তর্ক করে দারোগাবাবু নিজের মনকে সান্ত্বনা দিলেন।

কিন্তু পরিণামের ভয় তাঁর গেল না। আগে তো কখনো ঘুষ নেন নি তাই সাহসে কুলোচ্ছিল না। যে কখনো কারো গায়ে হাত তোলে নি সে একেবারে তরোয়াল নিয়ে আক্রমণ করতে পারে না। জানাজানি হলে নির্ঘাত জেল, সব সুনাম ধুলোয় মিশে যাবে, বিবেক তর্কে হার মানতে পারে কিন্তু পরিণামের ভয়টা তর্কে যায়না, সেটা আড়াল খোঁজে। দারোগাবাবু ব্যাপারটা যথাসম্ভব গোপন রাখলেন। মোক্তারকে সতর্ক করে বললেন যে ব্যাপারটা যেন কাক পক্ষীতেও না জানতে পারে। থানার কনস্টেবল ও অন্যান্য কর্মচারীদের কাছ থেকেও গোপন করা হল।

রাত নটা হয়েছে। দারোগাবাবু কোন অছিলায় তিনজন কনস্টেবলকেই থানার বাইরে পাঠিয়েছেন। চৌকিদারদেরও জিনিষপত্র কেনার জন্যে এদিক

ওদিক পাঠিয়েছেন, আর নিজে একলা মোক্তারের প্রতীক্ষায় বসে আছেন, মোক্তার এখনও ফিরলো না, কি করছে ? চৌকিদারেরা এসে পড়লে বড় মুস্কিল হবে। তাইতো শীঘ্র আসতে বলেছিলাম। আচ্ছা, মোহন্ত যদি তিন হাজারেও না রাজী হয় ? তা এর কম হলে নেব না, এর কমে তো বিয়ে হতেই পারে না।

দারোগাবাবু নিজের মনে হিসেব করতে লাগলেন কতটাকা বরপণ দেবেন আর কত খাওয়া দাওয়ায় খরচ করবেন।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে মোক্তারের আসবার শব্দ পাওয়া গেল, তাঁর বুক কাঁপছে। চারপাই থেকে উঠে বসে পানদান খুলে পান সাজতে বসলেন। এই সময় মোক্তার ঘরে ঢুকল।

কৃষ্ণচন্দ্র—বলুন ?

মোক্তার—মোহন্তজী···

কৃষ্ণচন্দ্র একনজরে দরজাটা দেখে বললেন—টাকা এনেছেন কি না ?

মোক্তার—আজ্ঞে হ্যাঁ এনেছি। কিন্তু মোহন্তজী······

কৃষ্ণচন্দ্র চারদিকে আবার সতর্ক দৃষ্টি রেখে বললেন—আমি এক কড়িও কমাবো না।

মোক্তার—আচ্ছা, আমার পাওনাটাতো দেবেন ?

কৃষ্ণ—আপানার পাওনা মোহন্তের কাছ থেকে নেবেন।

মোক্তার--শতকরা পাঁচটাকা আমাদের বাঁধা আছে।

কৃষ্ণ—এ থেকে এক কড়িও দেবনা। নিজের ধর্ম বেচেছি, লুট করে তা আনছি না।

মোক্তার—সে আপনার ইচ্ছে, কিন্তু আমার হক মারা যাচ্ছে।

কৃষ্ণ—আমার সঙ্গে বাড়ী পর্যন্ত যেতে হবে।

তৎক্ষণাৎ গরুরগাড়ী জোতা হল আর দুজনে তাতে বসে রওনা হলেন, গাড়ীর সামনে পিছনে চৌকিদারের দল। কৃষ্ণচন্দ্র ঘরে উড়ে যেতে চাইছিলেন। গাড়োয়ানকে বারবার তাড়াতাড়ি গাড়ী চালাতে বলছিলেন—আরে, ঘুমিয়ে পড়লি না কি ? জোরে চল্।

এগারোটা নাগাদ তাঁরা বাড়ী পৌঁছলে দারোগাবাবু মোক্তারকে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন। মোক্তার থলি বের করল। কিছু গিনি ছিল. কিছু নোট আর কিছু নগদ টাকা। কৃষ্ণচন্দ্র ঝট করে থলি নিয়ে না দেখে শুনে নিজের সিন্দুকে পুরে তালা বন্ধ করলেন।

গঙ্গাজলী এতক্ষণ তাঁর প্রতীক্ষায় ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র মোক্তারকে বিদায় করে ভিতরে এলেন। গঙ্গাজলী জিজ্ঞাসা করল—এত দেরী হল কেন ?

কৃষ্ণ—এমন কাজ এসে গেল যে দূরে যেতে হল।

খাওয়া শেষে দারোগাবাবু শুলেন কিন্তু ঘুম এল না। স্ত্রীকে টাকার

কথা বলতে তাঁর সঙ্কোচ হচ্ছিল, গঙ্গাজলীরও ঘুম আসছিল না। সে বারবার স্বামীর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল যেন জিজ্ঞাসা করছে বাঁচলে কি ডুবলে।

শেষে কৃষ্ণচন্দ্র বল্লেন—যদি তুমি নদীর ধারে দাঁড়িয়ে থাক আর তোমায় বাঘে তাড়া করে তবে কি করবে ?

গঙ্গাজলী প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝে বলল—নদীতেই ঝাঁপ দেব।

কৃষ্ণ—ডুবে যাবাব ভয় থাকলেও ?

গঙ্গা—হ্যা, বাঘের মুখে পড়ার চেয়ে ডুবে যাওয়া ভালো।

কৃষ্ণ—আচ্ছা, তোমার ঘরে যদি আগুন লাগে আর দরজা দিয়ে বের হবার উপায় না থাকে তো কি করবে ?

গঙ্গা—ছাতে উঠে-নিচে ঝাঁপ দেব।

কৃষ্ণ—আমায় প্রশ্নগুলোর মানে বুঝলে ?

গঙ্গাজলী করুণ দৃষ্টিতে স্বামীকে দেখে বলল—আমি কি এতই বোকা ?

কৃষ্ণ—আমিও ঝাঁপ দিয়েছি। জানিনা বাঁচবো কি মরবো।

৩

পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র ঘুষ নিয়ে সেটা লুকোবার উপায় জানতেন না, এ বিষয়ে তিনি এখন শিক্ষানবিশ। তিনি জানতেন না যে ঘুষের মাল একলা হজম করা শক্ত। মোক্তার ভাবছিল আমিই সব কিছু করলাম আর আমার সঙ্গেই এই চাল! আমার কি দায় পড়েছিল এর ভিতর ঢুকতে আর দিনরাত তোমার খোসামদ করতে। মোহন্ত মরল কি বাঁচল আমার কি যায় আসে, সে তো আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেত না। তুমি খুশি হও কি নারাজ হও তাতে আমার কি হবে ? আমি যে এত ছুটোছুটি করলাম, কিছু পাবার আশাতেই তো করেছিলাম।

সে দারোগাবাবুর কাছ থেকে সোজা থানায় এল আর কথায় কথায় সমস্ত ব্যাপারটা ফাঁস করে দিল।

থানার কর্মচারীরা বলল, বাঃ আমাদের সঙ্গে এই চাল! আমাদের ফাঁকি দিয়ে একলা সব লোপাট করা হচ্ছে। যেন আমরা সরকারী কর্মচারী নই। দেখি এ মাল কেমন করে হজম হয়। দেখনা বকধার্মিককে কেমন মজা দেখাই।

কৃষ্ণচন্দ্র বিয়ের বাবস্থায় ব্যস্ত ছিলেন। বর সুন্দর, সুশীল, সুশিক্ষিত। কুল উঁচু আর ধনী। দু' তরফের চিঠিপত্রের লেনদেন হচ্ছিল। ওদিকে হাকিমের কাছে গুপ্ত চিঠিও পেঁৗছেছিল। তাতে সমস্ত ঘটনাটা এমন স্পষ্ট করে বর্ণনা

করা হয়েছে, খুঁটিনাটি ব্যাপারের সমস্ত প্রমাণ এমনভাবে দেওয়া হয়েছে যে হাকিমের মনে সন্দেহ হল। তিনি গোপনে তদন্ত করে সন্দেহ দূর করলেন। সমস্ত রহস্য ভেদ হল।

একমাস কেটে গেছে, কাল তিলক [কন্যাপক্ষের বরপণ ও যৌতুক সহ বরকে আশীর্বাদ] যাবার দিন স্থির হয়েছে। দারোগাবাবু আয়েস করে সন্ধ্যার সময় থানায় বসে আছেন। সেই সময় পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেন্টকে আসতে দেখলেন। তাঁর পিছনে দুজন দারোগা আর কিছু কনস্টেবল আসছিল। তাঁদের দেখে কৃষ্ণচন্দ্র হতভম্ব হয়ে উঠে দাঁড়াতেই এক দারোগা এগিয়ে এসে তাঁকে গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট দেখাল। কৃষ্ণচন্দ্রের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তিনি জড়মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন, মাথা নিচু হয়ে গেল, তাঁর চেহারায় ভয়ের চিহ্ন ছিল না, ছিল লজ্জা। এই দুই দারোগাকে তিনি নীচ ভাবতেন আর তাদের সামনে গর্ব করে মাথা উঁচু করে হাঁটতেন, কিন্তু আজ তাদেরই সামনে মাথা নিচু দাঁড়িয়ে থাকতে হল। আজন্মের সুনাম এক নিমেষে ধুলোয় মিশে গেল। থানার কর্মচারীরা মনে মনে বলল, আরো একলা একলা ঘুষের টাকা মারো।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বললেন—ওয়েল কিষণচন্দ, টুমি নিজ বিষয়ে কিছু বলিটে চাহ?

কৃষ্ণচন্দ্র ভাবতে লাগলেন, কি বলি? বলবো কি যে আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। এ সব আমার শত্রুদের ষড়যন্ত্র। থানার লোকেরা আমার সততায় বিরক্ত হয়ে হয়ে আমাকে এখান থেকে তাড়াবার জন্যে এই চক্রান্ত করেছে। কিন্তু এই খল অভিনয়ে তাঁর কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। তাঁর বিবেক নিজের অপরাধের বোঝায় যেন চাপা পড়ে যাচ্ছিল। নিজেই নিজেকে পতিত ভাবছিলেন তিনি।

যেমন দুরাচারীরা কুকর্মের জন্যে কদাচিৎ দণ্ড পায়। তেমনি সজ্জনের দণ্ড ভোগও অনিবার্য। তার চেহারা, তার চোখ, তার ভাব ভঙ্গী সব কিছুই যেন তার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তার বিবেক নিজেই নিজের বিচারক হয়ে দাঁড়ায়। সোজাপথে চলা মানুষ সর্পিল গলিপথে গেলে অবশ্যই পথ হারায়।

কৃষ্ণচন্দ্রের বিবেক তাঁকে যেন তীর দিয়ে বিঁধছিল। নাও, এবার নিজের কর্মফল ভোগো। আমি সাপের গর্তে হাত ঢোকাতে মানা করলাম, সে কথায় কান দিলে না। এ তারই ফল।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি নিজ বিষয়ে কিছু বলিটে চাহ?

কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি বলতে চাই যে আমি দোষ করেছি, আর তার জন্যে সব চেয়ে কড়া সাজা আমাকে দেওয়া হোক। আমার মুখে চুন কালি মাখিয়ে গোটা এলাকায় ঘোরানো হোক। মিথ্যা মর্যাদা বাড়াবার জন্যে, নিজের আর্থিক অবস্থা বাড়িয়ে দেখাবার জন্যে, নিজেকে বড় দেখাবার জন্যে অনুচিত কাজ করেছি আর এখন তার শাস্তি চাইছি। বিবেক আর মর্মের

বন্ধন আমাকে আটকাতে পারল না, তাই আইনের বেড়ীর যোগ্য আমি। আমাকে একবার বাড়ী যেতে অনুমতি দিন, সেখান থেকে ফিরে আপনাদের সঙ্গে যেতে আমি প্রস্তুত।

কৃষ্ণচন্দ্রের কথায় গ্লানির সঙ্গে গর্ব ফুটে বের হচ্ছিল। তিনি অন্য দুই দারোগাকে দেখাতে চাইছিলেন যে আমি পাপ যেমন করেছি, তেমনি পুরুষের মতো তার ফল ভোগ করতেই তৈরী। অন্যদের মতো পাপ করে লুকোই না।

দারোগা দুজন এই সব কথা শুনে একে অন্যের দিকে তাকাল। লোকটা কি পাগল হয়ে গেছে? সজ্ঞানে কথা বলছে মনে হয় না। যদি ধার্মিক হবার ইচ্ছে তো এমন কাজ করা কেন? পান করল কিন্তু করার কায়দা শিখল না।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সদয় দৃষ্টিতে কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখে তাঁকে ভিতরে যাবার অনুমতি দিলেন।

গঙ্গাজলী বসে রুপোর থালায় তিলকের জিনিষপত্র গোছাচ্ছিল, এমন সময় কৃষ্ণচন্দ্র এসে বললেন, গঙ্গা, সব ফাঁস হয়ে গেছে। আমাকে ধরে ফেলেছে।

গঙ্গাজলী বিস্মিত হয়ে তাঁর দিকে তাকাল। তার মুখ নিমেষে পাংশু হয়ে গেল। চোখ দিয়ে জল পড়তে শুরু হল।

কৃষ্ণচন্দ্র—কাঁদছো কেন? আমার ওপর কিছু অন্যায় করা হচ্ছেনা। যা করেছি তারই ফল ভুগছি। আমার উপর ফৌজদারী মামলা চালানো হবে। তুমি কিছু ভেব না। আমি সব কিছু সইবার জন্যে তৈরী। আমার জন্য উকিল মোক্তারের দরকার নেই। এতে অনর্থক টাকা খরচ করো না। আমার প্রায়শ্চিত্তে পাপের ধন পবিত্র হবে, ও টাকা সুমনের বিয়েতে খরচ কোরো। মামলার জন্য এক পয়সা খরচ করলেও আমি দুঃখ পাব। নিজের বিবেক, সাধুতা নিজের জীবনের সর্বনাশ করেও আমার সান্ত্বনা থাকবে যে আমি একটা ঋণ থেকে মুক্তি পেয়েছি, একটা মেয়ের গতি করতে পেরেছি।

গঙ্গাজলী দুহাতে নিজের মাথা চাপড়াতে লাগল, নিজের অদূরদর্শিতার জন্যে এত রাগ হচ্ছিল যেন ধরনী দ্বিধা হোক আর সে তাতে প্রবেশ করে। শোক আর আত্মগ্লানি বুকে বিঁধতে লাগল, মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা কড়া রোদের মতো। হতাশায় সে আকাশের দিকে চাইল। হায়, এমন বিপদে পড়তে হবে জানলে মেয়েকে কাঙালের হাতেই দিতাম, না হয় বিষ খাইয়ে মারতাম। তারপর যেন হঠাৎ আচমকা ঘুম ভেঙ্গে উঠে কৃষ্ণচন্দ্রের হাত ধরে বলল—মুখে আগুন এ টাকার। এ টাকা খুনী রামদাসকে ফিরিয়ে দাও। আমার মেয়ের বিয়ের দরকার নেই। হে ভগবান! কেন আমার এ দুর্মতি হল। আমি এখনই সায়েবের কাছে যাচ্ছি। এখন আর লাজলজ্জা রইল কই?

কৃষ্ণ—যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন আর কিছু হবার নয়।

গঙ্গা—আমায় সায়েবের কাছে নিয়ে চলো। আমি তাঁর পায়ে ধরে বলবো,

এই আপনার টাকা নিন আর যা শাস্তি দিতে হয় আমাকে দিন। আমিই বিষের পুটলি। আমিই এ পাপের বীজ পুঁতেছি।

কৃষ্ণ—এত চেঁচিয়ো না, বাইরে লোক শুনতে পাবে।

গঙ্গা—আমাকে সায়েবের কাছে নিয়ে যাচ্ছ না কেন? মেয়েছেলে দেখলে নিশ্চয় তাঁর দয়া হবে।

কৃষ্ণ—শোন, এখন কান্নাকাটির সময় নয়, আমি আইনের কবলে পড়েছি, এখন বাঁচার কোনও উপায় নেই। ধৈর্য ধরো। ভগবানের ইচ্ছে হলে আবার দেখা হবে।

এই বলে তিনি বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই তাঁর দুই মেয়ে এসে তাঁর পা জড়িয়ে ধরল। গঙ্গাজলী দু'হাতে তাদের কোমর ধরল। আর তিন জনে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল।

কৃষ্ণচন্দ্রও কাতর হলেন। তাঁর মনে হল, এই অবলাদের কি গতি হবে? হে ভগবান, তুমি তো দীনদুঃখীকে রক্ষা করো, এদেরও রক্ষা করো।

পরক্ষণেই তিনি নিজেকে ছাড়িয়ে বাইরে চলে গেলেন। গঙ্গজলী তাঁকে ধরবার জন্য দুহাত বাড়ালো কিন্তু তার হাত বাড়ানোই রয়ে গেল ঠিক যেমন গুলিবেঁধা পাখীর পড়বার সময় পাখা ছড়ানো থাকে।

৪

কৃষ্ণচন্দ্র নিজের এলাকায় বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা গ্রামে হুলস্থুল পড়ে গেল। কয়েকজন ভদ্রলোক তাঁকে জামিনে ছাড়াতে এলেন কিন্তু সাহেব জামিন দিলেন না।

এর এক সপ্তাহ পরে কৃষ্ণচন্দ্রের উপর ঘুষ নেবার অভিযোগ দায়ের হল। মোহন্ত রামদাসও গ্রেপ্তার হলেন।

দুটো মামলাই মাসখানেক ধরে চলল। হাকিম তাদের দায়রা সোপর্দ করে দিলেন।

সেখানেও একমাস লাগল। শেষে কৃষ্ণকান্তের পাঁচ বছরের জেল হল। মোহন্তের হল সাত বছরের জন্য, আর তাঁর দুই চেলার দীপান্তরের সাজা হল।

পন্ডিত উমানাথ গঙ্গাজলীর আপন ভাই, কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে তার একটুও বনত না। তিনি তাকে ধূর্ত ও পাষণ্ড বলতেন। তার লম্বা তিলক দেখে ব্যঙ্গ করতেন। সেই জন্য উমানাথ তাঁদের বাড়ী প্রায় আসতো না।

কিন্তু এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে উমানাথ থাকতে পারলো না। সে এসে

বোন আর ভাগ্নীদের নিজের বাড়ী নিয়ে গেল। কৃষ্ণচন্দ্রের কোন আপন ভাই ছিল না। কাকার দুই ছেলে ছিল, তবে তারা আলাদা থাকত। তারা টুঁ শব্দও করল না।

কৃষ্ণচন্দ্র যেতে যেতে গঙ্গাজলীকে মানা করে দিয়েছিলেন যে রামদাসের টাকার একটা পয়সাও যেন মামলায় খরচ না করে। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে সাজা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু গঙ্গাজলী শুনল না, সে প্রাণ খুলে টাকা খরচ করল। উকীলেরা শেষ সময় পর্যন্ত ভরসা দিতে থাকলেন যে ছাড়া পাবে।

জজের নিষ্পত্তির পর হাইকোর্টে আপীল হল। মোহন্তের সাজা কম হল না। তবে কৃষ্ণচন্দ্রের সাজা কমে পাঁচ বছরের জায়গায় চার বছর হল।

বাপের বাড়ীতে এসে গঙ্গাজলী নিজের ভুলের জন্যে পস্তাচ্ছিল। এটা তো সেই বাপের বাড়ী নয় যেখানে সে ছেলেবেলায় পুতুল খেলত, কাদামাটির ঘর গড়ত আর মা বাপের কোলে ঘুরত, বাপ মা এখন স্বর্গে, গাঁয়ের পুরোনো লোকরাও আর নেই। যেখানে গাছ ছিল সেখানে এখন ক্ষেত হয়েছে, আবার কত ক্ষেতে গাছ লাগানো হয়েছে। নিজের ঘরই চেনা মুস্কিল আর সবচেয়ে বড় দুঃখের কথা হচ্ছে যে এখানে ভালবাসা বা আদর নেই; ভাজ জাহ্নবী মুখ ভার করে থাকে। জাহ্নবী আজকাল ঘরে কমই থাকে, প্রতিবেশীদের ঘরে বসে গঙ্গাজলীর দুর্দশার কথা বলে বেড়ায়। তারও দুই মেয়ে, তারাও সুমন আর শান্তার সঙ্গে মিশত না।

গঙ্গাজলীর কাছে রামদাসের টাকার কিছুই বাঁচেনি। সংসার খরচ থেকে কষ্টে সৃষ্টে জমানো চার-পাঁচ শো টাকা ছিল। সেইজন্য সুমনের বিয়ের জন্য সে উমানাথকে কিছু বলে নি। এইভাবে ছ' মাস কেটে গেল, কৃষ্ণচন্দ্র যেখানে সম্বন্ধ করেছিলেন সেখান থেকে জবাব এসে গেছে।

কিন্তু উমানাথের মাথায় এ বিয়ের চিন্তা সব সময় থাকত। অবসর পেলেই সে দু' চার দিনের জন্যে বরের খোঁজে বেরিয়ে পড়ত, কোন গাঁয়ে পেঁছলেই সেখানে হৈ চৈ পড়ে যেত। যুবকেরা পুঁটলী খুলে সেইসব জামা কাপড় বের করত যা পরে তারা বরযাত্রী যেত। আংটি আর মোহনমালা কারও কাছ থেকে ধার নিয়ে পরত। মায়েরা ছেলেদের নাইয়ে ধুইয়ে কাজল পরিয়ে পরিষ্কার জামা কাপড়ে সাজিয়ে খেলতে পাঠাত। বিয়ের লোভে বুড়োরা নাপিত ডেকে গোঁফ কামাত আর মাথার পাকা চুল তুলিয়ে ফেলত। কেউ নিজের বড়মানষি দেখবার জন্যে গাঁয়ের নাপিতকে আর ক্ষেতের মজুর ডেকে এনে তাদের দিয়ে পা টেপাত; কেউ বা কাপড় কোঁচাতে থাকত, যতক্ষণ উমানাথ সেখানে থাকত, মেয়েরা ঘর থেকে বের হত না. কেউ নিজের হাতে জল তুলত না, ক্ষেতেও কেউ যেত না। কিন্তু উমানাথের চোখে এসব ঘর পছন্দ হোল না। সুমন কতো রূপবতী; কতো গুণবতী, কতো লেখাপড়া জানে, এই মূর্খদের ঘরে পড়লে তার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে।

শেষে উমানাম স্থির করল যে শহরেই যোগ্য বর খুঁজতে হবে। সুমনের যোগ্য পাত্র গাঁয়ে মিলবে না। কিন্তু শহুরে লোকদের কথাবার্তা শুনে সে হাঁ হয়ে গেল।

বড়লোকেদের কথা দূরে থাক্—দফ্তরের মুহুরী কেরানীরাও দু-তিন হাজারের সুর ধরে বসে আছে। তার চেহারা দেখেই লোকে কেটে পড়ত। দু-চার সজ্জন তার কুলমর্যাদার খবর পেয়ে বিয়েতে উৎসুক হলেও কোথাও বা উমানাথেরই পছন্দ হল না। সে নিজের কুলমর্যাদা ক্ষুন্ন করতে রাজী নয়।

এই ভাবে পুরো এক বছর কেটে গেল। ছুটোছুটি করে উমানাথ ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তার অবস্থা দাঁড়াল ওষুধের বিজ্ঞাপন বিলি করবার লোকের মত, যে সারাদিন বাবুদের কাছে বিজ্ঞাপন বিলি করবার পর সন্ধ্যার সময় হাতে তখনো একগাদা রয়ে গেছে দেখে যাকে তাকে বিলোতে আরম্ভ করে। উমানাথ তখন মান, বিদ্যা, রূপ, গুণের দিকে না তাকিয়ে শুধু কুল আঁকড়ে রইল, এটা সে কোনমতেই ছাড়তেই রাজী নয়।

তখন মাঘ মাস। উমানাথ স্নান সেরে ঘরে ফিরে গঙ্গাজলীর কাছে গিয়ে বলল—বোন, মনোবাঞ্ছাপূর্ণ হল। বেনারসে বিয়ে ঠিক করে ফেলেছি।

গঙ্গা—ভালো হলো তোমার ছুটোছুটি সার্থক হলো, ছেলে পড়াশুনা করছে?

উমা—পড়েনা, চাকরি করে। এক কারখানায় ১৫ টাকা মাইনের কেরানী।

গঙ্গা—ঘর দোর আছে তো?

উমা—শহরে কার আবার ঘরবাড়ী থাকে। সকলেই তো ভাড়াবাড়ীতে থাকে।

গঙ্গা—মা-বাপ জ্ঞাতি ভাই সব আছে?

গঙ্গা—মা বাপ দুজনেই স্বর্গে; আর শহরে কার আবার জ্ঞাতি গোষ্ঠি থাকে?

গঙ্গা—বয়েস কত হবে?

উমা—তা, বছর তিরিশের কাছাকাছি হবে।

গঙ্গা—দেখতে শুনতে কেমন?

উমা—শরে এক। শহরে কুরূপ হয়না। চুলের বাহার আর ধপধপে কাপড় সকলের, আর গুণ, শীল, কথাবার্তা বলবো কি? কথা বলে যেন মুখ দিয়ে ফুল ঝরছে। নাম গজাধর প্রসাদ।

গঙ্গা—দোজবরে?

উমা—হ্যাঁ, দোজবরে তাতে কি? শহরে কেউ বুড়ো হয় না। যুবকেরা সবাই ছেলেমানুষ আর বুড়োরা যুবক, ওদের যৌবন যায় না। সেই হাসি-তামাসা, সেই ফুলেল তেলের শখ। লোকেরা চিরকাল জোয়ান থাকে আর জোয়ান থেকেই মরে।

গঙ্গা—কুল কেমন ?

উমা—খুব উঁচু। আমাদের চেয়েও দু ধাপ উঁচু। পছন্দ হল তো ?

গঙ্গাজলী উদাস ভাবে বলল—তোমার যখন পছন্দ হয়েছে, তখন আমারও পছন্দ।

৫

ফাল্গুনেই সুমনের বিয়ে হয়ে গেল। গঙ্গাজলী জামাই দেখে কেঁদে ভাসাল, দুঃখের ভারে তার মনে হল যেন সুমনকে জোর করে কুঁয়োয় ফেলে দেওয়া হল।

সুমন শ্বশুরবাড়ী এসে দেখল যে সেখানকার অবস্থা তার কল্পনার বাইরে। বাড়ীতে মাত্র দুটো ঘর আর একটা ছাওয়া বারান্দা। সব দেয়াল নোনালাগা। বাইরের নালীর দুর্গন্ধ আসে। রোদ আলো আসার উপায় নেই। এই বাড়ীর ভাড়া মাসে তিন টাকা।

দু মাস সুমনের সুখেই কাটলো। গজাধরের এক বুড়ী পিসী ঘরের সব কাজ কর্ম করত। কিন্তু গরমের সময় শহরে কলেরা ছড়িয়ে পড়লে তাতেই বুড়ী মারা গেল। সুমন পড়ল বিপদে. বাসন মাজা আর রান্নাঘরের কাজের ঝি তিন টাকার কমে রাজী নয়। দুদিন ঘরে উনুন জ্বলল না। গজাধর সুমনকে কিছু বলতে পারে নি। দু-দিনই বাজার থেকে পুরি তরকারী কিনে আনল। সে সুমনকে খুশী রাখতে চাইত। সেটা তার রূপ লাবণ্যের প্রভাব। তৃতীয় দিন সে রাত থাকতে উঠে সব বাসন মেজে ফেলল। রান্নাঘর পরিস্কার করে কল থেকে জল এনে রাখল। ঘুম থেকে উঠে সুমন দেখে বিব্রত হল। বুঝল যে এসব ওঁরই রীতি। লজ্জায় কিছু জিজ্ঞাসা করল না। বিকেলে সে নিজেই সব কাজ করল। বাসন মাজতে বসে সে চোখের জল সামলাতে পারল না।

অল্পদিনেই সুমন এ কাজে অভ্যস্ত হল আর জীবনে আনন্দ উপভোগ করতে লাগল। গজাধরের মনে হত যেন সে পৃথিবী জয় করে ফেলেছে। বন্ধুদের কাছে সুমনের প্রশংসা করে বেড়াত। স্ত্রী নয়তো, যেন দেবী। কতো বড় ঘরের মেয়ে তবু ঘরের সব কাজ নিজের হাতে করে। আর এমন রাঁধে যে ডাল রুটিতেই পাকা ফলারের স্বাদ মেলে। পরের মাসে মাইনে পেয়ে সব টাকা সুমনের হাতে দিল। সুমন সেদিন স্বচ্ছন্দতার আনন্দ পেল, এখন আর দু এক পয়সার জন্যে কারো কাজে হাত পাততে হবে না। এ টাকা সে খুশীমত খরচ করতে পারবে। ইচ্ছেমত খাওয়া দাওয়া করবে।

কিন্তু গৃহস্থালীর কাজে কুশলতার অভাবে দরকারী আর অদরকারী খরচ

সম্বন্ধে তার কোন জ্ঞান ছিল না। ফল হলো যে মাস শেষ হবার দশদিন আগেই সুমনের সব খরচ হয়ে গেল। সুগৃহিনী হবার শিক্ষা তার ছিল না। বিলাস বাসনের শিক্ষাই সে পেয়েছিল। খবরটা শুনে গজাধর চোখে অন্ধকার দেখল। কি করে মাস চলবে? তার মাথায় পাহাড় ভেঙে পড়ল। এ ভয় তার আগে থেকেই হচ্ছিল। সুমনকে কিছু বলল না বটে কিন্তু মাসের মাঝখানে টাকা জোগাড়ের দুশ্চিন্তায় তার সারাদিন কাটল।

সুমনকে গৃহিনী করে ঘরের ভার দিলে কি হবে, গজাধরের ছিল কৃপনের স্বভাব। জলখাবারে জিলিপী তার বিষের মত মনে হত। ভালো ঘি দেখলেই তার বুকে শূল বিঁধত। খেতে বসে হাঁড়ি কড়া দেখে নিত যে বেশি রান্না হয়েছে কি না। দরজার কাছে চাল ডাল কিছু পড়ে থাকতে দেখলে তার গা জ্বালা করত, কিন্তু সুমনের মোহিনী মূর্তির ফাঁদে পড়ে সে মুখ ফুটে তাকে কিছু বলতে পারত না।

আজ সে কয়েকজনের কাছে ধারে টাকা জোগাড় করতে না পেরে অস্থির হয়ে পড়ল। ঘরে ফিরে বলল—টাকা তো সব খরচ করেছ, এখন কোথায় পাবে?

সুমন—আমি তো আর টাকা উড়িয়ে দিই নি।

গজাধর—তা ঠিক, কিন্তু এটা তো জানতে যে এতেই মাস চালাতে হবে। সেই বুঝে খরচ করা উচিত ছিল।

সুমন—ঐ টাকায় কি ভালোভাবে চলে?

গজাধর—তা বলে আমি তো ডাকাতি করতে পারি না।

কথায় কথায় ঝগড়া বেধে গেল। গজাধর কিছু কড়া কথাও বলল। শেষ পর্যন্ত সুমন হাঁসুলী খুলে বন্ধক রাখার জন্যে দিল আর গজাধর বিড়বিড় করতে করতে সেটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

সুমনের জীবন সুখে কেটেছিল। ভালো খাওয়া ভালো পরার অভ্যাস ছিল। দরজায় খুচাওলার আওয়াজ শুনে সে স্থির থাকতে পারত না। এতদিন সে গজাধরকেও খাইয়েছে। এখন থেকে সে একলাই খায়। তৃপ্তির রসনার জন্যে স্বামীর কাছে লুকোতে লাগল।

ধীরে ধীরে সুমনের সৌন্দর্যের খ্যাতি পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ল। আশপাশের মেয়েরা আসতে লাগল, সুমন তাদের ভালচোখে দেখত না বা মন খুলে তাদের সঙ্গে মিশত না। তার চালচলন ছিল বড় ঘরের মতো। প্রতিবেশীরা শীঘ্রই তার আধিপত্য মেনে নিল। সুমনকে তাদের মধ্যে রাণী বলে মনে হত বলে সে নিজের গরবে আনন্দ পেত। পাড়ার মেয়েদের সামনে সুমন নিজের গুণপনা একটু বাড়িয়ে দেখাত। নিজেদের কপাল মন্দ বলে তারা আপশোষ করত আর সুমন নিজের ভাগ্যের প্রশংসা করত। তারা কারও নিন্দে করলে সুমন তাদের বোঝাত, সে তাদের সামনে রেশমী শাড়ী পরে থাকত। খুঁটিতে

রেশমী জ্যাকেট টাঙিয়ে রাখত। এ সব বাপের বাড়ী থেকে এনেছিল। সুমনের কথাবার্তার চেয়ে তার এসব জিনিষের প্রভাব ছিল বেশী। কাপড় গয়না সম্বন্ধে তার মতামতের দাম যথেষ্ট ছিল। নতুন গয়না গড়াতে হলে সুমনের পরামর্শ নিত, নতুন কাপড় কেনবার আগে তাকে দেখিয়ে নিত। সুমন নিঃস্বার্থভাবে তাদের পরামর্শ দিলেও নিজের মনে বেশ দুঃখ পেত। তার মনে হত যে এরা বেশ নতুন নতুন গয়না গড়াচ্ছে, নতুন নতুন শাড়ী কিনছে আর তার কপালে শুধু শুকনো রুটি। সংসারে তার মতো অভাগিনী কেউ নেই। বাপের বাড়ীর শিক্ষায় তার ধারণা জন্মেছিল যে জীবনশুধু সুখ ভোগের জন্যে। মনের সন্তোষই যে প্রকৃত সুখ এ কথা সে কখনো শোনেনি বা এমন ধর্ম শিক্ষা সে কখনো পায়নি। তাই ক্ষোভে সে ব্যাকুল হয়ে উঠল।

গজাধর এ সময় বেশি পরিশ্রম করত। কারখানা থেকে ফিরে সে একটা দোকানে খাতা লিখতে যেত। সেখান থেকে রাত আটটায় ফিরত, এ কাজে সে পাঁচ টাকা পেত। কিন্তু এতে তার আর্থিক অবস্থার কোন সুসার হল না। সমস্ত রোজগার খেতেই শেষ। কিছু বাঁচাতে না পারায় তার বড় কষ্ট হত। তার উপর সুমন নিত্যই তার পোড়া কপালের দোহাই শুনিয়ে শুনিয়ে তাকে হতাশ করে ফেলল। সে স্পষ্ট বুঝতে পারত যে তার উপর সুমনের টান কমে যাচ্ছে। সে বুঝতে পারেনি যে তার প্রেমালাপের চেয়ে মিষ্টির ঠোঙায় সুমনের আনন্দ বেশী। অতএব প্রেম আর পরিশ্রমে কোন ফল না পেয়ে সে শাসন করে ফল পাবার চেষ্টা করতে লাগল। এইভাবে রশির দুদিকেই টান পড়তে লাগল।

আমাদের চরিত্র যত দৃঢ়ই হোক না কেন, সঙ্গের প্রভাব তার উপর নিশ্চয় পড়ে। সুমন প্রতিবেশীদের যত শেখাত তার চেয়ে বেশি সে শিখত। আমরা গার্হস্থ্য জীবন সম্বন্ধে এতো অজ্ঞ যে তার জন্য যে প্রস্তুতি আর শিক্ষার প্রয়োজন আছে তা ভাবি না। যে কচি মেয়েটি পুতুল খেলার বয়স পেরোয়নি কিংবা যে কিশোরীটি সখিদের সঙ্গে হেসে খেলে বেড়াচ্ছে তাকে গৃহিনী হবার যোগ্য ভেবে বসি। আনাড়ি বাছুরের কাঁধে জোয়াল চাপিয়ে দেওয়া হয় আর কি! এই পরিস্থিতিতে আমাদের গার্হস্থ্য জীবন যদি আনন্দময় না হয়ে ওঠে তাতে অবাক হবার কিছুই নেই। যে মেয়েদের সঙ্গে সুমন মেলামেশা করত তারা স্বামীকে ইন্দ্রিয়সুখের যন্ত্র বলে মনে করত। স্বামী যেমনই হোক না কেন, নিজের স্ত্রীকে ভালো ভালো কাপড় গয়না দেবে, ভালো ভালো জিনিষ খাওয়াবে। যদি এটুকু না পারে তবে সে নিষ্কর্মা, কুঁড়ে তার বিয়ে করার অধিকার নেই, সে আদর ভালবাসার যোগ্য নয়। সুমন এই শিক্ষাই পেল, আর গজাধর তার কোন কাজে রাগ করলে তাকে পুরুষের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এক লম্বা উপদেশ শুনতে হত।

পাড়ায় যুবক আর দুশ্চরিত্র লোকের অভাব ছিল না। স্কুল থেকে ফেরার

সময় যুবকদের চোখ সুমনের দরজায় আটকে যেত। ওদিকে লম্পটেরা পথে বেরিয়ে রাধাকৃষ্ণের গান জুড়ত। কোন কাজে ব্যস্ত থাকলেও চিকের আড়াল থেকে সুমন তাদের এক ঝলক দেখা দিত। এই উঁকিঝুঁকিতে তার চঞ্চল মন অসীম আনন্দ পেত। তার কোন কুবাসনা ছিল না, শুধু নিজের যৌবনের সম্পদ দেখাবার জন্য, শুধু অপরের হৃদয় জয় করার জন্যই সে এই খেলা খেলত।

৬

সুমনের ঘরের সামনের বাড়ীতে ভোলী নামে এক বেশ্যা থাকত। সে নিত্য নতুন সাজে নিজের ঘরের বারান্দায় বসে থাকত। রাত নটা পর্যন্ত তার ঘর থেকে মধুর সঙ্গীতের সুর ভেসে আসত। মাঝে মাঝে ফিটন চড়ে হাওয়া খেতে যেত, সুমন তাকে ঘৃণার চোখে দেখত।

সুমন শুনেছিল যে বেশ্যারা দুশ্চরিত্র ও কুলটা হয়। তারা নানা কৌশলে নব যুবকদের মায়াজালে আটকে ফেলে। ভদ্রলোকেরা তাদের সঙ্গে কথা বলে না, শুধু লম্পটের দল রাতে লুকিয়ে তাদের কাছে যায়। তাকে চিকের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভোলী তাকে কয়েকবার ইশারায় ডেকেছিল কিন্তু সুমন তার সঙ্গে কথা বলা অপমান মনে করত। নিজেকে তার চেয়ে অনেক বড় ভাবত। আমি যত গরীব হই না কেন-আমার একটা মর্যাদা তো আছে। কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে যেতে আমার বাধা নেই। কেউ আমাকে নীচ ভাববে না। আর ও যতই ভোগবিলাসে থাকুক না কেন ওর কোথাও আদর নেই। তাকে নিজের ঘরে বসে নির্লজ্জতা আর অধর্মের ফল ভুগতে হয়। কিন্তু সুমন শীঘ্রই বুঝতে পারল যে সে তাকে যত নীচ ভাবে, সে তার চেয়ে অনেক উঁচু।

আষাঢ় মাস। গরমে সুমনের দম বন্ধ হবার উপক্রম, সন্ধ্যায় সে আর থাকতে পারল না। চিক তুলে দরজায় বসে পাখা হাতে হাওয়া খেতে লাগল। দেখতে পেল যে ভোলীবাঈয়ের বাড়ীতে উৎসবের আয়োজন হচ্ছে। ভিস্তি জল ছড়াচ্ছে, উঠোনে শামিয়ানা টাঙ্গানো হচ্ছে। সাজাবার জন্যে ফুলপাতা জড়ো করা হয়েছে। ঠেলায় করে কাঁচের জিনিষপত্র আসছে। সতরঞ্চি পাতা হচ্ছে। অনেক লোক ছুটোছুটি করছে, এমন সময় ভোলী সুমনকে দেখতে পেয়ে তার কাছে এসে বলল—আজ আমার বাড়ীতে মিলাদ শরীফের ম্যায়ফিল হবে। দেখবে তো বলো, পরদা টাঙিয়ে দিই।

সুমন উৎসাহ না দেখিয়ে বলল—আমি এখানে বসে বসেই দেখব।

ভোলী—দেখবে বটে, তবে শুনতে পাবে না। উপরে পর্দা করে দিচ্ছি, ক্ষতি কি?

সুমন—আমার তেমন শোনবার ইচ্ছে নেই।

ভোলী তার দিকে করুণার দৃষ্টিতে চেয়ে মনে মনে বলল, গেঁয়ো মেয়েটা ভেবেছে কি? আচ্ছা, আজ দেখবি আমি কে? সে আর কিছু না বলে ফিরে গেল।

রাত হচ্ছে, উনুনের ধারে যেতে সুমনের মন চাইছিল না, শরীরে যেন আগুন জ্বলছে। আবার আগুন তাতে যেতে হবে ভেবে উঠে পড়ল। উনুন জেলে খিচুড়ি চাড়িয়ে আবার সেখানে এসে তামাসা দেখতে লাগল। আটটা বাজতে না বাজতেই শামিয়ানা গ্যাসের আলোয় ভরে গেল, ফুল পাতা দিয়ে সাজানো হলে আরো সুন্দর দেখাতে লাগল। চারদিক থেকে দর্শক আসতে লাগল। কেউ সাইকেলে, কেউ টমটমে, কেউ বা হেঁটে। একটু পরে দু-তিনটে ফিটনে কয়েক-জন বাবু এলেন, এক ঘণ্টার মধ্যেই গোটা উঠোন ভরে গেল। কয়েকশো লোকের জমায়েত, তারপর মৌলানা সাহেবের গাড়ী এল, তাঁর চেহারায় সম্ভ্রম, সাজানো সিংহাসনে মসনদ লাগিয়ে বসে পড়লেন আর মিলাদ শরীফের ম্যায়ফিল শুরু হল। কয়েকজন অতিথিদের আদর-অভ্যর্থনায় ব্যস্ত, কেউ গোলাপজল ছড়াচ্ছে, কেউ বা আতর দান সামনে ধরছে, সভা লোকের এমন সমাবেশ সুমন আগে কখনো দেখেনি।

নটার সময় গজাধরপ্রসাদ এল, সুমন তাকে খাওয়াল। খাওয়ার পর গজাধরও সেই সভায় গিয়ে বসল। সুমন খাওয়া ভুলে রাত বারোটা পর্যন্ত সেখানে বসে রইল। ম্যায়ফিল শেষ হল, তারপর মিঠাই বিতরণ শেষ হলে সভা ভাঙল। গজাধর ঘরে ফিরলে সুমন জিজ্ঞাসা করল—কারা সব বসেছিল?

গজাধর—আমি কি সবাইকে চিনি? ভালো মন্দ সব লোকই ছিল। শহরের কিছু সম্ভ্রান্ত লোকও ছিল।

সুমন—বেশ্যাবাড়ীতে আসতে এদের আপত্তি নেই?

গজাধর—আপত্তি থাকলে আসবে কেন?

সুমন—ওখানে যেতে তোমার তো সঙ্কোচ হয়েছিল?

গজাধর—যেখানে এত ভদ্রলোক বসে আছে সেখানে আমার কেন সঙ্কোচ হবে? যে শেঠজীর কাছে আমি বিকেলে কাজ করতে যাই তিনিও এসেছিলেন।

সুমন একটু ভেবে বলল—আমি জানতাম যে লোকে বেশ্যাদের ঘৃণার চোখে দেখে।

গজাধর—হ্যাঁ, এমন লোকও আছে, তাদের হাতে গোণা যায়। ইংরেজী শিক্ষার ফলে লোকে উদার হয়েছে। আজকার বেশ্যাদের অতো ছোট ভাবা হয় না। তার উপর শহরে ভোলীবাঈ-এর খুব সম্মান।

আকাশ মেঘে ঢাকা, হাওয়া বন্ধ। পাতা পর্যন্ত নড়ছে না। সারাদিনের

পরিশ্রমে ক্লান্ত গজাধর বিছানায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু সুমনের অনেকক্ষণ ঘুম এল না।

পরদিন সন্ধ্যায় চিক তুলে বসতেই বসতেই সুমন দেখতে পেল যে বারান্দায় ভোলী বসে আছে, সে একটু এগিয়ে এসে ভোলীকে বলল—রাত্রে আপনার ঘরে খুব ধুমধাম হল।

ভোলী বুঝল তার জিত হয়েছে। হাসিমুখে বলল—শিরণী পাঠিয়ে দেব? হালুইকারের তৈরী, ব্রাহ্মণ এনেছে।

সুমন সঙ্কোচের সঙ্গে বলল—দিন।

৭

প্রায় দেড় বছর হল সুমন শ্বশুরবাড়ী এসেছে, কিন্তু বাপের বাড়ী যাবার সৌভাগ্য তার হয়নি। সেখান থেকে চিঠি আসত। সুমন উত্তরে আগে মাকে বোঝাত, আমার জন্যে ভেব না, আমি খুব আনন্দে আছি। কিন্তু আজকাল উত্তরে নিজের দুর্দশার কথা জানায়, আমার জীবন কেঁদে কেঁদে কাটছে। আমি তোমাদের কি ক্ষতি করেছিলাম যে আমায় এই অন্ধকূপে ফেলে দিলে, এখানে না থাকার ঘর, না পরবার কাপড়, না খাবার ভাত, পশুর মত জীবন কাটাতে হচ্ছে।

পড়শীদের কাছে বাপের বাড়ীর গল্প করা ছেড়ে দিল। আগে স্বামীর খুব প্রশংসা করত আর এখন নিন্দা করতে লাগল। কে আর আমার খোঁজ নেবে? ঘরের মালিক ভাবে আমি মরে গিয়েছি। ও ভাবে আমি ফুলের বিছানায় শুয়ে আছি, আর আমার যে কেমন করে দিন কাটছে তা আমিই জানি।

গজাধর প্রসাদের সঙ্গে তার ব্যবহার আগের চেয়ে রুক্ষ হয়ে উঠল। তাকেই সে নিজের দুর্দশার জন্য দায়ী ভাবত। সকালে দেরী করে উঠত, কতদিন ঘরে ঝাঁটা পর্যন্ত পড়ত না। কখনো গজাধরকে না খেয়েই কাজে বেরোতে হত। সে বুঝতে পারত না কেন এমন হচ্ছে, এমন ভাবে সব ওলোট পালোট হয়ে গেল কেন।

নিজের ঘরে সুমনের মন বসত না, মনে সব সময় বিরক্তি। এমন কি সারাদিন সে পড়শীদের বাড়িতে গিয়ে বসে থাকত।

একদিন গজাধর রাত আটটায় বাড়ী ফিরে দেখে ঘর বন্ধ, সমস্ত অন্ধকার। ভাবতে লাগল, রাত্রে কোথায় গেল? অবস্থা এই পর্যায়ে এসেছে? জোরে দরজা নাড়তে লাগল, যদি পড়শীদের কাছে থাকে তো শুনে চলে আসবে, মনে মনে ঠিক করেছিল আজ মজা দেখাব। সুমন তখন ভোলীবাঈ-এর কোঠায় বসে গল্প

করছিল। ভোলী আজ তাকে খুব আগ্রহ করে ডেকেছিল। সুমন কি করে অস্বীকার করে? নিজের দরজার শব্দ শুনে সে চমকে উঠে দাঁড়াল, আর ছুটে নিজের ঘরে ফিরে এল। কথায় কথায় তার খেয়াল ছিলনা রাত কতটা হয়েছে, সে এসেই দরজা খুলে আলো জ্বালল, তারপর উনুন ধরাতে বসল। মনে মনে নিজেকে দোষ দিচ্ছিল, হঠাৎ গজাধর রাগ করে বলে উঠল—এত রাত পর্যন্ত ওখানে বসে কি করছিলে? লজ্জা সরমের মাথা খেয়েছ?

সুমন করুণকণ্ঠে উত্তর দিল—কতোবার ডেকেছিল, তাই গিয়েছিলাম। কাপড় জামা ছাড়ো, এখনি খাবার তৈরী হয়ে যাবে। অন্যদিনের চেয়ে আজ তাড়াতাড়ি এসেছ।

গজাধর—রান্না পরে করো, আমার এখন খিদে পায়নি। আগে বলো আমাকে না জিজ্ঞাসা করে তুমি ওখানে কেন গিয়েছিলে? আমাকে কি মাটির পুতুল ভেবেছ?

সুমন—সারা দিন একলা বন্ধ বাক্সের ভিতর তো থাকা যায় না।

গজাধর—তাই বলে কি এখন বেশ্যাদের সঙ্গে আলাপ জমাবে? নিজের আবরু-ইজ্জতের কোন খেয়াল নেই?

সুমন—কেন? ভোলীর বাড়ী গেলে ক্ষতি কি? তার ঘরে তো বড় লোকেরা আসে, তাদের কাছে আমি তো নগণ্য।

গজাধর—বড়রা আসে আসুক, কিন্তু ওখানে তোমার যাওয়া বড় লজ্জার কথা। আমি চাই না, আমার স্ত্রী বেশ্যার সঙ্গে মেলা মেশা করুক। তুমি কি জানো যে বড়লোকরা ওখানে আসে তারা কারা? শুধু টাকা থাকলেই কি বড় হওয়া যায়? ধর্ম টাকার চেয়ে অনেক বড়। তুমি মিলাদ শরীফের দিন অতো লোক আসতে দেখে ভুল বুঝেছ, কিন্তু জেনে রাখো তাদের মধ্যে একজনও সচ্চরিত্রের লোক ছিল না, এরা টাকার গরমে ধর্মের ধার ধারে না। তারা এলেই ভোলী পবিত্র হয়ে যায় নি। আমি আজ তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। আবার কখনো ওখানে গেলে ভালো হবে না বলে দিলাম।

কথাটা সুমনের মনে ধরল, সত্যিই তো। আমি কি করে জানবো ওরা কেমন লোক, ধনীরাই তো বেশ্যাদের দাস হয়ে থাকে। এই কথাই তো ভোলীও বলছিল সত্যিই আমার বড় ভুল হয়েছিল।

এই সিদ্ধান্তে সুমন তৃপ্তি পেল, তার বিশ্বাস হল যে ঐ লোকগুলো প্রবৃত্তির দাস। নিজের অবস্থার জন্য তার দুঃখ বোধ কমে গেল। নিজেকে ভোলীর চেয়ে বড় ভাববার একটা যুক্তি পেল।

সুমনের ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা জাগল। ভোলীর কাছে নিজের ধর্মভাব দেখাবার জন্যে সে রোজ গঙ্গাস্নান আরম্ভ করল, একটা রামায়ণ আনল, মাঝে মাঝে সখীদের পড়ে শোনাতে লাগল, কখনো নিজের ঘরে চেঁচিয়ে রামায়ণ পড়ত, তাতে তার আত্মার শান্তি হোক না হোক, মনে যথেষ্ট সন্তোষ হত।

তখন চৈত্র মাস, রামনবমীর দিন সুমন কয়েকজন সখীর সঙ্গে এক বড় মন্দিরে জন্মোৎসব দেখতে গেল। মন্দির উৎসবে খুব সাজানো, বিজলী বাতির দৌলতে দিনের আলোর মত হয়েছে। প্রচন্ড ভিড়। মন্দির প্রাঙ্গণে তিল ধারণের স্থান নেই। সঙ্গীতের মধুর স্বর ভেসে আসছে।

সুমন জানলা দিয়ে উঁকি মেরে প্রাঙ্গণ দেখতে গেল। সে দেখে কি তারই প্রতিবেশিনী ভোলী বসে গান গাইছে। সভায় অনেক মহৎ লোক বসে আছে, কেউ বৈষ্ণব তিলক এঁকেছে, কেউ ভস্মের ত্রিদন্ডী রেখা টেনেছে, কারো গলায় কন্ঠীমালা আর গায়ে রামনামের চাদর, আবার কেউ গেরুয়া কাপড় পরেছে। এদের অনেককেই সুমন নিত্য গঙ্গাস্নান করতে দেখত আর তাদের ধর্মাত্মা ও বিদ্বান মনে করত। তারাই এখন গানে এমন তন্ময় যেন স্বর্গলোকে পেঁাছে গেছে। ভোলী যার দিকে বিলোল কটাক্ষে চাইছে সেই মুগ্ধ হয়ে পড়ছে যেন সাক্ষাৎ রাধাকৃষ্ণের দর্শন পেয়েছে।

এই দৃশ্য দেখে সুমনের বুকে যেন বজ্রাঘাত হল। তার সব অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেল। যে আধারে পা রেখে সে দাঁড়িয়েছিল পায়ের নীচে থেকে তা সরে গেল।

সুমন সেখানে আর দাঁড়াতে পারল না। ভোলীর সামনে শুধু ধনদৌলতই মাথা নিচু করে দাঁড়ায় না, ধর্মও তার কৃপাপ্রার্থী। ধর্মাত্মাদের কাছেও তার আদর। ঐ বেশ্যা—যাকে আমি ধর্মের আড়ম্বর দেখিয়ে হারিয়ে দিতে চাইছিলাম—এখানে মহাত্মাদের সভায়, ঠাকুরের পবিত্র মন্দিরে আদর ও সম্মানের পাত্রী হয়েছে আর আমার জন্য দাঁড়াবার একটু জায়গাও নেই।

সুমন ঘরে ফিরে রামায়ণ বস্তাবন্দী করে দিল। গঙ্গাস্নান, বারব্রত থেকে তার মন উঠে গেল। কর্ণধারহীন নৌকোর মত তার জীবন আবার বেসামাল হয়ে গেল।

৮

চোরদের মাঝখানে মোহরের থলি হাতে বসে থাকা লোকের মতো অবস্থা হল গজাধরপ্রসাদের। সুমনের যে পদ্মমুখ দেখে সে আগে ভ্রমরের মতো গুণগুণ করত, এখন সেটা তার চোখে জ্বলন্ত আগুনের মতো মনে হল। সে তার কাছ থেকে দূরে সরে থাকত, ভয় হত যেন তাকে পুড়িয়ে দেবে। স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য হচ্ছে তার পাতিব্রত্য। এটা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়লালসা মাত্র যা শুধু পুড়িয়ে মারে, যার ফল বিষময়।

সুমনকে সুখী করার জন্যে গজাধর নিজের সাধ্যমত সব কিছু করে দেখেছে, কিন্তু স্ত্রীর জন্যে আকাশ থেকে তারা পেড়ে আনা আর ক্ষমতার বাইরে।

সে সময় তার সবচেয়ে বড় ভাবনা ছিল বাসা বদল করবার। এ ঘরে উঠোন ছিল না, তাই সে যখন সুমনকে চিকের কাছে দাঁড়াতে মানা করত তখন সুমন বলে বসত, তবে কি এই কালকুঠুরিতে পচে মরব ? বাড়ীতে উঠোন থাকলে তো একথা বলতে পারত না। তা ছাড়া সুমনকে এপাড়ার মেয়েদের সঙ্গছাড়া করবার কথাও ভাবছিল। তার নিশ্চিত ধারণা যে এই মেয়েদের কু-সঙ্গে পড়ে সুমনের মতিগতি বদলাচ্ছে। অন্য বাসার জন্যে সে চারদিকে খুঁজে বেড়াত, কিন্তু ভাড়া শুনে নিরাশ হয়ে ফিরে আসত।

একদিন সে শেঠজীর কাছ থেকে আটটার সময় ফিরে দ্যাখে যে ভোলীবাঈ তার চারপাইয়ে বসে সুমনের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। রাগে গজাধরের ঠোঁট কাঁপতে লাগল। ভোলী তাকে দেখে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বলল—যদি আমি জানতাম যে আপনি শেঠজীর কাছে চাকরি করেন তবে কবেই আপনার উন্নতি হয়ে যেত। বৌয়ের কাছে আজই শুনলাম। শেঠজী আমায় সুনজরে দেখেন।

কথাগুলো গজাধরের যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়ল। ও আমাকে এত ছোট ভাবে যে ওর সুপারিশের জোরে আমি উন্নতি করব। এমন উন্নতির মুখে লাথি মারি। সে ভোলীর কথার কোন উত্তর দিল না।

তার ভাবভঙ্গী দেখে সুমন বুঝল যে এবার আগুন জ্বলে উঠবে, তাই সেও তৈরী হয়ে বসল। গজাধরের রাগ গেল না। সে চারপাইয়ে বসে বলল—আবার ভোলীর সঙ্গে মিশছো ? সেদিন না মানা করেছিলাম ?

সুমন সাবধানে উত্তর দিল—ও তো আর অচ্ছুৎ নয়। ভদ্র, স্বভাবও কারো চেয়ে খারাপ নয়, মান মর্যাদাও কারো চেয়ে কম নয়, তাহলে তার সঙ্গে কথা বললে কি মানহানি হবে ? ও চাইলে আমাদের মত লোককে চাকর করে রাখতে পারে।

গজাধর—আবার এমন কথা বলছ যার মাথামুণ্ডু নেই। মান মর্যাদা টাকায় হয় না।

সুমন—কিন্তু ধর্মে তো হয় ?

গজাধর—তা ওই কি বড় ধর্মাত্মা ?

সুমন—সেটা তো ভগবান জানেন, কিন্তু ধর্মাত্মারা ওকে খাতির করেন। এই রামনবমীর উৎসবে বড় বড় পণ্ডিত আর মহাত্মাদের মণ্ডলীতে তাকে গাইতে দেখেছি। কেউ তাকে ঘৃণা করেনি। সকলেই তার মুখ দেখছিল। লোকে তাকে শুধু আদর অভ্যর্থনাই করছে না, তার সঙ্গে কথা বলতে পারলে নিজেকে মহাভাগ্যবান ভাবছে। মনে মনে ঘৃণা করছে কি না তা ঈশ্বরই জানেন, তবে সে সময় যেন ভোলী ছাড়া আর কিছুই দেখার ছিল না। সংসারের লোকে ব্যবহারই দ্যাখে, আর কার মনের কথা কেই-বা জানে ?

গজাধর—বড় বড় তিলক-ছাপ দেখেই ওদের ধর্মাত্মা ভেবেছ? আজকাল ধর্ম বজ্জাতের আড্ডা হয়েছে। এই নির্মল সাগরে তা-বড় তা-বড় হাঙ্গর-কুমীর ঘুরে বেড়াচ্ছে, সরল ভক্তদের গিলে ফেলাই তাদের কাজ। লম্বা লম্বা জটা; লম্বা লম্বা তিলক ছাপ আর লম্বা লম্বা দাড়ি দেখেই লোকে ফাঁদে পড়ে, কিন্তু তারা সবাই মহাপাষণ্ড। তারা ধর্মের পবিত্র নামে কালি মাখায়। ধর্মের নামে টাকা রোজগার করে আর ভোগবিলাসের পাপে ডুবে থাকে। তাদের কাছে ভোলীর আদর-সম্মান হবে না তো আর কার কাছে হবে?

সুমন সরল মনে বলল—আমাকে ভোলাচ্ছ না সত্যি কথা বলছ?

গজাধর নরম হয়ে তাকে বলল—না সুমন, সত্যি কথাই বলছি। আমাদের দেশে সজ্জন কম হলেও একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। তাঁরা দয়ালু, সদাচারী, সব সময় পরের উপকারে তৎপর। ভোলী অপ্সরা সেজে এলেও তার দিকে চোখ তুলে দেখবেন না।

সুমন চুপ করে গেল। তার মনে গজাধরের কথাগুলো ঘুরতে লাগল।

৭

পরের দিন থেকে সুমন চিকের পাশে দাঁড়ানো বন্ধ করল। ডালা মাথায় মিঠাইওলা মিথ্যে হেঁকে চলে যেত। সৌখীন বাবুরা গজল গাইতে গাইতে চলে যেত। চিকের পাশে সুমনকে আর দেখা যেত না। ভোলী তাকে কয়েকবার ডেকেছিল কিন্তু শরীর খারাপের ছুতোয় সে তাকে এড়িয়ে গেল। দু তিন বার সে এসেও ছিল, কিন্তু সুমন তার সঙ্গে মন খুলে কথা বলে নি।

এখানে সুমনের দু'বছর কেটে গেল। রেশমী শাড়ী ছিঁড়ে এসেছে, রেশমী জ্যাকেটের অবস্থাও তেমনি। সুমন আর তার দলের রাণী হয়ে থাকল না, তার কথায় সঙ্গিনীরাও আর কান দেয় না। ভালো জামাকাপড়ের অভাবে তাদের চোখে সে অনেক নেমে গেল। তাই সে পড়শীদের বাড়ী আর যেত না। তারাও যাওয়া আসা কমিয়ে দিল, সারাদিন নিজের ঘরে পড়ে থাকত। কখনো বই পড়ত, কখনো শুয়ে থাকত।

বন্ধ ঘরে থেকে থেকে তার শরীর খারাপ হল। মাথা ব্যথা করত, কখনো জ্বর হত, মাঝে মাঝে বুক ধড়ফড় করত। খাওয়ায় অরুচি। কাজকর্মে ক্লান্তি। শরীর বেশ রোগা হয়ে পদ্মের মতো মুখটা শুকিয়ে গেল।

গজাধর দুশ্চিন্তায় পড়ল। কখনো কখনো রাগ করে সুমনকে বলত—যখনই দেখো, শুয়ে রয়েছে। সময়ে দুটো খেতে না পেলে তোমার থাকা না থাকা দুইই সমান।

কিন্তু একটু পরেই সুমনের জন্য করুণা হত ও নিজের স্বার্থপরতার জন্য লজ্জা হত, ক্রমে ক্রমে সে বুঝতে পারল যে সুমনের সব রোগ অশুদ্ধ হাওয়ার জন্যই হচ্ছে। আগে সে তাকে চিকের কাছে দাঁড়াতে মানা করত, মেলায় বা গঙ্গাস্নানে যেতে দিত না আর এখন সে নিজেই চিক তুলে ধরে আর গঙ্গাস্নান করার জন্য তাগিদ দেয়। তার আগ্রহে সুমন গঙ্গাস্নান শুরু করে দেখল যে শরীর হাল্কা বোধ হচ্ছে। তাই সে নিয়মিত গঙ্গাস্নান ধরল, ঝিমিয়ে পড়া গাছ জল পেয়ে আবার সজীব হয়ে উঠল।

তখন মাঘ মাস। একদিন সুমন পড়শীদের সঙ্গে নাইতে গেল। পথে বেণী-বাগ পড়ে। সেখানে নানারকমের জীবজন্তু রাখা আছে। পাখীদের জন্যে লোহার পাতলা তার দিয়ে এক গম্বুজাকার জায়গা ঘিরে রাখা হয়েছে। স্নান করে ফেরার পথে সকলে ঠিক করল যে বেণী-বাগ দেখে ফিরবে। সুমনের তখনি ফিরে যাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু বন্ধুদের আগ্রহে সঙ্গে যেতে হল। সুমন অনেকক্ষণ নানা জীবজন্তু দেখে ক্লান্ত হয়ে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ল। হঠাৎ তার কানে এল—আরে; এটা কে রে বেঞ্চিতে বসে আছে? উঠে যা। সরকার কি তোদের জন্যে বেঞ্চি পেতে রেখেছে?

সুমন ক্লান্ত চোখে পিছন ফিরে দেখল বাগানের চৌকিদার দাঁড়িয়ে চোটপাট করছে।

লজ্জা পেয়ে সুমন উঠে পড়ে। অপমান ভোলবার জন্য পাখী দেখতে থাকে। আফশোষ হচ্ছিল কেন মরতে বেঞ্চে বসতে গিয়েছিল। এমন সময় একটা গাড়ী এসে পাখীঘরের সামনে থামল। চৌকিদার ছুটে গিয়ে গাড়ীর দরজা খুলে দিল। দুজন মহিলা নামল। তার মধ্যে একজন তার পড়শি ভোলী। সুমন একটা গাছের আড়ালে লুকোয়। মহিলা দুজন বাগানে ঘুরতে লাগল, তারা বাঁদরকে ছোলাভাজা খাওয়াল, পাখীদের জন্যে দানা ছড়িয়ে দিল, কচ্ছপের পিঠে দাঁড়াল, পরে পুকুরের মাছ দেখতে গেল, চৌকিদার তাদের পিছনে চাকরের মত ঘুরছিল, মাছের খেলা দেখার ফাঁকে সে দুটো ফুলের তোড়া বেঁধে মহিলাদের হাতে দিল। একটু পরে তারা সেই বেঞ্চেই বসল যেখান থেকে সুমনকে তুলে দেওয়া হয়েছিল। চৌকিদার একধারে তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে।

ব্যাপার দেখে সুমনের চোখ দিয়ে যেন আগুন বের হতে লাগল, রাগে সারা শরীর কাঁপতে লাগল। চোখ ফেটে জল বেরোয়। আঁচলে মুখ ঢেকে সে কান্না সামলায়।

বেশ্যা দুজন চলে যেতেই সে একছুটে চৌকিদারের সামনে এসে বলল—ব্যাপারটা কি? আমাকে তো বেঞ্চ থেকে তুলে দিলে যেন ওটা তোমার বাপের, কিন্তু রাঁড় দুটোকে তো কিছু বললে না?

চৌকিদার অপমানসূচক ভাবে বলল—ওরা আর তুমি সমান?

কথাটা সুমনের বুকে যেন আগুনে ঘি ছিটিয়ে দিল। ঠোঁট চিবিয়ে বলল চুপ কর মূর্খ। টাকার জন্যে বেশ্যার জুতো তুলছিস, তাতে লজ্জা হয় না। দ্যাখ তোর সামনেই বেঞ্চে বসছি। দেখি কি করে আমায় তুলিস্?

চৌকিদার প্রথমে একটু ভয় পেয়েছিল কিন্তু সুমন বেঞ্চে বসতেই সে তার হাত ধরে তুলতে গেল। সিংহীর মত আগুনভরা চোখে তাকিয়ে সুমন উঠে দাঁড়াল। রাগে আর কান্না চেপে রাখার প্রচেষ্টায় তার হাত পা কাঁপতে লাগল। মুখ দিয়ে কথা বের হল না। সঙ্গিনীরা এসময় সব দেখা সেরে পাখীঘরের কাছে এসেছিল। তারা দূরে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখতে লাগল। কিছু বলবার সাহস কারো হল না।

এই সময় সেখানে আর একটা গাড়ী এল, চৌকিদারকে সুমনের হাত টানতে দেখে এক ভদ্রলোক গাড়ী থেকে নেমে ছুটে এলেন আর চৌকিদারকে ধাক্কা দিয়ে বললেন—শয়তান, ও'র হাত ধরছিস কেন? দূর হ।

চৌকিদার হকচকিয়ে পেছিয়ে এল, চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বলল—হুজুর, ইনি কি আপনার ঘরের লোক?

ভদ্রলোক রেগে বললেন—আমার ঘরের হোক বা নাই হোক, তুই ও'র হাত ধরে টানাটানি করছিলি কেন? এখনি রিপোর্ট করছি, তোর চাকরি করা ঘুচে যাবে।

চৌকিদার হাতে পায়ে পড়তে লাগল। এই ফাঁকে গাড়ীতে বসা মহিলা সুমনকে হাতছানি দিয়ে ডেকে জিজ্ঞাসা করল—ও তোমাকে কি বলছিল?

সুমন—কিছু না। আমি বেঞ্চিতে বসেছিলাম তো আমাকে ওঠাতে চাইছিল। একটু আগে দুটো বেশ্যা ওখানে বসেছিল। আমি কি এতই অধম যে আমাকে বেশ্যার চেয়ে নীচ ভাববে?

মহিলা তাকে বোঝাল যে ওরা ছোটলোক; যার কাছে পয়সা পায় তার গোলামি করে। ওদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করা ভালো নয়।

দুজনের পরিচয় হল। মহিলার নাম সুভদ্রা। সেও সুমনদের পাড়ায় থাকে তবে তার বাড়ী থেকে একটু দূরে। তার স্বামী উকিল, স্বামী-স্ত্রী গঙ্গাস্নান করে বাড়ী ফিরছিল। এখানে এসে চৌকিদারকে একজন ভদ্রঘরের মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া করতে দেখে তার স্বামী গাড়ী থেকে নেমে গিয়েছিল।

সুমনের রং, রূপ, কথাবার্তা সুভদ্রার এত ভালো যে সে তাকে গাড়ীতে তুলে নিল। উকিল সাহেব কোচ বাক্সে উঠে বসলেন। গাড়ী ছাড়ল, সুমনের মনে হল যেন সে বিমানে বসে স্বর্গে যাচ্ছে। সুভদ্রা খুব সুন্দরী নয়, তার বেশভূষাও সাধারণ। কিন্তু তার স্বভাব এত নম্র আর ব্যবহার এত সরল আর বিনয়ে ভরা যে সুমনের হৃদয় আনন্দে ভরে গেল। পথে সঙ্গিণীদের ফিরতে দেখে সুমন গাড়ীর জানলা খুলে তাদের দিকে হেলাভরে তাকায়, ভাবটা যেন তোমাদের কি এমন সৌভাগ্য কখনো হবে? কিন্তু এই গর্বের সঙ্গে তার ভয় হল

আমার বাড়ী দেখে সুভদ্রা আমাকে তাচ্ছিল্য করবে নাতো? হ্যাঁ, ঠিক তাই হবে। ও কি করে জানবে যে আমি এই ভাঙা বাড়ীতে থাকি। ওর কী ভাগ্য! কেমন দেবতার মতো স্বামী, উনি না এসে পড়লে চৌকিদারের হাতে কি হেনস্থাই না হত, কেমন সজ্জন! আমাকে ভেতরে বসিয়ে নিজে কোচোয়ানের পাশে গিয়ে বসলেন! এই সব ভাবতে ভাবতে তার বাড়ী এসে গেল। সে কুণ্ঠিত হয়ে সুভদ্রাকে বলল—গাড়ী থামাতে বলুন, আমার বাড়ী এসে গেছে।

সুভদ্রা গাড়ী থামাতে বলল, সুমন একবার ভোলীবাঈএর বাড়ীর দিকে তাকাল, ভোলী নিজের বারন্দায় পায়চারি করছে। দুজনের চোখে চোখ মিলল। ভোলী যেন বলতে চায়—ভালো ঠাট দেখাচ্ছ; আর সুমন যেন উত্তর দিচ্ছে—দ্যাখো এরা কেমন লোক; মরে গেলেও তোমার কপালে এমন মহিলার পাশে বসার সৌভাগ্য হবে না।

সুমন উঠে দাঁড়িয়ে সজল চোখে সুভদ্রাকে বলল—এত ভালবাসার পর যেন ভুলে যেও না. আমার মন পড়ে রইল।

সুভদ্রা বলল—না বোন, তোমার সঙ্গে তো ভালো করে আলাপই হল না, কাল তোমাকে আনতে পাঠাব।

সুমন নেমে পড়ল, গাড়ী চলে গেল। সুমন ঘরে ঢুকল। তার মনে হল যেন আনন্দময় স্বপ্ন দেখার পর জেগে উঠেছে।

গজাধর জিজ্ঞাসা করল—কার গাড়ীতে এলে?

সুমন—এখানকার কোন উকীল, বেণীবাগে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হল, জোর করে গাড়ীতে বসাল। কোন কথাই শুনল না।

গজাধর—তবে তুমি উকিলের সঙ্গেই বসেছিলে?

সুমন—কী যা তা বলছ? ও বেচারা তো কোচোয়ানের পাশে বসেছিল!

গজাধর—তবু এত দেরী হল।

সুমন—দুজনেই সজ্জনতার অবতার।

গজাধর—আচ্ছা, এখন উনুন ধরাও, অনেক ব্যাখ্যান হল।

সুমন—তুমি তো উকীল সাহেবকে চেনো।

গজাধর—এ পাড়ায় তো পদ্মসিংহ নামে একজন উকীল থাকে। সেই হবে।

সুমন—বেশ ফর্শা লম্বা দেখতে, চোখে চশমা।

গজাধর—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই। আরো পূব দিকে থাকে।

সুমন—খুব বড় উকীল?

গজাধর—আমি কি ওর জমা খরচ লিখি? আসতে যেতে দেখা হয়। লোক ভালো।

সুমন বুঝতে পারল উকীল সাহেবের চর্চা গজাধরের ভালো লাগছেনা। সে কাপড় ছেড়ে রান্নার কাজে লেগে গেল।

১০

পরদিন সুমন নাইতে গেল না। সকাল থেকেই নিজের একটা রেশমী শাড়ী সংস্কারের কাজে লেগে রইল, দুপুর বেলা সুভদ্রার এক ঝি তাকে নিতে এল। সুমন আশা করেছিল গাড়ী আসবে, মনটা ছোট হয়ে গেল। যে ভয় করেছিল তাই হল।

ঝিয়ের সঙ্গে সুভদ্রার বাড়ী গিয়ে সেখানে দু তিন ঘণ্টা বসেছিল, উঠতে মন চাইছিল না। নিজের বাপের বাড়ীর গল্প খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে করতে লাগল। আর সুভদ্রা নিজের শ্বশুরবাড়ীর কথা বলতে লাগল।

দুজনের মেলামেশা বাড়তে লাগল, সুভদ্রা গঙ্গা নাইতে গেলে সুমনকে সঙ্গে নিত। সুমনও প্রতিদিন একবার সুভদ্রার বাড়ী না গিয়ে পারত না।

বালির উপর ছটফট করতে করতে মাছ যেমন জলধারায় পেঁছে আনন্দে পাখা ঝাপটায় সুভদ্রার স্নেহে সিক্ত হয়ে সুমন তেমনই নিজের দুর্দশা ভুলে আমোদ প্রমোদে মেতে রইল।

সুভদ্রাকে কোন কাজ করতে দেখলে সুমন নিজে সেই কাজে লেগে যেত। কখনো পন্ডিত পদ্মসিংহের জন্য জলখাবার তৈরি করে দিত, কখনো পান সেজে পাঠিয়ে দিত। এ সব কাজে তার বিন্দুমাত্রও আলস্য ছিল না, তার দৃষ্টিতে সুভদ্রার মত সুশীলা স্ত্রী আর পদ্মসিংহের মত সজ্জন ব্যক্তি সংসারে আর নেই।

একবার সুভদ্রা জ্বরে পড়ল, সুমন তার পাশ থেকে নড়ত না। নিজের ঘরে গিয়ে কোনরকমে কিছু রান্না করে আবার ফিরে আসত, তার কাজ দেখে গজাধর রাগ করত। সে যেন সুমনকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। তাই সুভদ্রাদের বাড়ী যেতে বারণ করত, কিন্তু সুমন তার কথা শুনত না।

ফাল্গুন মাস পড়েছে, সুমনের চিন্তা হতে লাগল হোলির জামা কাপড় কি করে যোগাড় হবে। মাস খানেক হল শেঠজী গজাধরকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। এখন শুধু ১৫ টাকার উপর ভরসা। সে গজাধরকে তার জন্যে একটা মিহি মসলিনের শাড়ী আর রেশমী জ্যাকেট আনার কথা কয়েকবার বলেছিল, কিন্তু গজাধর হুঁ-হ্যাঁ করে কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছিল, সুমন ভাবছিল, পুরোনো কাপড় পরে কি করে সুভদ্রাদের বাড়ী হোলি খেলতে যাব।

ইতিমধ্যে সুমন খবর পেল তার মা মারা গেছেন। যতটা দুঃখ হওয়া উচিত সুমনের তা হল না, কেননা তার মন মায়ের উপর বিরূপ ছিল। যাই হোক হোলির নতুন জামাকাপড়ের চিন্তা দূর হল, সে সুভদ্রাকে বলল—বহুজী, আমার

আর কেউ রইল না, এখন কাপড়গয়নার দিকেতাকাতে পারছি না, অনেক পরেছি। এই শোকে আর সাজ গোজের ইচ্ছে করে না। পোড়া প্রাণ বেরোতে চায় না, বুকের মধ্যে যে কেমন হচ্ছে তা আমিই জানি। সঙ্গিনীদের কাছেও এই শোক সংবাদ শোনাল, সকলেই তার মাতৃভক্তির প্রশংসা করতে লাগল।

একদিন সে সুভদ্রার কাছে বসে রামায়ণ পড়ছে, এমন সময় পদ্মসিংহ হাসি-মুখে ঘরে ঢুকে বলল—আজ বাজীমাত করেছি।

সুভদ্রা উৎসুক হয়ে বলল—সত্যি ?

পদ্মসিংহ—আরে, এবারো কি আর সন্দেহ থাকবে ?

সুভদ্রা—আচ্ছা, তবে এবার আমার টাকা দাও। ওখানে তোমার বাজী ছিল, এখানে আমার বাজী।

পদ্ম—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার টাকাও পাবে, একটু দাঁড়াও, বন্ধুরা জেদ ধরেছে ধুমধাম করে আনন্দোৎসব করতে হবে।

সুভদ্রা—হ্যাঁ, তা তো করতেই হবে আর করা উচিতও বটে।

পদ্ম—আমি প্রীতিভোজের কথা বলেছিলাম, কিন্তু তারা মানছে না, তারা ভোলীবাঈএর মুজরা করাবার জেদ ধরেছে।

সুভদ্রা—তা ওদের কথাই মেনে নাও। কতো হাজারই বা খরচ হবে, হোলি এসে পড়ল, ঐদিনই লাগিয়ে দাও। এক ঢিলে দুই পাখী মারা হবে।

পদ্ম—খরচের কথা ভাবছি না, নীতির কথা ভাবছি।

সুভদ্রা—এবারের মতো নীতি বিরুদ্ধই হোক।

পদ্ম—বিঠলদাস কোনমতেই রাজি হচ্ছেন না। আসবেন না।

সুভদ্রা—ও'র কথা বাদ দাও। সংসারে সবাই কি ও'র মতো হয়ে যাবে।

পণ্ডিত পদ্মনাথ সিংহ কয়েক বছরের বিফল প্রচেষ্টার পর এবার মিউনিসি-প্যালিটির মেম্বার হতে পেরেছেন। এই উপলক্ষেই উৎসবের আয়োজন হচ্ছিল। তিনি ভোজের পক্ষে ছিলেন কিন্তু বন্ধুরা মুজরা করাবার জেদ ধরেছিল। তিনি নিজে সদাচারী হলেও সব সময় নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারতেন না। কিছুটা ভদ্রতার খাতিরে কিছুটা সরল স্বভাবের জন্য আর কিছুটা বন্ধুদের ব্যঙ্গোক্তির ভয়ে নিজের ইচ্ছা জোর করে খাটাতে পারতেন না। বাবু বিঠলদাস তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু। তিনি বেশ্যাদের নাচগানের প্রবল বিরোধী ছিলেন। এই কুপ্রথা দূর করার জন্য তিনি এক সংস্কার সমিতি স্থাপন করেছিলেন, পণ্ডিত পদ্মনাথ সিংহ তাঁর বিশিষ্ট অনুগামীদের একজন। পণ্ডিতজী তাই বিঠলদাসকে ভয় করতেন। কিন্তু সুভদ্রার প্ররোচনায় সে সংকোচ দূর হল।

তিনি বেশ্যাসক্ত বন্ধুদের মতে সায় দিলেন। ভোলীবাঈ-এর মুজরা হবে এটাও স্থির হল।

চার দিন পরে হোলি। সে রাতে পদ্মসিংহের বৈঠকখানা নৃত্যশালার মত দেখতে হল। সুন্দর রঙিন গালিচায় বন্ধুবর্গ বসেছে আর ভোলীবাঈ তার:

সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে মাঝখানে বসে নানা অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে মিষ্টি সুরে গান ধরেছে, ঘরটা বিজলীর আলোয় ঝলমল করছে, আতর গোলাপের ছড়াছড়ি। হাসি-পরিহাস, আমোদ প্রমোদে আসর জমে উঠেছিল।

সুমন আর সুভদ্রা জানালার চিকের আড়াল থেকে জলসা দেখছিল, ভোলীর গান সুভদ্রার নীরস ও ফিকে মনে হচ্ছিল, লোকে এমন একাগ্রচিত্তে কি যে শুনছে তা ভেবে পেল না। অনেক পরে গানের কথা বোঝা গেল। শব্দ এতক্ষণ অলঙ্কারে ঢাকা পড়েছিল। সুমনের রসজ্ঞান বেশি। সে গান জানত, সুর তালের জ্ঞানও ছিল। একবার শুনেই সে গান শিখতে পারত। ভোলীবাঈ গাইছিল ঃ—

এমন হোলিতে যেন আগুন লাগে ;
পিয়া বিদেশে, আমি দ্বারে দাঁড়িয়ে, ধৈর্য কেমনে রহে ?
এমন হোলিতে যেন আগুন লাগে।

সুমন গানটা গুনগুন করে গাইল আর ঠিক হয়েছে দেখে খুশি হল, শুধু গিটকিরি ঠিক হল না। সে একমনে গান শুনতে লাগল। সবাই ভোলীবাঈ-এর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। চোখে তৃষ্ণা, ঔৎসুক্য আর লালসা। যার উপর তার চোখ পড়ছে সে আনন্দে অভিভূত হচ্ছে। যার সঙ্গে হেসে দু' একটা কথা বলছে সে ভাবছে বুঝি কুবেরের ধন পেলাম। সবার নজর তার উপর যাচ্ছে। সভায় নামী নামী ধনী, বিদ্বান, রূপবান সজ্জন উপস্থিত ছিলেন কিন্তু সকলেই এই বেশ্যার হাবভাবে মুগ্ধ। প্রত্যেক মুখেই বাসনা ও লালসার ছবি।

সুমন ভাবতে লাগল যে মেয়েটার এমন কোন যাদু আছে!

সৌন্দর্য ? ও যে রূপবতী তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমিও দেখতে খারাপ নই, ও শ্যামলী, আমি ফর্সা, ও মোটা আর আমি রোগা।

পণ্ডিতজীর ঘরে বড় আয়না ছিল। সুমন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত নিজের রূপ দেখতে লাগল। ভোলীবাঈ-এর চেহারার সঙ্গে নিজের প্রতি অঙ্গের তুলনা করতে লাগল। তারপর সুভদ্রার কাছে এসে বলল—বহুজী, একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, কিছু মন্দ ভেব না, আচ্ছা এই ইন্দ্রসভার পরী কি আমার চেয়েও সুন্দর ?

সুভদ্রার কৌতূহল হল। সে হেসে প্রশ্ন করল—জিজ্ঞাসা করছ কেন ?

সুমন লজ্জায় মুখ নিচু করে বলল—এমনি। বল না।

সুভদ্রা বলল—ওর সুখের শরীর, তাই কোমল ; কিন্তু রঙ রূপে তোমার সমান নয়।

সুমন আবার ভাবল তবে কি সাজগোজের জন্যে আর কাপড় গয়নাতেই লোকে খুশি হয় ? আমিও যদি অমন সাজগোজ করি, অমন কাপড় গয়না পরি তবে আমার রূপ কি আরও ফুটবে না, যৌবনের চমক কি আরো বেশি হবে না ? কিন্তু পাবো কোথায় ?

লোকে কি ওর গানের সুরে এত মোহিত হচ্ছে ? গলাটা তো মিষ্টি নয়, আমার গলা ওর চেয়ে অনেক ভালো। কেউ যদি আমায় একমাস শেখায় তো আমি ওর চেয়ে ভালো গাইতে পারি। আমিও আড়চোখে চাইতে পারি, আমিও লজ্জায় মুখ নামিয়ে মুচকি হাসি হাসতে জানি।

সেখানে বসে বসে সুমন মনে মনে কার্য থেকে কারণের খোঁজ করতে লাগল। শেষে তার সিদ্ধান্ত হল যে ও স্বাধীন আর আমার পায়ে বেড়ি। ওর দোকান খোলা বলে গ্রাহকের ভিড় লেগে আছে, আমার দোকান বন্ধ বলে কেউ এসে দাঁড়ায় না, ও কুকুরদের চিৎকারের ভ্রূক্ষেপ করে না, আমার লোকলজ্জার ভয় আছে, সে পর্দার বাইরে আর আমি পর্দার ভিতরে। সে ডালে বসে স্বচ্ছন্দে ডাকছে আর আমি ডাল ধরে ঝুলছি। এই লজ্জা আর উপহাসের ভয়ই আমাকে অপরের চেড়ী করে রেখেছে।

মাঝরাতের পর জলসা ভাঙল। লোকে নিজেদের ঘরে ফিরে গেল। সুমনও ঘরমুখো হল। মেঘের জন্য চারিদিকে অন্ধকার ছেয়ে আছে। সুমনের হৃদয়েও নৈরাশ্যের অন্ধকার। সে ঘরে ফিরছে অতি ধীরে ধীরে যেমন ঘোড়া আসে আসে গাড়ীর বাঁধনে পড়বার সময়। মর্যাদা যেমন ক্ষুদ্রতা দেখলে দূরে সরে যায় তার হৃদয়ও তেমনি ঘর থেকে দূরে যেতে চাইছিল।

গজাধর নিয়মমত রাত নটার সময় ঘরে এল। দরজা বন্ধ দেখে তার মাথা ঘুরে গেল। সুমন কোথায় গেল ? পাশে দরজীর এক বৌ থাকে। তার কাছে জানতে পারল যে সে কোন কাজে সুভদ্রার কাছে গিয়েছে। চাবি পাওয়া গেল, এসে দরজা খুলল, খাবার তৈরী করা রয়েছে। সে দরজার বসে সুমনের প্রতীক্ষা করতে লাগল। দশটা বাজলে সে খাবার বাড়ল কিন্তু রাগে কিছু খেতে পারল না। সমস্ত রাঁধা জিনিষ বাইরে ফেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। মনে মনে ঠিক করল যে হাজার মাথা খুঁড়লেও দরজা খুলব না, দেখি কোথায় যায়। কিন্তু অনেকক্ষণ তার ঘুম এল না। একটু শব্দ পেলেই লাঠি হাতে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। সে সময় সুমনের দেখা পেলে কি ঘটত বলা যায় না। তবে এগারোটার পর নিদ্রাদেবী তার উপর ভর করলেন।

সুমন যখন বাড়ীর দরজার কাছে এল তখন ঘড়িতে একটা বাজার শব্দ শোনা গেল। সে শব্দে তার সারা শরীর কেঁপে উঠল। তার ধারণা ছিল দশটা এগারোটা হবে। প্রাণ শুকিয়ে গেল। দরজার ফাঁকে উঁকি মেরে দেখল, ডিবে জ্বলছে, তার ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেছে আর গজাধর লাঠি হাতে চিৎ হয়ে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। সুমনেব বুক কেঁপে উঠল, দরজা ঠেলতে সাহস হল না।

কিন্তু এখন যাই কোথায় ? পদ্মসিংহের বাড়ীর দরজাও এতক্ষণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। চাকর হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। বেশি ডাকাডাকি করলে দরজা তো খুলবে কিন্তু উকীল সাহেব না জানি মনে ভাববেন। না, সেখানে যাওয়া উচিত নয়। এখানেই বসে থাকি। একটা তো বেজেই গেছে, তিন চার ঘণ্টায়

সকাল হয়ে যাবে। এই ভেবে সে বসে পড়ল, কিন্তু ভয় থেকে গেল কেউ যদি আমায় এইভাবে বসে থাকতে দ্যাখে তো কি ভাববে। ভাববে চোর ওত পেতে বসে আছে। বাস্তবে সুমন নিজের ঘরে চোরই হয়েছিল।

ফাল্গুনে রাতের হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। সুমনের গায়ে একটা ছেঁড়া রেশমী জামা। হাওয়া তীরের মত হাড়ে বিঁধছিল। হাত পা কুঁকড়ে যাবার উপক্রম। তারপর নালার দুর্গন্ধে নিঃশ্বাস নেওয়া শক্ত। কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। শুধু ভোলবাঈয়ের কোঠা থেকে একটা আলোর রেখা অন্ধকার গলিতে অকরুণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

সুমনের মনে হল তার মত হতভাগী কেউ নেই। কত মেয়ে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে আছে, ঝিয়েরা হাত পা টিপছে। আর আমি এখানে বসে দুর্ভাগ্যের বোঝা বইছি, কেন আমি এত দুঃখ সইছি? কুঁড়ে ঘরে ভাঙা খাটে শুই, শুকনো রুটি খাই, নিত্য গাল খাই, কেন? কর্তব্য পালনের জন্যই তো? কিন্তু সংসার কি আমার কৃচ্ছসাধনের কোন দাম দেয়? আমার কাছে কিছুই লুকোনো নেই। দশেরার মেলায়, মহরমের মেলায়, ফুলের বাগানে, মন্দিরে সব জায়গাতেই তো দেখতে পাচ্ছি। এতদিন জানতাম যে লম্পটেরাই এই সব মেয়েদের পেছনে ঘোরে, কিন্তু আজ বুঝলাম সচ্চরিত্র সদাচারী পুরুষদের কাছেও তাদের আদর কম নয়। উকিল সাহেব কত সজ্জন কিন্তু আজ ভোলীবাঈকে দেখে কেমন মেতে উঠলেন।

এইসব ভেবে সে দরজা ঠেলবার জন্য উঠল, যা হবার তা হয়ে যাক। কীএমন সুখে আছি—যার জন্য এত কষ্ট সইব। কোন পোলাও কালিয়া খাওয়াচ্ছে? কোন ফুলের বিছানায় শুইয়ে রেখেছে। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর একটা রুটি খাই। তার জন্যে এত গালমন্দ। কিন্তু গজাধরের লাঠি দেখে বুক কেঁপে উঠল। পশু শক্তির কাছে মানুষ হার মানল।

সুমনের হঠাৎ চোখে পড়ল যে দুজন কনস্টেবল লাঠি কাঁধে ঐ পথে আসছে। অন্ধকারে তাদের ভয়ংকর দেখাচ্ছে। সুমনের মুখ শুকিয়ে গেল, লুকোবার কোন জায়গা নেই। ভাবল যদি বসে পড়ি তো নিশ্চয় কিছু জিজ্ঞাসা করবে, তখন কি উত্তর দেব। সে চট করে উঠে দরজা ঠেলতে লাগল। চেঁচিয়ে বলল—দু ঘণ্টা ধরে চ্যাঁচাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছ না?

গজাধর চমকে জেগে গেল। এক দফা ঘুম হয়ে গেছে। উঠে দরজা খুলে দিল। আওয়াজে কিছুটা ভয় ছিল, কিছুটা উদ্বেগ। সুমন রাগের ভাণ করে বলল—আচ্ছা ঘুম ঘুমোচ্ছে বটে। দু'ঘণ্টা ধরে চেঁচিয়ে মরছি, কানেই যাচ্ছে না, ঠাণ্ডায় হাত পা জমে গেল।

গজাধর বলল—বাজে কথা রাখো। বল, সারা রাত কোথায় কাটালে?

সুমন নির্ভয়ে বলল—রাত আবার কোথায়। নটার সময় সুভদ্রাদেবীর বাড়ী গেলাম। নেমন্তন্ন ছিল, ডাকতে এসেছিল। দশটার সময় সেখান থেকে ফিরেছি।

দু'ঘণ্টা ধরে তো দরজায় দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছি। বারোটা বাজে হয়তো। ঘুমোলে তোমার তো কত হুঁস থাকে।

গজাধর—তুমি দশটার সময় এসেছ?

সুমন জোর দিয়ে বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, দশটার সময়।

গজাধর—আগাগোড়া মিথ্যে কথা, বারোর ঘণ্টা শুনে আমি শুয়েছি।

সুমন—তা শুনে থাকবে। ঘুমোলে হাত পায়ের সাড় থাকে না। আবার ঘণ্টা শুনেছে?

গজাধর—এ সব ধাপ্পা চলবে না। ঠিক করে বলো এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আজকাল নতুন নতুন ঢং দেখছি। অন্ধ নই, মেয়েদের স্বভাব জানি। ঠিক করে বলো নয়তো যা হবার তাই হবে।

সুমন—বললাম তো দশটা এগারোটার সময় এখানে এসেছি। বিশ্বাস না হলে আর কি করব, যে গয়না গড়াতে দিয়েছ তা বন্ধ করে দাও। সেই কথায় বলে না 'রাণী রুঠেগী, অপনা সুহাগ লেগী' (রাণী রাগ করবে তো ভাত বেশি খাবে)।" যখনই দ্যাখো, তরোয়াল উঁচিয়ে আছে, না জানি কি করেছি!......

বলতে বলতে সুমন থমকে গেল। তার খেয়াল হল যে সে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ দরজার কাছে বসে ভেবে চিন্তে যা স্থির করেছিল সব ভুলে গেল। লোকাচার আর চিরন্তন ধারণা জীবনে আকস্মিক পরিবর্তন আসতে দেয় না।

গজাধর সুমনের কড়া কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল। এই প্রথম সুমন তার সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলছে। রাগে জ্ঞানহারা হয়ে বলল—তুই ভেবেছিস কী? যা খুশি তাই করবি আমি টুঁ শব্দ পর্যন্ত করতে পারব না। সারারাত কোথায় কাটিয়ে এলি জিজ্ঞাসা করলে বলছিস, আমি তোমার ধার ধারি না। তুমি আমার কী করবে? বুঝেছি শহরের হাওয়া গায়ে লেগেছে। তুইও ওদের স্বভাব পেয়েছিস। আমার সঙ্গে তোর বনবে না। কতবার বলেছি যে এই ডাইনী-গুলোর সঙ্গে মিশবি না, মেলাটেলায় যাবি না, তা কি শুনলি? শুনলি না। যতক্ষণ না বলবি কোথায় সারারাত ছিলি, ততক্ষণ ঘরে ঢুকতে দেব না। না বললে জানবি আজ থেকে তোর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। যেখানে খুশি যা, যা ইচ্ছা হয় তাই করগে যা।

সুমন করুণস্বরে বলল—উকিল সাহেবের বাড়ী ছাড়া আর কোথাও যাই নি, বিশ্বাস না হলে নিজে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো। ওখানেই যা দেরী হবার হয়েছে। গান হচ্ছিল। সুভদ্রাদেবী আসতে দিল না।

গজাধর ব্যঙ্গ করে বলল—ওহ; এবার তবে উকিল সাহেবের উপর মন পড়েছে, তাই বলো! তবে আর এই মজুরের তোয়াক্কা করবার কি দরকার?

এই লাঞ্ছনায় সুমনের বুক ভেঙ্গে গেল। মিথ্যা অপবাদ সে সহ্য করতে পারে না। সেও রাগ করে বলল—এ সব কি বলছ? একজন ভালোমানুষের মিথ্যে বদনাম দিচ্ছ! আজ আমার দেরি হয়ে গিয়েছে। আমাকে যা বলবার

বল, মারো, ধরো, উকীল সাহেবকে এর মধ্যে টানছ কেন ? আমি ঘরে থাকলে উনি ভেতরে আসেন না।

গজাধর—যা যা ছুঁড়ী, আমায় শেখাতে হবে না। এমন ঢের ঢের ভালো-মানুষ আমি দেখেছি। সে দেবতা, তো তার কাছেই যা। এ কুঁড়ে ঘরে কি তোকে মানায়। তোর খাঁই এখন বেড়েছে। এখানে তোর কুলোবে না।

সুমন দেখল কথায় কথা বেড়ে যাচ্ছে। কথা ফেরাবার উপায় থাকলে সে ফিরিয়ে নিত। কিন্তু হাতের তীর কি আর হাতে ফেরে? সুমন কাঁদতে কাঁদতে বলল—আমার চোখ গলে যাবে যদি কোনদিন তাঁর দিকে চেয়ে থাকি। আমার জিভ খসে যাবে যদি আমি তাঁর সঙ্গে একটি কথাও বলে থাকি। গল্প করবার জন্য সুভদ্রার কাছে যেতাম। মানা করছ তো আর যাব না।

মনে একবার সন্দেহ ঢুকলে তাকে দূর করা কঠিন। গজাধরের মনে হল যে আমাকে ঠাণ্ডা করবার জন্য নরম ভাব দেখাচ্ছে। কড়া গলায় সে বলল—না, যাবে না কেন? সেখানে গাড়ী চড়ে বেড়াবে, ভালো-মন্দ খাবে দাবে, ফুলের বিছানায় শুতে পাবে, রোজ নাচ-গানের ধুম লাগবে।

ব্যঙ্গ আর রাগে আগুন আর ঘিয়ের সম্বন্ধ। ছেনি যেমন বরফকে টুকরো করে, ব্যঙ্গ তেমনি বুক ভেঙে দেয়। সুমন রাগে বিহবল হয়ে বলল—আচ্ছা, এবার মুখ থামাও, অনেক হয়েছে। কিছু বলছি না বলে মুখে যা আসছে তাই বকে চলেছ। আমাকে কি কুলটা ভেবেছ ?

গজাধর—আমি তো তাই বুঝেছি।

সুমন—মিথ্যে আমার দোষ দিচ্ছ। এর সাজা ভগবান দেবেন।

গজাধর—দূর হ আমার ঘর থেকে রাঁড় কোথাকার, আবার শাপ দিচ্ছে।

সুমন—হ্যাঁ তাই বল যে আমায় রাখতে চাও না। মিছে বদনাম দিচ্ছ কেন? তুমিই কি আমার অন্নদাতা? যেখানে খাটবো সেখানেই পেটের ভাত মিলবে।

গজাধর—যাবি? না দাঁড়িয়ে গাল দিবি?

সুমনেব মতো গর্বিতা স্ত্রীর এ অপমান সহ্যের অতীত, ঘর থেকে তাড়িয়ে দেবার হুমকি এক ভয়ঙ্কর বাসনা পূর্ণ করে দেয়।

সুমন—বেশ, আমি যাচ্ছি। এই বলে সে দরজার দিকে পা বাড়াল। কিন্তু তখনো সে চলে যাবার জন্য মনস্থির করেনি।

গজাধর মিনিট খানেক ভেবে বলল—নিজের কাপড় গয়না নিয়ে যা।

এ কথায় ক্ষীণ আশাও উপে গেল। সুমনের বিশ্বাস হল যে তাকে এ ঘর ছাড়তে হবে। কাঁদতে কাঁদতে বলল—আমি নিয়ে কি করব?

সুমন হাতবাক্স নিয়ে দরজার বাইরে এল; এখনো তার প্রত্যাশা যে গজাধর মত পাল্টাবে। তাই সে দরজার সামনে পথে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কান্নায় গোটা আঁচল ভিজে। হঠাৎ গজাধর সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল। এ

বাড়ীতে ফেরবার আশা যেন চিরকালের মত বন্ধ হয়ে গেল। ভাবতে লাগল, কোথায় যাই? গ্লানি আর অনুতাপের বদলে এখন গজাধরের উপর তার রাগ হচ্ছিল। সে তো সজ্ঞানে এমন কোন কাজ করে নি যার জন্য এমন কঠোর শাস্তি পাবে। বাড়ী ফিরতে দেরী হয়েছে বলে দু'চারটে ধমকই যথেষ্ট হত, এইভাবে তাড়িয়ে দেওয়া ঘোর অন্যায়।

গজাধরকে রাগ মানানোর জন্য সে কি না করল? মিনতি খোশামোদ, করল, চোখের জল ফেলল; কিন্তু সে সুমনকে শুধু অপমানই করল না, মিথ্যা অপবাদও দিল। এসময় যদি গজাধর তাকে ফেরাতে আসত, তাহলেও সুমন রাজী হত না। যাবার সময় সে বলেছিল যাও, ও মুখ আর দেখিয়ো না। কথাটা তার বুকে বিঁধেছিল। আমি এতই খারাপ যে আমার মুখ দেখতে চায় না, তবে আমিই বা কেন মুখ দেখাব? সংসারে সব মেয়ের কি স্বামী থাকে? অনাথা কেউ নেই? আমিও তো এখন অনাথা।

বসন্তের মলয় বাতাস আর গ্রীষ্মের গরম হাওয়া 'লু'—এদের পার্থক্য কত? এক প্রাণদায়ী, সুখদ অন্যটা অগ্নিময়, বিনাশকারী। প্রেম হচ্ছে মলয় সমীরণ আর হিংসা দ্বেষ গ্রীষ্মের 'লু'। যে ফুলকে বসন্ত-সমীর কতো মাসে ফুটিয়ে তোলে, লু'এর এক ঝাপটা তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলে। সুমনের ঘর থেকে একটু দূরে একটা খালি বারান্দা ছিল। সেখানে গিয়ে হাতবাক্সে মাথা রেখে সে শুয়ে পড়ল। তিনটে বেজে গেছে। কোথায় যাবে এই চিন্তায় তার দু ঘণ্টা কেটে গেল। তার সঙ্গিনীদের মধ্যে হিরিয়া নামে এক নষ্ট মেয়ে ছিল, সেখানে আশ্রয় মিলত। কিন্তু সুমন ওদিকে গেল না।

আত্মসম্মান বোধ এখনও একটু ছিল। এখন সে স্বাধীন; নিজের দুষ্কামনা গুলো যা তার মন এত বছর ধরে পুষে রেখেছে, অনায়াসে পূর্ণ করতে পারে। সে সুখের পথে এখন কোন বাধা নেই। কিন্তু ছোট ছেলে যেমন দূর থেকে গরু ছাগল দেখে আনন্দ পায়, কিন্তু তার কাছে যেতে হলে ভয়ে মুখ লুকোয় তেমনি সুমন অভিলাষ পূরণের দরজার কাছে এসেও ভিতরে ঢুকতে পারল না। লজ্জা, ঘৃণা, গ্লানি, অপমান সব মিলে যেন তার পায়ে বেড়ী পরিয়ে দিল। সে স্থির করল সুভদ্রার বাড়ী যাবে, সেখানে রাঁধবে, ঘরের কাজ করবে আর একপাশে পড়ে থাকবে। পরে কি হবে তা ভগবান জানেন।

হাতবাক্স আঁচলে ঢেকে সে পদ্মসিংহের বাড়ী এল। মক্কেলেরা হাতমুখ ধুচ্ছে, কেউ আসনে ধ্যান করতে বসে ভাবছে আমার সাক্ষীগুলো বিগড়ে না যায়, কেউ মালা ঘোরাচ্ছে কিন্তু দানা দিয়ে হিসেব করছে আর কত টাকা খরচ করতে হবে, মেথর রাতের ফেলা লুচি মিষ্টি সংগ্রহ করছে। ভিতরে যেতে সুমনের একটু সংকোচ হল, কিন্তু বুড়ো চাকর জিতনকে আসতে দেখে চট করে ভিতরে চলে গেল। সুভদ্রা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল—ঘর থেকে সকালে কি মনে করে?

সুমন কুণ্ঠিত হয়ে বলল—আমায় ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

সুভদ্রা—আরে! কি ব্যাপার? কেন?

সুমন—কাল রাতে এখান থেকে ফিরতে আমার দেরী হয়েছিল বলে।

সুভদ্রা—এইটুকুর জন্যে এত তুলকালাম ব্যাপার! ওঁকে ডাকিয়ে পাঠাচ্ছি। বিচিত্র মানুষ!

সুমন—না, না, ওকে ডেকো না। আমি কেঁদে কেটে হার মেনেছি। নিষ্ঠুরের একটুও দয়া হল না। আমার হাত ধরে ঘর থেকে বের করে দিল। তার দেমাক এই জন্যে যে সে আমায় খাওয়ায় পরায়। তার দেমাক ভেঙ্গে দেব।

সুভদ্রা—থামো, এমন কথা বোলো না। আমি তাঁকে ডাকাচ্ছি।

সুমন—তার মুখ আমি আর দেখতে চাই না।

সুভদ্রা—তো ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছে!

সুমন—হ্যাঁ তাই, ওর সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই।

সুভদ্রা ভাবল, এখন রাগের মাথায় কিছু বুঝছে না। দু-এক দিনে শান্ত হয়ে যাবে, বলল—আচ্ছা, হাত মুখ তো ধুয়ে ফেল। চোখ ফুলে আছে, মনে হচ্ছে সারা রাত ঘুম নেই। একটু ঘুমিয়ে নাও, তারপর কথা হবে।

সুমন—আরামে শোয়ার কপাল হলে কি আর এমন কুপাত্রের হাতে পড়ি। এখন তোমার ভরসায় এসেছি, যদি আশ্রয় দাও তো থাকবো, না হলে মুখে কালি মেখে ডুবে মরব। তোমার বাড়ীর এককোণে পড়ে থাকব। যতটা পারি তোমার সেবা করব।

পদ্মসিংহ ভিতরে এলে সুভদ্রা তাঁকে ব্যাপারটা জানাল, শুনে তিনি বড় চিন্তায় পড়লেন। এক অপরিচিত স্ত্রীকে তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘরে রাখা উচিত মনে হল না। ঠিক করলেন গজাধরকে ডেকে আনিয়ে তাকে বুঝিয়ে শান্ত করি। স্ত্রীলোকটির এখানে থাকা উচিত নয়।

তিনি বাইরে এসে গজাধরকে ডাকতে লোক পাঠালেন কিন্তু তাকে ঘরে পাওয়া গেল না। কাছারিতে এসে আবার গজাধরের খোঁজ করলেন, ফল আগের মতই হল।

ওদিকে গজাধর যখন জানতে পারল যে সুমন পদ্মসিংহের বাড়ী গিয়েছে তখন নিঃসন্দেহ হল। সকলের কাছে সে পদ্মসিংহের বদনাম করতে লাগল। প্রথমে গেল বিঠলদাসের কাছে। তিনি তো তার কথা বেদবাক্য ভাবলেন। ইনি হচ্ছেন দেশ-সেবক আর সামাজিক অত্যাচারের শত্রু—উদারতা আর অনুদাতার একত্র সংযোগ। তাঁর বিশ্বাসী হৃদয়ে সারা জগতের জন্য সহানুভূতি ছিল না। যেদিন পদ্মসিংহ মুজরার কথা তুলেছে, সেদিন থেকেই তাঁর উপর বিঠলদাসের রাগ। এ খবর শুনে তিনি যেন লাফিয়ে উঠলেন। পদ্মসিংহের বন্ধু আর সহকর্মীদের কাছে গিয়ে খবরটা দিয়ে এলেন। তাদের বল্লেন, দেখুন আপনারা! আমি বলেছিলাম না এই জলসার ভিতরে রঙ্গ আছে। এক

ব্রাহ্মণীকে ঘর থেকে বের করে নিজের ঘরে তুলেছেন। স্বামী বেচারা কেঁদে কেটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই হচ্ছে উচ্চ শিক্ষার আদর্শ! আমি তো ব্রাহ্মণীকে সেখানে দেখেই ব্যাপারটা আঁচ করেছিলাম। তবে বুঝতে পারিনি যে ভেতরে এতদূর গড়িয়েছে।

আশ্চর্যের কথা এই যে যারা পদ্মসিংহের স্বভাব ভালভাবে জানে তারাও এই কথা অবলীলায় বিশ্বাস করে নিল।

পরদিন সকালে জিতন কোন কাজে বাজারে গিয়েছিল। দেখল সর্বত্র ঐ চর্চাই হচ্ছে। দোকানদারেরা জিজ্ঞাসা করে, কি খবর জিতন, নতুন মালকিনের রঙঢঙ কেমন? জিতন এই সব শুনে ঘাবড়ে গিয়ে ঘরে ফিরে বলল—বাবু, বহুজী যে গজাধরের বৌকে ঘরে রেখেছেন। এতে বাজারে আপনার বড় বদনাম ছড়াচ্ছে। মনে হয় ও গজাধরের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এসেছে।

শুনে উকিল সাহেব যেন বোবা হয়ে গেলেন। কাছারী যাবার জন্য আচকান পরছিলেন, এক হাত আস্তিনের ভিতরে অন্যটা বাইরে। পরবার হুঁশ রইল না, যে ভয় করছিলেন, তাই হল। গজাধরের না আসবার কারণ বুঝতে পারলেন, পাথরের মত দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন কি করা যায়, ঘর থেকে বের করে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। ওর কপালে যা আছে হবে, আমি কি করবো? আমি তো বদনামের হাত থেকে বাঁচি। সুভদ্রার উপর রাগ হল। মেয়েটাকে ঘরে রাখতে গেল কেন? আমাকে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত নয়। ওকে তো ঘরে বসে থাকতে হয়, লোকের সামনে আমার মাথা হেঁট হচ্ছে। কিন্তু তাড়িয়ে দিলে বেচারী যাবে কোথায়? এখানে ওর কেউ আছে বলে মনে হয় না। গজাধর ওকে হয়তো ঘরে নেবে না। দু দিন হয়ে গেল, খোঁজ নিতেও এল না। বোধ হচ্ছে ওকে ত্যাগ করাই স্থির করেছে। আমাকে নির্দয়, নিষ্ঠুর ভাববে। কিন্তু বদনাম এড়াবার এ ছাড়া অন্য উপায় নেই, এই ভেবে তিনি জিতনকে বললেন—তুমি আগে আমায় বলনি কেন?

জিতন—হুজুর, আমি তো আজই জেনেছি। আগে জানলে কি আপনাকে বলতাম না?

পদ্মসিংহ—আচ্ছা, এখন অন্দরে গিয়ে সুমনকে বল যে তোমার এখানে থাকায় আমার বদনাম হচ্ছে, যেমন করে হোক আজই যেন এখান থেকে চলে যায়। ভালো কথায় বোলো, লাঠি চালিয়ো না। বেশ বুঝিয়ে বলবে যে এতে আমার বদনাম হচ্ছে।

জিতন খুব খুশি। নিজের সমপর্যায়ের অন্য কোন লোককে মালিকের নেকনজরে পড়তে দেখলে চাকরের যেমন হিংসে হয়, জিতনেরও সুমনের উপর তেমনি হিংসে ছিল। সুমনের চাল চলন তার ভাল লাগত না, বুড়োরা মেয়েদের একটু সাজতে গুজতে দেখলেই সন্দেহের চোখে দেখে, সে ছিল গেঁয়ো।

কালোকে কালো আর শাদাকে শাদা বলতেই সে জানে, কালোকে শাদা বলার ঢঙ সে জানত না। যদিও পদ্মসিংহ একটু ভালো করে বুঝিয়ে বলতে বলেছিলেন, কিন্তু সে গিয়েই সুমনের নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকল। সুমন পান সাজছিল, জিতনের গলা শুনে তার দিকে কাতর চোখে তাকাল।

জিতন বলল—দেখছ কি, উকিল সাহেবের হুকুম আজই এখান থেকে চলে যাও, দেশ জুড়ে বদনাম করে দিলে। তোমার লাজলজ্জা না থাকতে পারে, তাঁর তো লোকলজ্জার ভয় আছে।

কথটা সুভদ্রার কানে যেতে সে এসে বলল—কি হয়েছে জিতন? কি বলছ?

জিতন—কিছু না। মালিকের হুকুম যে ও এখনি এখান থেকে চলে যাক, দেশ জুড়ে বদনাম ছড়াচ্ছে।

সুভদ্রা—তুমি গিয়ে ও'কে একটু এখানে আসতে বল।

সুমনের চোখে জল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল-না বহুজী, ও'কে ডাকছ কেন? কেউ কারো ঘরে কি জোর করে থাকতে পারে! আমি এখনি যাচ্ছি। আর এ দরজার ভিতর পা রাখব না।

বিপত্তির সময় মানুষের মনোবৃত্তি প্রবল হয়ে ওঠে। সে সময় অভদ্রতা ঘোরতর অন্যায় আর সহানুভূতি অসীম কৃপা বলে মনে হয়। উকিল সাহেবের কাছে সুমনের এমন প্রত্যাশা ছিল না। তাই নিজের বিপদে পদ্মসিংহকে দুরাত্মা, ভীরু, নির্দয় আর নীচ বলে মনে হল। আজ তোমার বদনামের ভয় হচ্ছে, মান ইজ্জত বড় প্রিয় মনে হচ্ছে। কাল তো এক বেশ্যার সঙ্গে বসে মাতামাতি করছিলে, তাকে তো মাথায় তুলেছিলে, তখন ইজ্জত যাচ্ছিল না, আজ ইজ্জতে ঘা পড়েছে।

সে অযত্নে হাত-বাক্স তুলে নিল আর সুভদ্রাকে প্রণাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

১১

বাইরে এসে সুমন ভাবল কোথায় যাই, এখন তার যত কষ্ট হচ্ছিল, গজাধরের নির্দয়তায় ততটা হয় নি। এখন তার মনে হল নিজের ঘর ছেড়ে আসা ভুল হয়েছিল। সুভদ্রার ভরসাতেই আমি অমন কাজ করতে সাহস করেছিলাম। এই উকিলসাহেবকে কত ভালো মানুষ ভেবেছিলাম। এখন দেখছি ইনিও নীল-রঙা শিয়াল। নিজের ঘর ছাড়া আমার গতি নেই। কেন

মরতে অন্যের ঘরে গিয়েছিলাম। আমার কি ঘর ছিল না? ও'র ঘরেই কি চিরকাল থাকতে এসেছিলাম? দু'চার দিনে ওর রাগ পড়ে গেলে নিজেই চলে যেতাম। হা ভগবান; রাগের সময় বুদ্ধি উপে যায়, ভুলেও ও'র বাড়ী যাওয়া আমার উচিত হয়নি। আমি নিজেই নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছি। আমাকে না জানি ও কি ভাবছে।

ভাবতে ভাবতে সুমন এগিয়ে গেল, কিন্তু কিছুদূরে গিয়েই তার মত পালটে গেল। কোথায় যাচ্ছিল! ও আমাকে কখনো ঘরে ঢুকতে দেবে না। কত মিনতি করেছিলাম, তবু আমার কথা শোনেনি। রাতে কয়েক ঘণ্টা দেরি হওয়াতেই যখন এত সন্দেহ হয়েছিল, তখন চব্বিশ ঘণ্টার পরে দুর্ভাগ্যের বোঝা মাথায় নিয়ে এখানে আসা আমার উচিত হয় নি। ও তো আমায় দেখলেই দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে। এ ধিক্কার সইব কেন? আমার শুধু থাকার জায়গা চাই। পেট ভরাবার জন্যে কিছু রোজগার করে নেব। কাপড় সেলাই করলেইও পেটের ভাত জোগাড় হবে তবে আর কারো গালমন্দ সইব কেন? এর কাছে কোন সুখে ছিলাম? মিথ্যেই পায়ে বেড়ি ছিল। লোক লজ্জার ভয়ে যদি আমায় থাকতেও দেয় তো উঠতে বসতে খোঁটা দেবে। বাস্ এখন একটা ঘর ঠিক করে নিই। ভোলী কি আমায় এটুকু সাহায্য করবে না? সে তো আমায় বার বার ডাকতো, এইটুকু দয়াও করবে না?

মামার বাড়ী গেলে কেমন হয়? কিন্তু সেখানে কেই বা আছে? মা মরে গেছে। শান্তা আছে। তারই পেট চালানো কঠিন, আমার খোঁজ কে করবে? মাসী টিকতে দেবে না। বাক্যবাণে বিঁধে বিঁধে মারবে। ভোলীর কাছেই যাই, দেখি সে কি বলে, কিছু না হলে গঙ্গা তো কোথাও যায় নি। এই স্থির করে সুমন ভোলীর ঘরের দিকে পা বাড়াল। চারদিকে তাকিয়ে দেখছিল গজাধরের সঙ্গে না দেখা হয়ে যায়।

ভোলীর দরজায় এসে সুমন ভাবল, এর কাছে কেন যাই? কোন পড়শির কাছে গেলে চলবে না? এই সময়ে ভোলী তাকে দেখতে পেয়ে ইশারায় উপরে আসতে বলল, সুমন উপরে গেল।

ভোলীর ঘর দেখে সুমনের চোখ খুলে গেল। আগে একবার যখন এসেছিল, তখন উঠোন থেকেই ফিরে গিয়েছিল। ঘরটা ফরাস, মসনদ, ছবি আর কাঁচের জিনিস দিয়ে সাজানো। একটা ছোট চৌকীর উপরে রুপোর তৈরী পানদান; আরেকটার উপর রুপোর ডিশ আর রুপোর গেলাস রয়েছে। জিনিসপত্র দেখে সুমনের মুখ দিয়ে কথা সরল না।

ভোলী জিজ্ঞাসা করল—আজ এই হাতবাক্স নিয়ে কোত্থেকে আসছ?

সুমন—সে রাম কাহিনী তোমায় পরে শোনাব। এখন দয়া করে আমার জন্যে একটা ছোট বাড়ী ঠিক করে দাও, আমি সেখানে থাকতে চাই।

ভোলী বিস্মিত হয়ে বলল—ব্যাপার কি? কর্তার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি?

সুমন—না, ঝগড়ার কী আছে? আমার ইচ্ছেও তো হতে পারে?

ভোলী—আমার দিকে তাকাও তো, হ্যাঁ, চেহারা তো সব বলছে। হয়েছে কি?

সুমন—সত্যি বলছি, কিছু হয় নি। আমি থাকলে যদি কারো কষ্ট হয় তো কেন থাকবো?

ভোলী—আরে, আমাকে খুলে বলছ না কেন? কি কথায় ঝগড়া হয়েছে?

সুমন—ঝগড়ার কথা নয়, সব যখন শেষ হয়ে গেছে তখন আর বলার কী?

ভোলী—লুকোবার চেষ্টা করলে কি হবে, আমি ঠিক ধরেছি। কিছু মনে না করো তো বলি, আমি জানতাম যে একদিন নিশ্চয় তোমার সঙ্গে খটাখটি লাগবে। আরবী ঘুড়ী আর টাটু ঘোড়া একসঙ্গে জুড়লে কি গাড়ী চলে? তোমার তো বড় ঘরের রাণী হবার কথা, কিন্তু পড়েছ এক হতভাগার হাতে, যে তোমার পা ধোয়াবার যোগ্যও নয়। তুমি বলেই মানিয়ে চলছো, আর কেউ হলে অমন স্বামীর মুখে লাথি মেরে চলে যেত, আল্লা যদি আমায় তোমার রূপ আর চেহারা দিতেন, তা হলে আজ সোনার দালান গেঁথে ফেলতাম। জানিনা তোমার বিদ্যে কতখানি, হয়তো শিক্ষা ভাল হয় নি।

সুমন—আমি দু' বছর এক মেমসাহেবের কাছে পড়েছি।

ভোলী—আরো দু' তিন বছরের শিক্ষা বাকী রয়েছে। এতদিনে আরো পড়ে ফেললে আজ আর ভাবনা হত না। বুঝতে পারতে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি; কি করে জীবনে সুখ পাওয়া যায়। আমরা তো ছাগল ভেড়া নই যে বাপ মা যার গলায় ঝুলিয়ে দেবে তারই হয়ে থাকব। তোমাকে কষ্ট দেওয়া যদি আল্লার ইচ্ছে হত, তো তোমাকে পরীর মত রূপ দেবেন কেন? শুধু এখানেই এই হতচ্ছাড়া নিয়ম চলছে, এখানে মেয়েদের নীচ মনে করা হয়; অন্য সব দেশে তো মেয়েরা স্বাধীন, নিজের পছন্দমতো বিয়ে করে আর যখন তার সঙ্গে বনে না তখন তালাক দেয়। কিন্তু আমরা সেই পুরোনো দাগ ধরেই চলেছি।

সুমন চমকে বলল—কি করব বোন, লোক-লজ্জার ভয়, নইলে আরামে থাকতে কার আর খারাপ লাগে?

ভোলী—এ সব সেই বোকামির ফল। আমার বাপ মাও আমাকে এক বুড়ো মিঞার হাতে দিয়েছিলেন। সেখানে ধন দৌলত আরাম সবই ছিল কিন্তু তার চেহারা দেখলে ঘেন্না হত। কোনক্রমে ছ'মাস কাটিয়ে শেষে বেরিয়ে এলাম। জীবন শুধু কেঁদে কেঁদে কাটাবার জন্যে তো মেলেনি, জীবনে যদি সুখই না পেলাম তো তাতে লাভ কি? প্রথমে আমারও ভয় হত যে খুব নিন্দে হবে, লোকে আমাকে ঘৃণা করবে। কিন্তু ঘর থেকে বের হতে না হতেই আমার এমন নাম হল যে বড় বড় লোকেরা খোশামোদ করতে লাগল। বাড়ীতেই আমি গান শিখেছিলাম, আরো একটু শিখে নিলাম, ব্যস্, সারা শহরে

হৈ চৈ পড়ে গেল। এখানে এমন কোন মানী লোক, কোন মহাজন, কোন মৌলবী, কোন পণ্ডিত আছে যে আমার পা টিপতে পেলে নিজের সৌভাগ্য ভাবে না? মন্দিরে, ঠাকুর বাড়ীতে আমার গান হয়। লোকে কত মিনতি করে ডেকে নিয়ে যায়। এসব আমি অপমান ভাবব কি করে? এখনই যদি খবর পাঠাই তো মন্দিরের মোহন্তজী ছুটে আসবে। একে যদি কেউ অপমান ভাবে তো ভাবুক গে।

সুমন--তা গান শিখতে কতদিন লাগবে?

ভোলী—তোমার ছ'মাসেই হয়ে যাবে। এখানে গান কেউ খোঁজে না, ধ্রুপদ খেয়ালের দরকার নেই। চলতি গজলেই বাজি মাত্। দু' চারটে ঠুংরী আর কিছু থিয়েটারের গান শিখে নিলে তোমাকে পায় কে? এখানে তো ভালো চেহারা আর মিষ্টি বুলি চাই; আর খোদা তো তোমাকে এ দুটো জিনিষ উজাড় করে দিয়েছেন। আমি দিব্যি করে বলছি সুমন, তুমি একবার এই লোহার শেকল ভেঙে ফেল, দেখবে লোকে কেমন পাগলের মত ছুটে আসে।

সুমন চিন্তিত ভাবে বলল—এই ভেবে খারাপ লাগছে যে……

ভোলী—হ্যাঁ-হ্যাঁ, এই বলতে চাইছ যে আজেবাজে লোকের সঙ্গে বেহায়াপনা করতে হয়। প্রথম দিকে আমারো এমনি মনে হয়েছিল, কিন্তু পরে দেখলাম যে এটা মিথ্যে ভয়। আজে-বাজে লোক এখানে আসতে সাহসই পায় না। এখানে তো শুধু মানী লোকেরাই আসে। শুধু তাদেরই ভুলিয়ে রাখতে হয়। যদি ভদ্র হয় তবে তো এমনিতেই ভালো লাগবে। নির্লজ্জতার কথা মনেই হবে না। আর যদি ভালো না লাগে, তবে শুধু কথায় ভুলিয়ে রাখো, যতটা পারো তার কাছে আদায় করো। শেষে বিরক্ত হয়ে সে নিজেই সরে পড়বে, তার বদলে অন্য কেউ আসবে। প্রথম প্রথম অস্বস্তি হয়ই। স্বামীর সঙ্গেও কি হয় না? তার সঙ্গেও যেমন ধীরে ধীরে অস্বস্তি কেটে যায়, এখানেও তেমনি হয়।

সুমন একটু হেসে বলল—তুমি আমার জন্যে একটা ঘর তো ঠিক করে দাও।

ভোলী বুঝল যে মাছ চার ঠোকরাচ্ছে, এবার ছিপ শক্ত হাতে ধরা দরকার। বলল—তোমার জন্যে এই ঘরই তো রয়েছে। এখানে আরামে থাকো।

সুমন—তোমার সঙ্গে থাকব না।

ভোলী—বদনামের ভয় হচ্ছে নাকি?

সুমন—(লজ্জিত ভাবে) না, না, তা নয়।

ভোলী—বংশের নাম ডুববে?

সুমন—তুমি তো শুধু ঠাট্টা করছ।

ভোলী—তবে কি? পণ্ডিত গজাধর পাণ্ডে চটে যাবে?

সুমন—উঃ, তোমাকে কি যে বলি?

ভোলীর কথার উত্তর দেবার মতো কোন যুক্তি যদিও সুমনের হাতে ছিল না, তবু তার আশংকাগুলোকে ঠাট্টা-তামাসা করে ভোলী তার মন আরো

দুর্বল করে ফেলল। অধর্ম আর দুরাচারে মানুষের একটা স্বাভাবিক ঘৃণা থাকে, সেইটে তার হৃদয় তোলপাড় করছিল। মনের এখনকার ভাব কথায় প্রকাশ করবার ক্ষমতা তার ছিল না। একটা বাগানে পাকা ফল ঝুলছে দেখতে পেয়ে যেন তার ভীষণ লোভ হচ্ছে, মালীও নেই, কিন্তু তবু ফল পাড়তে তার সাহস হচ্ছে না।

এমন সময় ভোলী বলল—তা বাড়ীর জন্যে কত ভাড়া দিতে চাও বলো, আমি এখনি মামাকে ডেকে বলে দি।

সুমন—এই দু'তিন টাকার মতন।

ভোলী—আর কি কাজ করবে?

সুমন—সেলাইয়ের কাজ করতে পারি।

ভোলী—আর একলাই থাকবে?

সুমন—হ্যাঁ, আর কে আছে?

ভোলী—কি ছেলেমানুষের মত কথা বলছ? পাগলী, চোখে দেখেও অন্ধ সাজছ? একলা ঘরে একদিনও টিঁকতে পারবে? দিন দুপুরেই ছিঁড়ে খাবে, এর চেয়ে তো নিজের স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়া হাজার গুণ ভালো।

সুমন—ওর মুখ দেখতেও ইচ্ছে করে না। তোমার কাছে আর কি লুকোবো, এই পরশু উকিল সাহেবের ঘরে তোমার মুজরা হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী সুভদ্রা আমায় ভালবাসেন। তিনি মুজরা দেখার জন্যে ডাকেন আর রাত বারোটা পর্যন্ত আমায় ফিরতে দেন নি। তোমার গান শেষ হলে আমি বাড়ী ফিরি। ব্যস্, এতেই ও এত রেগে গেল যে মুখে যা আসে তাই বলে গেল। এমন কি উকিল সাহেবের সঙ্গে পাপের কথাও বলল, তারপর, দূর হ, আর মুখ দেখাস্ না, এইসব বলতে লাগল। বোন, আমি ঈশ্বরের দিব্যি করে বলছি আমি তাকে ঠাণ্ডা করতে অনেক চেষ্টা করেছিলাম। কাঁদলাম, পায়ে পড়লাম, কিন্তু ও ঘর থেকে তাড়িয়ে দিল। তা দিলে আর কি করব? উকিল সাহেবের ঘরে গেলাম। ভেবেছিলাম পাঁচ দশ দিন থাকব, তারপর যা হয় কিছু করবো; কিন্তু নির্দয়ী উকিল সাহেবের বদনাম ছড়াতে লাগল। আর তিনি আমাকে তাঁর বাড়ী থেকে চলে যাবার কথা বলে পাঠালেন। বোন, যত দুঃখেই থাকি না কেন, মনে সন্তোষ ছিল যে নারায়ণের কৃপায় সম্মানের সঙ্গে দিন কাটাচ্ছি, তবু কি না কলঙ্ক হল এখন কপালে যাই ঘটুক, ওখানে আর যাব না।

বলতে বলতে সুমনের চোখ জলে ভরে গেল। ভোলী তাকে ভরসা দিয়ে বলল—আগে হাত মুখ ধোও, কিছু খাও, তারপর পরামর্শ করা যাবে। মনে হচ্ছে সারারাত ঘুম হয়নি।

সুমন—এখানে জল পাওয়া যাবে?

ভোলী হাসিমুখে বলল—সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। আমার চাকর হিন্দু। এখানে কত হিন্দু আসেন, ওঁদের জন্যেই হিন্দু চাকর রেখেছি।

ভোলীর বুড়ী ঝি সুমনকে স্নানঘরে নিয়ে গেল, সেখানে সে সাবান মেখে স্নান করল। তারপর ঝি তার চুল বেঁধে দিল। পরবার জন্যে নতুন রেশমী শাড়ী নিয়ে এল। সুমন উপরে এলে ভোলী তাকে দেখে হেসে বলল—আয়নায় নিজের মুখটা একটু দ্যাখো তো।

সুমন আয়নার সামনে গেল। তার মনে হল সৌন্দর্যের মূর্তি সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে যে এত সুন্দর, সুমন আগে কখনো তা জানত না। লজ্জায় ও গর্বে মুখ পদ্মের মত ফুটে উঠল, চোখে ধরল নেশা। একটা কৌচে শুয়ে পড়ল।

ভোলী নিজের ঝিকে বলল—কি জহুরণ, এবার শেঠজী হাতের মুঠোয় আসবে তো?

জহুরণ বলল—পা চাটবে পা।

একটু পরে চাকর খাবার নিয়ে এল। সুমন জলযোগ সেরে পান মুখে দিয়ে আবার আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নিজের মনেই বলল, সুখ ছেড়ে অন্ধকার কুঠরিতে কেন থাকবো?

ভোলী জিজ্ঞাসা করল—যদি গজাধর প্রসাদ তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে তো কি বলবো?

সুমন উত্তর দিল—বলে দিও এখানে নেই।

ভোলীর মনোরথ পূর্ণ হল, সে নিশ্চিত হল; এতদিন শেঠ বলভদ্র দাস জী যে তাকে এড়িয়ে চলছে, এই লাবণ্যময়ী সুন্দরীকে দেখে এবার ভোমরার মত গুণগুণ করে ঘুরবে।

সুমনের অবস্থা এখন হয়েছে সেই লোভী ডাক্তারের মতন যে রোগী বন্ধুকে দেখতে গিয়ে ভিজিটের টাকা হাত পেতে নেয় না। সংকোচে বলে, এর দরকার কি, কিন্তু পকেটে টাকা গুঁজে দিলে হাসিমুখে চলে যায়।

১২

পদ্মসিংহের বড় ভাই মদন সিংহ। তিনি দেশে গাঁয়ে থেকে সব দেখাশোনা করেন। সামান্য জমিদারী আছে, লেনদেনের কাজও করেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ভামা। তাঁদের একটাই ছেলে। নাম সদন সিং।

মা-বাপের একমাত্র ছেলে ভাগ্যবান হয়, ভালো খাবার জোটে প্রচুর, কিন্তু বকাঝকা একটুও সইতে হয় না। ফলে সদন ছেলেবেলা থেকেই উদ্ধত, জেদী আর ঝগড়াটে ছিল, বয়স বাড়লে যেমন কুড়ে তেমনি রাগী আর দুর্দান্ত হয়ে

উঠল। মা বাপের কাছে সাত খুন মাপ। যত খারাপই হোক চোখের সামনে থাকলেই হল, একদিনের অদর্শনও সইতে পারে না। পদ্মসিংহ কতোবার বলেছেন, একে আমি নিয়ে গিয়ে কোন ইংরেজী স্কুলে ভর্তি করে দেব, কিন্তু তার মা বাপ সে কথায় কান দেয়নি। গাঁয়ের মাদ্রাসায় সদন উর্দু আর হিন্দী পড়েছিল। ভামা ভাবত এর চেয়ে বেশি বিদ্যের দরকার নেই। ঘরে যথেষ্ট খাবার আছে, ঘুরে ঘুরে রোজগার করতে হবে না। আরও না পড়লে ক্ষতি কি ; চোখের সামনে তো থাকবে।

সদনের কিন্তু কাকার সঙ্গে যাবার খুব ইচ্ছে ছিল। কাকার সাবান, তোয়ালে, জুতো, স্লীপার, ঘড়ি ইত্যাদি দেখে তার খুব লোভ হত। বাড়ীতে সব আছে কিন্তু ফ্যাশানের জিনিষ কই ? তার ইচ্ছে হত আমিও কাকার মতো সাজগোজ করে টমটম চড়ে হাওয়া খেতে বেরোব। সে কাকাকে খুব শ্রদ্ধা করত। কাকার কোন কথা অমান্য করত না। মা বাপের কথা শুনত না, প্রায়ই ঝগড়া করত। কিন্তু কাকার সামনে একেবারে শান্তশিষ্ট। কাকার ঠাট-বাট সদনকে বশীভূত করেছিল। পদ্মসিংহ বাড়ী এলে সদনের জন্যে ভালো ভালো জামা-কাপড়, জুতো আনতেন. এসব পেয়ে সদন আনন্দে দিশেহারা হয়ে যেত।

হোলির দিন প্রত্যেকবারই পদ্মসিংহ বাড়ী আসতেন। এক সপ্তাহ আগে চিঠি দিলেন, আমরা যাবো। সদন তো রেশমী আচকান আর বার্নিস করা জুতোর স্বপ্ন দেখছে। হোলির একদিন আগে মদন সিংহ স্টেশনে পাল্কী পাঠালেন সকালেও, বিকেলেও। তার পরের দিনও দুবেলাই পাল্কী গেল। কিন্তু ওদিকে তো ভোলীবাঈএর মুজরোয় মসগুল, বাড়ী যাবে কে ? হোলিতে বাড়ী না আসা পদ্মসিংহের এই প্রথম। ভামা কাঁদতে লাগল। সদনের তো হতাশার সীমা নেই ; না কাপড়, না জামা, কি পরে হোলি খেলে। মদন সিংহ মনমরা হয়ে বসেছিলেন। চারিদিকে শুধু নৈরাশ্যের ছায়া। গাঁয়ের মেয়েরা হোলি খেলতে এল। ভামাকে উদাস দেখে সান্ত্বনা দিতে লাগল, বোন, পর কখনো আপন হয়না। সেখানে দুজনে শহরের বাহার দেখে বেড়াচ্ছে, গাঁয়ে কি করতে আসবে ?' গান বাজনা হল কিন্তু ভামার ভাল লাগল না। মদন সিং হোলির দিন প্রচুর ভাঙ খেতেন। আজ তা ছুঁলেন না, সদন সারাদিন খালি গায়ে মুখ ভার করে বসে রইল। সন্ধ্যার সময় মাকে বলল—আমি কাকার কাছে যাব।

ভামা—সেখানে তোর জন্যে কে বসে আছে ?

সদন—কেন ? কাকা আছে না ?

ভামা—সে কাকা আর নেই। সেখানে কেউ তোর সঙ্গে কথাও বলবে না।

সদন—তবু আমি যাব।

ভামা—বিরক্ত করো না, বল্লাম তো, ওখানে তোমায় যেতে দেব না।

ভামা যত মানা করে সদনের জিদ তত বাড়ে। শেষে রাগ করে সে উঠে-

গেলে সদনও বাইরে চলে গেল। সামনাসামনি জিদ বজায় রাখার সুযোগ না থাকলে বাঁকা পথেই সুযোগ খুঁজতে হয়।

সদন কাকার কাছে পালিয়ে যাবার জন্যে মনস্থির করে ফেলেছিলে। না গেলে এরা কি আমাকে রেশমী আচকান দেবে? দিলে বড়জোর একটা মলমলের কুর্তা দেবে। একটা হার গড়িয়ে দিয়ে ভাবে যেন দিগ্বিজয় করেছে। একটা তাগা গড়িয়ে দিয়ে সারা গাঁ দেখিয়ে বেড়ায়। ভাবে যে আমি তাগা পরে ঘরে বসে থাকবো। আমি তো যাবই, দেখি কে আটকায়?

মনস্থির করে সে ফাঁক খুঁজতে লাগল। রাতে সকলে শুয়ে পড়লে সে চুপিচুপি বেরিয়ে পড়ল। বাড়ী থেকে স্টেশন তিন মাইল দূরে। চাঁদ ডুবে গেছে, চারদিকে অন্ধকার। গাঁ থেকে বের হবার পথে একটা বাঁশঝাড় আছে। সেখানে পেঁাছে সদন একটা চুঁ-চু শব্দ শুনতে পেল। প্রথমে ভয় পেলেও শীঘ্রই বুঝে গেল যে বাঁশে বাঁশে ঘষাঘষিতেই এ শব্দ হচ্ছে। একটু আগে পড়ে একটা আমগাছ। অনেকদিন আগে এক কুমীর ছেলে ঐ গাছ থেকে পড়ে মারা গিয়েছিল। সেখানে পেঁাছে সদনের মনে হল কেউ যেন দাঁড়িয়ে আছে। সর্বাঙ্গে কাঁটা দিল, মাথা ঘুরতে লাগল। ভালো করে তাকিয়ে দেখে—না, কিছু নয়। সাহস করে গাঁ থেকে বেরিয়ে গেল।

গ্রাম থেকে দু' মাইল দূরে একটা গাছ। জনশ্রুতি সেটা ভূতদের আড্ডা, সবাই ঐ গাছেই থাকে। কম্বল গায়ে এক ভূত তাদের সর্দার। সে গায়ে কালো কম্বল জড়িয়ে খড়ম পায়ে যাত্রীদের সামনে হাত বাড়িয়ে কিছু চায়, যাত্রীরা দেবার জন্য হাত বাড়ালেই সে অদৃশ্য হয়ে যায়। কেন যে এই খেলা তা বোঝা যায় না। রাতে সে পথে একলা কেউ হাঁটে না। সাহস করে কেউ গেলে সে অলৌকিক কিছু দেখতে পায়। কেউ বলে গান বাজনা হচ্ছিল, কেউ বলে পঞ্চায়েত বসেছিল। সদনের মনে শুধু এই ভয়টাই রয়েছে। প্রথম দিকে বুকে সাহস এনে সে এগিয়ে গেল। কিন্তু যত এগোয় ততই বুকের বল কমতে থাকে। গাছটা যখন এক ফার্লং দূরে তখন তার পা আর উঠে না। মাটিতে বসে ভাবতে লাগল কি করি, চারদিক চেয়ে দেখে জনমনিষ্যি নেই। একটা জন্তুকে দেখতে পেলেও বুঝিবা একটু ভরসা পেত।

আধ ঘণ্টা লোকজনের প্রত্যাশায় বসে রইল; গ্রামের পথে রাতে লোক চলাচল করে না। আর কতক্ষণ বসে থাকা যায়? ট্রেন আসে একটায়, দেরি হলে সব পণ্ড হয়ে যাবে। কাজেই সাহসে ভর করে চেঁচিয়ে রামায়ণের চৌপায়ী শ্লোক আওড়াতে আওয়াতে এগিয়ে চলল সদন। ভূত প্রেতের ভাবনা মন থেকে সরাতে চাইল। কিন্তু এই সময়ে ঐ ভাবনা গরমকালের মাছির মত তাড়ালেও যেতে চায় না। যায়, আবার ফিরে আসে। শেষে ঘন গাছটা সামনে এসে গেল। নিষুতি রাত, তারার আলো মাটিতে পড়েছে। সদন ভালো করে চেয়ে দেখল কিন্তু সেখানে কিছু দেখতে পেল না, তখন আরো চেঁচিয়ে গান ধরল।

সারা গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। এদিক ওদিক চেয়ে মনে হয় কত জীবজন্তু রয়েছে কিন্তু ভালো করে তাকালে তারা মিলিয়ে যায়, হঠাৎ মনে হল তার ডান দিকে একটা বাঁদর বসে আছে। বুকটা ধড়াস ধড়াস করতে থাকে কিন্তু পরক্ষণেই বাঁদরটা মাটির ঢিপি হয়ে যায়।

সদন যখন গাছের নীচে পেঁছিল তখন তার গলা কাঁপছে, মুখ দিয়ে কোন শব্দ বেরোচ্ছে না, এখন আর ভাবরার সময় নেই, মনে জোর আনতে হবে। হঠাৎ দেখতে পেল কি যেন ছুটছে, চমকে গিয়ে ভালো করে দেখে বুঝল যে ওটা কুকুর, কিন্তু সে শুনেছিল ভূতেরা কখনো কখনো কুকুরের রূপ ধরে আসে। ভয় বেড়ে গেল ; সজাগ হয়ে শত্রুর জন্যে প্রতীক্ষা করতে থাকে। এদিক কুকুর নিঃশব্দে মাথা নিচু করে সরে পড়েছে। সদন চেঁচিয়ে বলল 'ধত্', কুকুর লেজ গুটিয়ে পালাল, সদন তার দিকে দুপা এগোল, ভয় চরম সীমায় গেলে সাহস আসে। সদনের বিশ্বাস হোল ওটা কুকুরই হবে। ভূত হলে নিশ্চয় কোন লীলা দেখাত, তার ভয় কমলেও সে সেখান থেকে গেল না। ভীরু হৃদয়কে যেন লজ্জা দেবার জন্যেই গাছের নীচে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল। শুধু তাই নয়, গাছটার চারপাশ ঘুরে এসে গাছকে ধরে নাড়াবার চেষ্টা করল। এ এক বিচিত্র সাহস। একটা নুড়ি, একটু জল, সামান্য পাতাপড়ার শব্দে তার মৃত্যু হতে পারত কিন্তু হল না ; এই দুঃসাহসিক পরীক্ষায় পাশ করে সদন মাথা উঁচু করে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

১৩

সুমন চলে যাবার পর পদ্মসিংহের আত্মগ্লানি হল, আমি ভাল কাজ করিনি, কে জানে কোথায় চলে গেল, নিজের ঘরে গেলে তো কথাই ছিল না কিন্তু সেখানে সে কক্ষনো যায় নি, মরিয়া হলে সব করতে পারে। কে জানে কুলী জোগাড়েদের পাল্লায় না পড়ে ; তাহলে ছাড় পাওয়া মুস্কিল, দুষ্ট লোকেরা এই সব সুযোগের সন্ধানে থাকে। এদের হাতে না পড়ে। সাহসী লোকে নিরুপায় হলে ভিক্ষে করে ; কিন্তু স্ত্রীলোক অসহায় হয়ে পড়লে খারাপ হয়ে যায়। যুবতী মেয়ের ঘর থেকে বের হওয়া আর মুখ থেকে কথা বের হওয়া সমান। আমার বড় ভুল হয়েছে ; মান মর্যাদা দেখতে গেলে আর চলবে না। সে হয়তো তলিয়ে যাচ্ছে, তাকে বাঁচানো দরকার।

গজাধরের বাড়ী যাবার জন্যে তিনি জামাকাপড় বদলে ঘর থেকে বের হলেন। আবার ভয় হল কেউ না তাঁকে ওর দরজায় না দেখে ফেলে। না জানি

গজাধরই বা কি ভাববে। চেঁচামেচি শুরু করলেই মুসকিল, বাড়ী থেকে বেরিয়েও আবার বাড়ী ফিরে জামা কাপড় ছেড়ে ফেললেন।

বেলা দশটায় যখন খেতে বসলেন তখন সুভদ্রা রণরঙ্গিনী মূর্তি ধরে বলল, 'আজ সকালে সুমনের পিছনে লাগলে কেন? তাড়াতে হলে ভদ্রভাবে করলেই পারতে, তা না করে বুড়ো জিতনকে পাঠালে আর সে যা মুখে আসে তাই বলে গেল। বেচারী টুঁ শব্দটি করল না, নিঃশব্দে চলে গেল, লজ্জায় আমি মাথা তুলতে পারলাম না। আমাকে বললে আমি তাকে বুঝিয়ে দিতাম। গেঁয়ো তো নয় সুবিধামত চলে যেত। না ভেবেচিন্তেই নাদির শাহী হুকুম জারি হয়ে গেল। বদনামের এত ভয়! ও যদি বাড়ী না গিয়ে থাকে তবে কি কম বদনাম হবে - কে জানে কোথায় যাবে, এর জন্যে কে দোষী হবে?

সুভদ্রার মনের সবজ্বালা একসঙ্গে বেরিয়ে এল, পদ্মসিংহ নিজ দোষ স্বীকার করা অপরাধীর মত মাথা নিচু করে শুনছিলেন! তাঁর মনের চিন্তাগুলো সুভদ্রার মুখ দিয়ে বের হয়ে এল, নিঃশব্দে খাওয়া সেরে কাছারি চলে গেলেন। জলসার পর আজ তৃতীয় দিন। আগে কাছারিতে সকলে শর্মাজীকে চরিত্রবান মনে করে তাঁকে সম্মান করত, কিন্তু এখন তিন চার দিন থেকে উকিল বন্ধুরা অবসর পেলেই তাঁর কাছে এসে রসিকতা শুরু করে—শর্মাজী, শুনছি লখনৌ থেকে আজ এক বাইজী এসেছে, খুব ভালো গাইতে পারে, ওর মুজরো করাবেন কি?—ও শর্মাজী শুনেছেন? আপনার ভোলীবাঈএর উপর শেঠ চিমনলাল ভীষণ চটে গেছেন। কেউ বলে, ভাই সাহেব, কাল গঙ্গাস্নানের দিন। ঘাটে খুব বাহার খুলবে। একটা পার্টি লাগিয়ে দিন না। সরস্বতীকেই ডাকুন, গান ভাল নয় বটে যৌবন ফুটে বেরোচ্ছে। এ সব কথায় শর্মাজীর ঘৃণা হয়। তাঁর মনে হল, আমাকে কি বেশ্যাদের দালাল পেয়ে এই সব কথা বলছে।

কাছারির কর্মচারীদের ব্যবহারেও বিশেষ পরিবর্তন দেখা গেল, তারাও অবসর পেলে সিগারেট ধরিয়ে শর্মাজীর কাছে বসে এই সব কথা বলে। শর্মাজী কোন ছুতোয় উঠে যান আর তাদের এড়াবার জন্যে গাছের তলায় লুকিয়ে বসে থাকেন। মনে ভাবেন কি অশুভক্ষণেই জলসার আয়োজন করেছিলাম।

আজও কাছারিতে বেশিক্ষণ থাকতে পারলেন না। এই সব ঘৃণ্য কথাবার্তায় বিরক্ত হয়ে দুটোর সময় বাড়ী ফিরে এলেন। দরজার কাছে আসতেই সদন পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

শর্মাজী অবাক হয়ে বললেন—আরে সদন, তুমি কখন এলে?

সদন—এই গাড়ীতেই এলাম।

পদ্ম—ঘরে সবাই ভালো তো ?

সদন—আজ্ঞে হ্যাঁ সবাই ভালো আছেন।

পদ্ম—কখন রওনা হয়েছিলে ? একটার গাড়ীতে ?

সদন—আজ্ঞে না রাত নটায় বেরিয়েছিলাম, কিন্তু গাড়ীতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বলে মোগলসরাই চলে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে বারটার গাড়ীতে এসেছি।

পদ্ম—যাক, ভালোই হলো ; খাওয়া হয়েছে ?

সদন—আজ্ঞে হ্যাঁ।

পদ্ম—আমি তো এবার হোলিতে যেতে পারলাম না। বৌদি কিছু বলছিলেন ?

সদন—সকলে দু' দিন আপনার পথ চেয়ে বসেছিলেন। বাবা দু' দিন দু বেলাই পাল্কী পাঠিয়েছিলেন, মা কাঁদছিল ; আমারও ভালো লাগত না, রাতে উঠে চলে এলাম।

শর্মা—তবে কি বাড়ীতে বলো নি ?

সদন—বলব না কেন ? কিন্তু আপনি তো ও'দের চেনেন, মা রাজী হল না।

শর্মা—তবে তো তাঁরা চিন্তায় পড়েছেন। কাউকে সঙ্গে নিলেই পারতে। যাক্ ভলোই হলো, তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে হচ্ছিল। এসে গেছ যখন, তখন কোন স্কুলে ভর্তি করে দেব।

সদন—আজ্ঞে, আমারও সেই ইচ্ছে।

শর্মাজী মদনসিংহের নামে তার পাঠালেন, চিন্তা করবেন না, সদন এখানে এসেছে। তাকে স্কুলে ভর্তি করে দেব।

তার পাঠিয়ে আবার সদনের কাছে এসে গ্রামের কথা বলতে লাগলেন। কুর্মী, কাহার, লোহার, চামার কেউ বাদ গেল না যার সম্বন্ধে শর্মাজী কিছু না কিছু প্রশ্ন করলেন না। গ্রামীণ জীবনে একটা মমতা বোধ জন্মায় যা শহরে পাওয়া যায় না। একটা স্নেহের বাঁধন ছোট বড় সবাইকে যেন একসাথে বেঁধে রাখে।

সন্ধ্যা হয়েছে। শর্মাজী সদনকে নিয়ে বেড়াতে বের হলেন। বেণীবাগ বা কুইন্স পার্কে না গিয়ে তিনি দুর্গাকুণ্ড আর কানুজীর মন্দিরের দিকে গেলেন। চিন্তাগ্রস্ত চিত্তে তিনি সুমনের খোঁজে এদিক ওদিক দেখছিলেন। মনে স্থির করলেন যে এবার পেলে আর যেতে দেব না। তাতে যত বদনামই হোক না

কেন। বড়জোর তার স্বামী আমার নামে মামলা করবে। সুমনের ইচ্ছে হলে চলে যাবে। একবার গজাধরের বাড়ী গিয়ে দেখি, হতে পারে সে ঘরে ফিরে গিয়েছে। কথাটা মনে হতে তিনি ঘরে ফিরে এলেন। কয়েকজন মক্কেল তাঁর প্রত্যাশায় বসে ছিল। তাদের কাগজপত্র দেখলেন কিন্তু মন পড়ে ছিল অন্য জায়গায়। কাজ সেরে তিনি গজাধরের বাড়ীর দিকে চললেন, চিন্তা ছিল কেউ যেন দেখে না ফেলে, কেউ যেন পিছু না নেয়। এমনভাবে হাঁটছিলেন যেন এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কোন উদ্দেশ্য নেই। গজাধরের বাড়ী পোঁছে দেখেন যে সে দোকান থেকে ফিরেছে। আজ দুপুরেই সে খবর পেয়েছিল যে শর্মাজী সুমনকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তবু তার সন্দেহ ছিল যে এই সব রটিয়ে তাকে হয়তো শর্মাজী কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন। কিন্তু এখন তাঁকে তার বাড়ীতে আসতে দেখে কি করে তাঁকে অভ্যর্থনা করবে ভেবে পেল না। খাটিয়া থেকে উঠে তাঁকে নমস্কার করল। শর্মাজী নিস্পৃহভাবে বললেন—কি পাণ্ডেজী, মহারাজিন ঘরে ফিরছে তো?

গজাধরের সন্দেহ খানিকটা দূর হল; বলল—আজ্ঞে না, আপনার ঘর থেকে চলে আসার পর আর কোন খোঁজ নেই।

শর্মা—আপনি খোঁজ-খবর করেন নি? আচ্ছা, কী হয়েছিল যে আপনি ওর উপর এত অসন্তুষ্ট হলেন?

গজাধর—মশাই, আসলে সে বেরিয়ে যাবার মতলবে ছিল। আমার কথায় চলে যাবার ছুতো পেয়েছে, পাড়ার বদ মেয়েগুলোই ওর মাথা খেয়েছে। কয়েকমাস ধরেই দেখছি আনমনা হয়ে রয়েছে। হোলির দিন রাত একটায় ফিরতে আমার সন্দেহ হয়। তাই বকেছিলাম বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শর্মা—কিন্তু ওকে ঘরে আনতে চাইলে তো আপনি আমার বাড়ীতে যেতে পারতেন। তা না করে আপনি আমার বদনাম করতে শুরু করলেন. তা ভাই বদনাম কে চায়? আমি তাকে আমার বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। আর কি করতে পারি? এ ব্যাপারে আমার দোষ এই যে আমার বাড়ীতে হোলির জলসা হয়েছে। জলসার এই পরিণাম হবে বুঝলে তো জলসা করাতাম না কিংবা ওকে আমার বাড়ীতে আসতে দিতাম না। এইটুকু অপরাধের জন্যে আপনি সারা শহরে আমার বদনাম ছড়ালেন।

নিজের ভুল বুঝে গজাধর কাঁদতে লাগল। বলল—মশাই, এ জন্যে আমায় যা খুশি সাজা দিন। আমি গেঁয়ো বোকা মানুষ, যে যা বললে তাই বুঝলাম।

ঐ যে ব্যাংক ঘরের বাবু, নাম বোধ হয় বিঠলদাস ; আমি তাঁর ফাঁদে পড়লাম। হোলির আগের দিন আমাদের দোকানে এসে কিছু কাপড় কিনলেন। তারপর আমাকে আড়ালে ডেকে আপনার সম্বন্ধে··কি আর বলবো ? তাঁর কথা শুনেই আমি ভুল করেছি, তাঁকে তো ভালো লোক বলে জানি। সারা শহরে লোকের ভালো করবার জন্যে উপদেশ দিয়ে বেড়ান। এমন ধার্মিক লোকের মুখ থেকে কিছু শুনলে তা বিশ্বাস হয়। জানি না আপনার সঙ্গে তাঁর কি শত্রুতা আছে, আর তিনি তো আমাকে একেবারে ছারখার করে দিলেন।

এই বলে গজাধর আবার কাঁদতে লাগল। নিজের ভুল বুঝে সে কাঁদতে কাঁদতে বলল—হুজুর, এ দোষের জন্য আপনি আমাকে উচিৎ শাস্তি দিন।

শর্মাজীর মনে হল কেউ যেন লোহার শিক গরম করে তাঁর বুকে বিঁধিয়ে দিয়েছে। মাথা ঘামতে লাগল। সামনা সামনি আক্রমণ ঠেকাতে পারতেন কিন্তু পিছন থেকে ছুঁচ ফোটালে তা সইবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। বিঠলদাস তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু। তাঁকে শর্মাজী যথেষ্ট সম্মান করেন। অনেক বিষয়ে তাঁদের মতভেদ থাকলেও তাঁর সদুদ্দেশ্যের প্রশংসা করেন। এমন লোক যখন দেখে শুনে অপরের গায়ে কাদা ছোঁড়ে তখন যত ভালোমানুষি থাক না কেন তাকে ক্রুর বলাই উচিত। শর্মাজী বুঝলেন যে তাঁর অমত সত্ত্বেও হোলিতে জলসা বসানোর জন্যেই বিঠলদাস এই আগুন জ্বালিয়েছে। শুধু লোকের চোখে আমায় ছোট করবার জন্যেই আমার ঘাড়ে মিথ্যে দোষ চাপিয়েছে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—তুমি ও'র মুখের সামনে এই কথা বলতে পারবে ?

গজাধর—হ্যাঁ, সত্যি কথা বলতে ভয়টা কিসের ? এখনই ও'র সামনে বলছি। দেখি কি করে তিনি অস্বীকার করেন ?

রাগের বশে শর্মাজী যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছিলেন। কিন্তু পরে ভেবে দেখলেন যে এ সময় গেলে হৈ চৈ আরো বাড়বে। তাই গজাধরকে বললেন—ভালো কথা, যখন ডাকবো তখনই চলে এসো। কিন্তু এখন নিশ্চিত হয়ে বসে না থেকে স্ত্রীর খোঁজ করো। দিন কাল বড় খারাপ। খরচ পত্রের দরকার হলে আমার কাছ থেকে নিয়ো।

এই বলে শর্মাজী চলে গেলেন। বিঠলদাসের চোরা আঘাত তাঁকে দুর্বল করে দিয়েছিল। তাঁর ধারণা হল বিঠলদাস শুধু বিদ্বেষ বশেই এই ষড়যন্ত্র করেছে। শর্মাজীর মনে হল না যে বিঠলদাস তাঁর হিতৈষী এবং তাঁর মঙ্গলের জন্যই এইসব করছেন।

১৪

পরদিন সকালে পদ্মসিংহ সদনকে সঙ্গে নিয়ে কোন স্কুলে ভর্তি করাতে চললেন। যেখানেই যান, শোনেন 'জায়গা নেই'। শহরে বারোটা স্কুল, কিন্তু সদনের স্থান মিলল না।

নিরুপায় হয়ে শর্মাজী ভাবলেন নিজেই পড়াবেন। সকালবেলা তো মক্কেলদের কাজে কাটে। কাছারি থেকে এসে পড়াতেন, কিন্তু এক সপ্তাহ না যেতেই এ কাজে বিতৃষ্ণা হল। আগে কাছারি থেকে ফিরে কাগজ পড়তেন, হারমোনিয়ম বাজাতেন আর এখন বুড়ো তোতাকে শেখাতে হচ্ছে। প্রায়ই বকতেন, তাঁর ধারণা হল সদনের বুদ্ধি কম। আগে শেখা কথার মানে জিজ্ঞাসা করলে রেগে উঠতেন। বইয়ের পাতা উলটে দেখাতেন শব্দটা প্রথমে কোথায় আছে ; আর প্রশ্নের মাধ্যমে সদনের কাছ থেকেই উত্তর আদায় করতেন। ফলে কাজ হত কম আর বিরক্তি হত বেশি। সদন তাঁর সামনে বই খুলতে চাইত না। তার আফশোষ হতো, কোথা থেকে কোথায় এসে পড়েছি ; এর চেয়ে তো গাঁ ছিল ভালো। চার লাইন পড়াতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চোটপাট। পড়িয়ে শর্মাজী ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করত না। তাঁর বিশ্বাস হলো যে একাজে তিনি অনুপযুক্ত।

পাড়ায় এক মাস্টারমশাই থাকতেন। তিনি মাসিক কুড়ি টাকায় সদনকে পড়াতে রাজি হলেন। এখন চিন্তা হল টাকার জোগাড় হবে কি ভাবে। শর্মাজী শৌখিন লোক ; খরচের পাল্লা বেশ ঝুঁকেই থাকত। হাল ফ্যাশানের বোঝা ভার হয়ে কাঁধে চাপলেও পেছপা হতেন না। অনেক ভেবেচিন্তেও কোন ফল হল না ; তখন সুভদ্রার কাছে গিয়ে বললেন—মাস্টার কুড়ি টাকায় রাজি হয়েছে।

সুভদ্রা—মাস্টারের কি অভাব ? মাস্টার এক কেন একশোজন জুটবে, টাকা কোথায় ?

শর্মা—টাকাও ভগবান জুটিয়ে দেবেন।

সুভদ্রা—ক'বছর ধরে তো দেখছি, ঈশ্বর কোনদিন বিশেষ কৃপা করেন নি। তবে পেট ভরাবার মতো রুটি জোগাড় হয়ে যাচ্ছে। সেই তো ঈশ্বরের কৃপা !

পদ্ম—তাহলে তুমিই কোন উপায় বের কর।

সুভদ্রা—আমাকে যে হাতখরচ দাও, সেটা দিয়ো না। তা হলেই হবে !

পদ্ম—কথা বললেই রেগে যাও কেন ?

সুভদ্রা—রাগের কথা বল কেন ? কোন খরচটা তোমার কাছ থেকে লুকানো আছে ? আমি কোথা থেকেই বা টাকা বের করব ? তোমার ঘরে কি দুধ-ঘিয়ের নদী বইছে, না মেঠাই-মণ্ডার ছাতা পড়ছে ? ঝি ছাড়া চলবেই না, রাঁধুনী থাকা দরকারী, তবে আর কোন খরচটা কম করতে বলছ ?

পদ্ম—দুধটাই বন্ধ করে দাও।

সুভদ্রা—বেশ তো বন্ধ করে দাও। তুমি না খেলেও সদনের জন্যে তো নিতেই হবে।

শর্মাজী আবার ভাবতে বসলেন। পান তামাকের খরচ দশ টাকার কম নয়। আরও ছোটখাট বিষয়ে কিছু না কিছু বাঁচানো চলে। কিন্তু সে সব কথা তুললে সুভদ্রা অসন্তুষ্ট হবে। সুভদ্রার কথায় তিনি স্পষ্টই বুঝলেন যে এ বিষয়ে তাঁর সহানুভূতি নেই। মনে মনে বাইরের খরচের হিসেব করতে লাগলেন। শেষে বললেন—আচ্ছা, আলো আর পাখার খরচ তো কিছু কমানো যেতে পারে?

সুভদ্রা—হ্যাঁ, তা হতে পারে। আলোর দরকার কি? সন্ধ্যে হতে না হতেই বিছানা নিলেই চলবে। কেউ দেখা করতে এলে ডেকে ডেকে ফিরে যাবে। না হয় বিকেলে বেরিয়ে রাত নটায় ফিরলেই হবে। আর হাত-পাখাতেও তো কাজ চলতে পারে; বিজলী যখন ছিল না, তখন কি লোকে গরমে মরে যেত?

পদ্ম—ঘোড়ার খোরাকী দানা কম করে দিই?

সুভদ্রা—হ্যাঁ, ভালই বলেছ, ঘোড়াকে দানা খাইয়ে কি হবে, ঘাসের তো অভাব নেই। হাড়-জিরজিরে হবে বৈ তো আর কিছু নয়, মরে বেঁচে কাছারি-টুকু তো নিয়ে যাবে। কেউ তো বলতে পারবে না যে উকিল সাহেবের গাড়ী নেই।

পদ্ম—প্রতিমাসে মেয়েদের পাঠশালায় দু টাকা, অনাথালয়ের জন্য চাঁদা তিন টাকা আর ক্লাবের জন্যে ন' টাকা দিই। এসব বন্ধ করে দিলে কেমন হয়?

সুভদ্রা—খুব ভাল হবে। সংসারের নিয়মই এই যে প্রথমে নিজের ঘরে আলো জেবলে পরে মসজিদে জ্বালাতে হয়।

শর্মাজী সুভদ্রার ব্যঙ্গোক্তি শুনে মনে মনে রাগ করলেও ধৈর্য ধরে বললেন—এইভাবে মাসে পনেরো টাকা আমি দেব, বাকী পাঁচ টাকার ভার তোমার উপর, আমি হিসেব টিসেব চাইছি না, কোন রকমে এটুকু জোগাড় কর।

সুভদ্রা—হ্যাঁ হবে; এ আর শক্ত কি। এক বেলা রান্না হোক, দুবেলা রেঁধে কি হবে? সংসারে কোটি কোটি লোক এক বেলা খাচ্ছে। তারা রোগাও হয় না, অসুখেও পড়ে না।

শর্মাজী অস্থির হয়ে পড়লেন। ঘরে ঝগড়া-ঝাঁটি করতে চাইতেন না কিন্তু আর সামলাতে পারলেন না। বললেন—তুমি কি চাও যে সদনের জন্যে মাস্টার না রাখি আর তার জীবনটা নষ্ট হোক? কোথায় আমাকে সাহায্য করবে, না উলটে বাগড়া দিচ্ছ। সদন আমার সেই দাদার ছেলে, যিনি নিজের মাথায় আটা-ডাল নিয়ে আমাকে স্কুলে ভর্তি করতে এসেছিলেন। সেদিনের কথা আমি

ভুলি নি। তাঁর ভালবাসার কথা মনে পড়লে তাঁর পায়ে পড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে। তোমার এখন আলো পাখার খরচ, পান তামাকের খরচ, ঘোড়া সহিসের খরচ কম করা কষ্টকর মনে হচ্ছে; কিন্তু দাদা আমাকে বার্নিশ করা জুতো পরিয়ে নিজে খালি পায়ে থাকতেন। আমার পরনে রেশমী জামা কাপড়, আর তিনি ছেঁড়া জামা পরেই কাটাতেন। তাঁর ঋণের বোঝা সারা জীবনেও শোধ হয় না। সদনের জন্য আমি সব কষ্ট সইব। সেজন্য যদি আমাকে পায়ে হেঁটে কাছারি যেতে হয়, উপোস করতে হয়, নিজের হাতে তার জুতো পরিষ্কার করতেও হয় তো তাতে আমার আপত্তি নেই। না হলে আমার মতো কৃতঘ্ন কেউ নেই।

গ্লানিতে সুভদ্রা সঙ্কুচিত হল। যদিও শর্মাজী নিজের মনের কথা সরল মনেই বলেছিলেন তবু সুভদ্রার মনে হল যে তাকে লজ্জা দেবার জন্যেই বলা হচ্ছে। মাথা নিচু করে বলল—তা আমি কখন বলেছি যে সদনের জন্যে মাস্টার রেখ না? যা করতে হবে তা করে ফেল, কিছু হলে দেখা যাবে। যখন দাদাজী তোমার জন্যে এত কষ্ট করেছেন, তখন তোমারও সদনের জন্যে কিছু করা উচিত। আমাকে যা করতে বলবে তাই করবো। প্রথম থেকেই তোমার মাস্টার রাখা উচিত ছিল। এতে ইতস্ততঃ করবার কী আছে? এতদিনে তো অনেকটা এগিয়ে যেত। এত বছর নষ্ট করে যখন পড়ানোই ঠিক করেছ, তখন একদিনও নষ্ট করা উচিত নয়।

সুভদ্রা নিজের লজ্জার শোধ নিল শর্মাজীকে লজ্জা দিয়ে। শর্মাজী নিজের ভুল স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। নিজের ছেলে হলে কখনো এত আগুপাছু করতেন না।

সুভদ্রা নিজের ব্যবহারেও মনে মনে লজ্জিত হল। সে পান সেজে শর্মাজীকে দিল। যেন সন্ধিপত্র দেওয়া হল। শর্মাজী পান নিলেন, সন্ধি মঞ্জুর হয়ে গেল।

তার যাবার মুখে সুভদ্রা জিজ্ঞাসা করল—সুমনের কিছু খোঁজ পাওয়া গেল?

শর্মাজী—কিছু না, জানিনা কোথায় গেল, গজাধরকেও দেখা যাচ্ছে না। শুনছি ঘর দোর ছেড়ে কোন্ দিকে বেরিয়ে গেছে।

পরদিন থেকে মাস্টারমশাই পড়াতে এলেন, নটা পর্যন্ত পড়িয়ে চলে যেতেন। তারপর সদন স্নানাহার শেষে শুত। একলা বসে মন খারাপ লাগত, সঙ্গীসাথী নেই, হাসি ঠাট্টা হয় না, ভাল লাগবে কেন? তবে সকালে একটু ব্যায়াম করে নিত। তার এটা একটা সখ, গাঁয়ে সে একটা আখড়া করিয়েছিল। এখানে আখড়ার অভাবে ঘরের মধ্যেই ডন বৈঠক সেরে নিত। বিকেলে শর্মাজী তাকে ফিটন দিতেন। তখন সদন স্যুট পরে গর্বের সঙ্গে বেড়াতে বেরোত। শর্মাজী পায়ে হেঁটে বেড়াতেন। তিনি পার্ক কিম্বা ছাউনীর দিকে যেতেন। সদন কিন্তু

সেদিকে যেত না। বায়ুসেবনে যে দার্শনিক আনন্দ পাওয়া যায় সে জ্ঞান তার ছিল না। শুধু হাওয়ার শীতলতা, সবুজ ঘাসে ভরা মাঠের নির্জনতা আর সুন্দর দৃশ্যের নিঃস্তব্ধতা—এ সবের আনন্দময় রসাস্বাদনের ক্ষমতা সদনের ছিল না। সবে যৌবনে পা দিয়েছে, মাথায় শুধু সাজগোজের নেশা। তার যেমন রূপ তেমনি বলিষ্ঠ সুগঠিত শরীর। গ্রামে থেকেছে, লেখাপড়ার বালাই ছিল না, ছিল না মাস্টারের ভয় বা পরীক্ষার চিন্তা। সের সের দুধ খেত। ঘরে মহিষ বাঁধা, ডেলা ডেলা ঘি খেত, তার উপর ব্যায়ামের নেশা। সুডোল শরীর, চওড়া বুক, ঘাড় সোজা, সারা গা সিঁদুরের মতো টকটকে।

শিক্ষা আর জ্ঞান থেকে শরীরে যে গাম্ভীর্য আর কোমলতা ফুটে ওঠে সদনের তা ছিল না; তার মুখে বীরত্ব আর ঔদ্ধত্য ফুটে উঠত। পাগল-করে দেওয়া চোখদুটো যেমন সতেজ তেমনি চঞ্চল। সে তো আর বাগানের কলম-করা গাছ নয়; বনের সুদৃঢ় বৃক্ষ, নির্জন পার্ক বা ময়দানে তার ভাল লাগবে কেন? সেখানে কে তাকিয়ে দেখবে তার রূপ যৌবন! তাই তার বেড়াবার জায়গা ছিল কখনো দালমণ্ডীর দিকে, কখনো চকের দিকে। তার রঙ রূপ, সাজ পোষাকের বাহার দেখে ছেলে বুড়ো সকলেরই চোখ কপালে উঠত। তাকে দেখে যুবকদের ঈর্ষা হত, বুড়োদের বুকে জাগত স্নেহ। পথ চলতে চলতে লোকে তাকে দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ত। দোকানদারদের মনে হত এ নিশ্চয় কোন অতি সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে।

দোকানগুলোর উপরে ছিল রূপের বাজার। সদনকে দেখা গেলেই সে বাজারে হুলস্থুল পড়ে যেত। বেশ্যার দল ঢাকা দালানে দাঁড়িয়ে তার উপর মোহিনী কটাক্ষের তীর ছুঁড়ত। দেখি এই পথ-ভোলা পায়রা কোন ছাতে বসে? এই সোনার পাখী কার জালে আটকা পড়ে?

সদাচরণে প্রবৃত্তি ও আত্মসম্মান বোধ কোনটাই সদনের ছিল না। বাজারের মধ্যে তার ফিটন ধীরে চলত আর সদনের চোখ গিয়ে পড়ত সেই মেয়েদের উপর। যৌবনের প্রারম্ভে আমরা নিজেদের কু বাসনা ব্যক্ত করে গর্বিত হই, আর যৌবনের শেষে নিজের সদ্‌গুণ প্রকাশ করে আনন্দ পাই। সদন নিজেকে রসিক বলে প্রমাণ করতে চাইত। প্রেমের চেয়েও বদনাম তার কাছে বড়। এ সময় যদি তার কোন বন্ধু থাকত তাহলে সে তাকে নিজের কাল্পনিক কুকীর্তির কথা বিস্তারিত ভাবে শোনাত।

ধীরে ধীরে সদনের মনের চঞ্চলতা বৃদ্ধি পেল। মাস্টার এসে নিজের মনে পড়িয়ে যায়। পড়ায় সদনের মন বসে না। মন সব সময় বাজারে পড়ে থাকে। মেয়েদের হাবভাব, মৃদু হাসি—সব সময় চোখের সামনে ভাসে। সারাদিন এইভাবে কাটিয়ে সন্ধ্যায় সেজেগুজে দালমণ্ডী রওনা হত। ফলে যা হবার তাই হল।

তিন চার মাসের মধ্যেই তার সংকোচ কেটে গেল। ফিটনে দুজন লোক দুতের মতো সব সময় থাকত। তাই বাগানের ফুলের দিকে হাত বাড়াতে আর সাহস হত না। তাদের এড়াবার জন্য অনেক ভেবে সে শর্মাজীকে বলল—কাকা, আমাকে একটা ঘোড়া দিন। ফিটনে কুঁড়ের মত বসে থাকতে ভাল লাগে না। ঘোড়ায় চড়লে ব্যায়ামও হবে আর ভালো করে ঘোড়ায় চড়াও শিখবো।

সুমনের চলে যাবার দিন থেকে শর্মাজী চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। মক্কেলরা বলাবলি করত, আজকাল উকিল সাহেব কেমন যেন হয়ে গেছেন, কথায় কথায় রাগ। আমাদের কথা না শুনলে মামলা চালাবেন কি করে? পয়সা দিলে কি উকিলের অভাব? গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ফলে শর্মাজীর আয় দিন দিন কমতে লাগল। এ সময় সদনের প্রস্তাব শুনে বললেন—এই ঘোড়াটার পিঠেই চড় না কেন? দু'চার দিনে ঠিক হয়ে যাবে।

সদন—আজ্ঞে না, বড় রোগা, চলবে না, কোন রকম চালও শেখেনি। কাছারি থেকে খেটেখুটে ফিরে আর কি ছুটতে পারে?

শর্মা—আচ্ছা, খোঁজ করছি, পেলেই কিনে নেব।

শর্মাজী মনে মনে ব্যাপারটা এড়াতে চাইছিলেন। সাধারণ ঘোড়াও আড়াই-তিন শ'য়ের নিচে মিলবে না, তার উপর মাসে অন্ততঃ ২৫ টাকা করে খরচ। এ সময় তাঁর এত খরচ করবার সামর্থ ছিল না, কিন্তু সদন কি মানবে? নিত্য তাগাদা দিত; এমন কি শেষে দিনে কয়েকবার ধরে তাগাদা শুরু করল। তাকে দেখলেই শর্মাজীর মুখ শুকিয়ে যেত। যদি নিজের আর্থিক অবস্থা তাকে স্পষ্ট করে বলতেন তবে সদন থেমে যেত। কিন্তু শর্মাজী এসব বলে সদনকে কষ্ট দিতে চাইতেন না।

সদন সহিসদের বলে রেখেছিল, কোথাও ঘোড়া বিক্রির খবর পেলে তাকে জানাতে। সহিসরা দালালির লোভে উঠে পড়ে লাগায় ঘোড়ার খোঁজ পাওয়া গেল। ডিগবী নামে এক সাহেব বিলেত যাবে। তার ঘোড়া বিক্রি হবে। সদন ঘোড়া দেখতে গেল, চড়ে দেখল। ভীষণ খুশি, শর্মাজীর কাছে এসে বলল—ঘোড়া দেখতে যাবেন চলুন, আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

শর্মাজীর পালাবার আর কোন উপায় নেই। ডিগবী সাহেবের বাড়ী গিয়ে ঘোড়া দেখলেন। দাম ৪০০ টাকার এক পয়সাও কমে হবে না।

এখন এত টাকা আসবে কোথা থেকে। ঘরে সুভদ্রার কাছে দু'এক শো থাকতে পারে কিন্তু সুভদ্রার কাছ থেকে বের করা শক্ত। ব্যাংকের ম্যানেজার চারুচন্দ্র বাবুর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। তাঁর কাছেই ধার নেবেন ভাবলেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত শর্মাজী কারও কাছে ধার নেন নি। ইচ্ছে হলেও ধার চাইতে সাহস হল না। যদি না দিতে চান? এই প্রত্যাখ্যানের ভয় তাঁকে চেপে ধরেছিল।

ইতিমধ্যে সদন ডিগবী সাহেবের ঘোড়া নিয়ে এল, জিন-সাজের দাম ৫০

টাকা, পরের দিন সকালেই টাকা দিতে হবে, হাতে সময় রাতটুকু। শর্মাজীর মত লোকের পক্ষে এ টাকা জোগাড় করা মুশকিল নয়। কিন্তু তিনি চোখে অন্ধকার দেখলেন। নিজের ক্ষুদ্রতা সম্বন্ধে আজ তাঁর জ্ঞান হল, যে কখনো উঁচু পাহাড়ে চড়েনি এক ছোট টিলায় উঠলেই তার মাথা ঘুরে যায়। এ অবস্থায় সুভদ্রার শরণ ছাড়া কোন উপায় খুঁজে পেলেন না। তাঁর কাঁদো কাঁদো চেহারা দেখে সুভদ্রা জিজ্ঞাসা করল—এমন উদাস চেহারা কেন? শরীর ভাল আছে তো?

শর্মাজী মাথা নিচু করে উত্তর দিলেন—হ্যাঁ, শরীর তো ভালই আছে।

সুভদ্রা—তবে এমন দেখাচ্ছে কেন?

শর্মা—কি আর বলবো? সদনের জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়েছি। ক'দিন ধরে ঘোড়ার জন্যে বায়না ধরেছে। আজ ডিগবী সাহেবের বাড়ি থেকে ঘোড়া নিয়ে এসে মাথায় সাড়ে চারশো টাকার বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে।

সুভদ্রা বিস্মিত হয়ে বলল—এত ব্যাপার ঘটেছে আর আমি কিছুই জানলাম না।

শর্মা—তোমাকে বলতে ভয় পাচ্ছিলাম।

সুভদ্রা—ভয়টা কিসের? আমি কি সদনের শত্রু যে শুনলে জ্বলে পুড়ে মরে যাবো?…আর কটা দিনই বা ও আবদার করতে পারবে? আর এমন কি খরচের ব্যাপার? ভগবান তোমায় ভালো রাখলে এমন চার পাঁচশো টাকা কত আসবে, কত যাবে। ছেলের মনটা তো ভাল থাকবে। সেই ভাইয়েরই তো ছেলে যিনি তোমাকে মানুষ করেছেন।

শর্মাজী এই ব্যঙ্গের জন্যে তৈরী ছিলেন আর তাই সদনের নিন্দে করে কথা শুরু করেছিলেন, কিন্তু সদনের অন্যায় আবদারের চেয়ে নিজের আর্থিক দুরবস্থার জন্য বেশী কষ্ট পাচ্ছিলেন। সুভদ্রার সহানুভূতির জন্য তার মন গলানো দরকার। বললেন—যাই বলো, তোমাকে বলতে ভয় হচ্ছিল, মনের কথাই বলছি। ছেলেদের খাওয়াতে, খেলনা কিনে দিতে সবাই চায়, তবে ঘরে যদি পয়সা থাকে। সারাদিন এই চিন্তা লেগে রয়েছে, কোন উপায় খুজে পাচ্ছি না। সকালে ডিগবী সাহেবের লোক এলে তাকে কী বলবো? অসুখে পড়লেও একটা ছুতো হত।

সুভদ্রা—এতে আর মুস্কিল কি? সকালে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থেকো, আমি বলে দেব যে আজ শরীর খারাপ।

শর্মাজী ম্লান হেসে বললেন—লোক না হয় ফিরেই যাবে। কিন্তু ডিগবী সাহেব তো পরশু চলে যাচ্ছে। কালই কোন উপায়ে টাকার জোগাড় করতেই হবে।

সুভদ্রা—তা সে উপায়টা তো আজ করলেই হয়।

শর্মা—আর জ্বালিয়ো না। আমার বুদ্ধিতে কুলোলে কি তোমার শরণ নিতাম? নিজেই করতাম না? নিরুপায় হয়েই তো তোমার কাছে এসেছি। বল, কি করি?

সুভদ্রা—আমি কি বলবো? তুমি তো ওকালতি পাশ আর আমি মিডিল পাশও নয়। আমার বুদ্ধি কতটুকু! বুঝি দরজায় ঘোড়া বাঁধা দেখলে শত্রুর বুক ফাটবে। আর সদনকে সেটা চড়তে দেখে চোখ জুড়োবে।

শর্মা—তাইতো জিজ্ঞাসা করছি এ ইচ্ছা কি করে পুরো হবে?

সুভদ্রা—ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখো; উপায় একটা হবেই।

শর্মা—তুমি আবার ঠাট্টা করছ?

সুভদ্রা—আর কি করতে পারি আমি? যদি তুমি ভেবে থাকো যে আমার কাছে টাকা আছে, তবে সেটা ভুল জেনো, অতো কথা জানি না। এই নাও সিন্দুকের চাবি, একশো কি সওয়া শো টাকা পড়ে আছে, নিয়ে যাও। বাকি টাকা অন্য কোথাও জোগাড় করো। তোমার তো কতো বন্ধু রয়েছে, দু চারশো টাকা জোগাড় হবে না?

যদিও পদ্মসিংহ এই উত্তরই আশা করেছিলেন, তবু নিজের কানে তা শুনে যেন অথৈ জলে পড়লেন। বোঝা মোটেই কমল না। চুপ করে আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন।

সুভদ্রা সিন্দুকের চাবি দিতে রাজী হলেও সিন্দুকে ১০০ টাকার জায়গায় ৫০০ টাকা ছিল। এটা সুভদ্রার দু'বছরের সঞ্চয়। টাকাটা বার বার দেখে সুভদ্রা আনন্দ পেত, কখনো ভাবত বাপের বাড়ী যাবার সময় বৌদির জন্য কংকণ ও আর সকলের জন্য শাড়ী কিনে নিয়ে যাব। কখনো ভাবত যদি হঠাৎ দরকার হয় আর শর্মাজী টাকার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে তখন এই টাকা বের করে দিলে কত খুশি হবে, অবাক হয়ে যাবে। সাধারণতঃ মেয়েদের মধ্যে এ ভাব দেখা যায় না। নিজের গয়না গড়াবার জন্যই তারা টাকা জমায়। কিন্তু সুভদ্রা ধনী ঘরের মেয়ে, গয়নার সখ মিটে গিয়েছিল বলে তার উপর যেমন টান ছিল না।

টাকার উপরও তার বিন্দুমাত্র লোভ ছিল না। তবে অদরকারী কাজে সে খরচ করতে চাইত না। তাই শর্মাজীর শুকনো মুখ দেখে বলল—তুমি অনর্থক এ বোঝা ঘাড়ে নিয়েছ। সোজা বললেই হত, এখন হাতে টাকা নেই, পরে দেখা যাবে। এ ভাবে আসকারা দেওয়া কি ভালো? আজ ঘোড়ার বায়না, কাল মোটর গাড়ীর সখ হলে তখন কি করবে? মানছি তোমার দাদা তোমার জন্যে অনেক করেছেন, কিন্তু সব কাজ নিজের ক্ষমতা বুঝেই তো করা উচিত। দাদা শুনলেও তোমার উপর খুশী হবেন না।

এই বলে সে উঠে সিন্দুক খুলে পাঁচটা পুটলি শর্মাজীর সামনে ফেলে দিয়ে বলল—নাও এতে ৫০০ টাকা আছে, যা ইচ্ছে হয় কর। রেখেছি তো তোমার

কাজে হঠাৎ লাগতে পারে বলে। যাক্ এতে তোমার ভাবনা তো দূর হবে। এখন কিন্তু সিন্দুকে একটা কানাকড়িও রইল না।

শর্মাজী হতভম্ব হয়ে টাকা দেখলেন কিন্তু হাত বাড়ালেন না। মনের ভার কমল, মুখে শান্ত ভাব এল। কিন্তু সুভদ্রা যে উল্লাস দেখতে পাবে ভেবেছিল তা দেখা গেল না, ক্ষণিকের মধ্যে সে মুখে কষ্ট আর লজ্জার ভাব ফুটে উঠল। তাঁর মনে হল এ টাকা নেওয়া অনুচিত। হয়তো অনেক কষ্ট করে সুভদ্রা এ টাকা জমিয়েছে।

সুভদ্রা বলল—অনায়াসে টাকা পেয়েও মুখে হাসি নেই?

শর্মাজী করুণ চোখে তাকিয়ে বলল—কি করে হাসি আসবে? তুমি অনর্থক এই টাকা বের করছ! আমি ঘোড়া ফিরিয়েই দিইগে। বলে দেব কুলক্ষণ আছে, অথবা অন্য খুঁত দেখিয়ে দেব। সদনের ভাল লাগবে না, তবু কি করা যাবে।

যদি টাকা দেবার আগে সুভদ্রার মুখ থেকে এই প্রস্তাব বের হত, তবে শর্মাজী নিশ্চয় রাগ করতেন এবং এমন কাজ যে অভদ্রতার পর্যায়ে পড়ে তা সুভদ্রাকে একচোট শোনাতেন; কিন্তু সুভদ্রার এই নিঃস্বার্থ ত্যাগ তাঁকে অভিভূত করে দিল। তাঁর কাছে এখন সমস্যা হচ্ছে যে সততার পরিচয় কোথায় দেওয়া উচিত ঘরে না বাইরে? তিনি নিশ্চিত জানতেন ঘরে এর দরকার আছে কিন্তু পরের কাছে মর্যাদা পাবার জন্য আমরা ঘরের দিকে কবেই বা তাকিয়েছি।

সুভদ্রা বিস্মিত হয়ে বলল—কি বলছ গো? এর মধ্যেই মত বদলে গেল। ঘোড়া ফেরৎ দিলে কথার খেলাপ হবে না? ডিগবী সাহেব ফেরৎ নিলেও এতে তাঁর উপর কতখানি অন্যায় করা হয়? বেচারা বিলেত যাবার জন্যে তৈরী হয়ে বসে আছে, তাঁর এটা কত খারাপ লাগবে? এতো তুচ্ছ কথা, টাকা তাঁকে দিয়ে দাও। টাকা তো এমন দিনের জন্যেই জমিয়ে রাখা। সত্যি আমার কোন দরকার নেই, আমি হাসিমুখেই দিচ্ছি। আর না হয় টাকাটা পরে ফেরৎ দিয়ো, এখন ধার বলেই নাও।

ব্যাপারটা একই, তবে কথার মারপ্যাঁচে শর্মাজী সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—হ্যাঁ, এই সর্তেই নিতে পারি। মাসে মাসে কিস্তিতে শোধ দিয়ে দেব।

১৫

প্রাচীন ঋষিরা ইন্দ্রিয় দমনের দুটি উপায় বলেছেন—এক রাগ, অন্যটি বৈরাগ্য। প্রথম উপায় অত্যন্ত কঠিন, দুঃসাধ্য বলা যায়। কিন্তু আমাদের

নাগরিক সমাজ নিজের মুখ্য স্থানটিতে মীনা বাজার সাজিয়ে কঠিন মার্গ গ্রহণ করেছেন। তাঁরা গার্হস্থের পঙ্কে পদ্ম ফোটাতে চেয়েছেন।

জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন বাসনা প্রবল হয়ে ওঠে ; শৈশবে মিষ্টান্নে প্রীতি বার্ধক্যে লোভের প্রাবল্য আর যৌবনে প্রেম ও উপভোগের আকর্ষ দেখা যায়। এই অবস্থায় মীনাবাজারে ঘুরে বেড়ালে মনে একটা বিপ্লব সৃষ্টি হয়। দৃঢ়চেতা, লজ্জাশীল আর নিস্পৃহ ব্যক্তি নিজেকে সামলাতে পারে। অবশিষ্টেরা পা পিছলে গর্তে পড়ে।

আমরা মদের দোকান বসতি থেকে দূরে রাখতে চাই, জুয়ার আড্ডাকে ঘৃণা করি, কিন্তু বেশ্যাদের আমরা চকবাজারে কোঠার উপর পশরা সাজাতে দিই। একে পাপের প্রশ্রয় ছাড়া আর কি বলা যায় ?

বাজারের সাধারণ জিনিষই মনকে টানে। দরকার না হলেও শুধু ভাল লাগে বলে তা আমরা কিনে ফেলি। কাজেই অমূল্য রূপরাশি দেখে কে না ঝাঁপিয়ে পড়বে ? আমরা কি এ টুকুও জানি না ?

বিপক্ষে দলের বক্তব্য, এ আশঙ্কা অমূলক। হাজার হাজার যুবক বাজারে ঘোরে, তাদের মধ্যে অল্পই কুপথে যায়। তারা অধঃপতনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ চায়। কিন্তু তারা জানে না যে দুর্বলতা হাওয়ার মতই অদৃশ্য বস্তু ; কাজ দেখেই তার অস্তিত্ব জানা যায়। আমরা এত নির্লজ্জ, এত ভীরু কেন ? আমাদের আত্ম-গৌরবের অভাব কেন ? আমাদের হতবল হবার কারণ কি ? এ সবই মানসিক দুর্বলতার লক্ষণ।

সেই জন্য এই বিষ-নাগিনীদের বাসস্থান জনবসতি থেকে দূরে হওয়া দরকার। তাহলে সেখানে বেড়াতে যেতে আমাদের সংকোচ হবে, সেখানে যাবার কোন ছুতো থাকবে না, এমন বেহায়া কমই আছে যারা এই মীনাবাজারে যেতে সাহস করবে।

ইতিমধ্যে কয়েকমাস কেটে গিয়েছে, বর্ষা এসে গেল। মেলার ধুম লেগেছে। সদন ফুল বাবু সেজে তেজী ঘোড়ার পিঠে ঘুরে বেড়ায়। তার বুকে প্রেম-লালসার আগুন জ্বলছে। এখন তার সাহস এত বেড়েছে যে সে দালমণ্ডীতে পানের দোকানে বসে পান খায়। তারা তাকে উচ্ছন্নে যাওয়া বড়লোকের ছেলে বলে ভাবে আর রূপের হাটের নতুন নতুন খবর জোগায়। কার গান ভালো, কে দেখতে সবচেয়ে ভালো ; এ বাজারে শুধু এই সব কথাই হত, সদন এ সব বেশ আগ্রহের সঙ্গে শোনে, এতদিনে সেও বেশ রসজ্ঞ হয়ে উঠেছে, আগে অর কাছে গজল নিরর্থক মনে হত কিন্তু আজ তা শুনে হৃদয়ে স্পন্দন জাগে। সঙ্গীতের মধুর সুর তাকে উন্মত্ত করে ; অতি কষ্টেই তাকে কোঠায় যাবার ইচ্ছা সামলে রাখতে হয়।

পদ্ম সিংহ সদনকে কেতাদুরস্ত করতে চাইতেন, কিন্তু তার ফুলবাবু সাজা

তিনি ভালচোখে দেখতেন না। তিনি পার্কে বা ময়দানে নিত্য বেড়ালেও সেখানে সদনকে কখনো দেখতে পেতেন না ; ভাবতেন দালমণ্ডীর হাওয়া লাগল নাতো ছেলেটার ?

তিনি দু'তিন বার সদনকে দালমণ্ডীতে দেখেছিলেন। তাঁকে দেখলেই সে কোন দোকানে ঢুকে জিনিষ কিনতে আরম্ভ করত। শর্মাজী তাকে দেখে মাথা নিচু করে চলে যেতেন। ইচ্ছা ছিল তাকে ওখানে যেতে মানা করেন কিন্তু লজ্জায় সেটা মুখ ফুটে বলতে পারতেন না।

একদিন শর্মাজী বেড়াতে বেরিয়েছেন, পথে দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা, দুজনেই মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য। একজনের নাম আবুল বফা, অপরের নাম আব্দুল লতীফ, দুজনে ফিটনে চেপে যাচ্ছিলেন, শর্মাজীকে দেখে থামলেন।

আবুল বফা বললেন—আসুন মশাই ! আপনার কথাই হচ্ছিল। আসুন, কিছুদূর একসঙ্গে যাওয়া যাক।

শর্মাজী উত্তর দিলেন—মাপ করবেন, আমার এখন বেড়াবার সময়।

আবুল বফা—আরে, আপনার সংগে বিশেষ কথা আছে। আমরা তো আপনার বাড়ীই যাচ্ছিলাম।

তাদের আগ্রহ এড়াতে না পেরে শর্মাজী ফিটনে উঠলেন।

আবুল বফা—এমন খবর শোনাব যে মন খুশি হয়ে যাবে।

শর্মাজী—তাহলে বলে ফেলুন।

আবুল বফা—আপনার মহারাজিন তো 'সুমনবাঈ' হয়েছে।

আব্দুল লতীফ—ওহ ! আপনার পছন্দের তারিফ করতে হয়। মোটে তিন চার দিন হল দালমণ্ডীতে এসেছে, কিন্তু এর মধ্যেই সকলের ওপর টেক্কা দিয়েছে। ওর সামনে সকলে টিমটিম করছে। তার দরজার সামনে রঙবেরঙের লোকের ভিড়। মুখখানা যেন গোলাপ ফুল, শরীর যেন বেহেস্তের পরী। আমি দিব্যি গেলে বলছি যে এমন মোহিনী রূপ আগে কখনো দেখিনি।

আবুল বফা—ভাই, ওকে দেখে কেউ যদি বলে যে তার মন টলে নি তবে আমি তার চেলা হয়ে যাই, এমন দামী রত্ন ঝুপড়ী থেকে বের করে আনা আপনার মতো পাকা জহুরীরই কাজ।

আব্দুল লতীফ—তার উপর জ্ঞান বুদ্ধিও ভালই আছে। আপনার বাড়ী থেকে চলে আসার পর পাঁচ'ছ মাসও তো হয়নি ; কিন্তু কাল তার গান শুনে থ হয়ে গেছি। এ শহরে ওর জুড়ি নেই। এমন সুরেলা মিষ্টি গলাও কারো নেই।

আবুল বফা—ভাই, যেখানেই যাই, ওরই কথা শুনি। সবাইকে যেন যাদু করেছে। শুনছি শেঠ বলভদ্রদাসজীও আনাগোনা শুরু করেছেন। চলুন, আজ আপনিও পুরোনো আলাপ ঝালিয়ে নেবেন। আপনার দৌলতে আমাদেরও খাতির হবে।

আব্দুল লতীফ—আমরা আপনাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছি। আপনাকে আমাদের কথা রাখতে হবে।

খবরটা শুনে শর্মাজী দুঃখ, লজ্জা আর গ্লানির ভারে মাথা তুলতে পারলেন না। যে ভয় করছিলেন শেষ পর্যন্ত তাই হল। তাঁর মনে হচ্ছিল যে এখন নির্জনে বসে ভেবে দেখা দরকার যে এই দুর্ঘটনার জন্য তাঁর দায়িত্ব কতখানি, বন্ধুদের আগ্রহে ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন—আমাকে ক্ষমা করুন, আমি যেতে পারব না।

আবুল বফা—কেন?

শর্মাজী—এই জন্যে যে একজন ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকের এই দশা দেখা আমার সহ্যের বাইরে। আপনারা মনে মনে যাই ভাবুন না কেন, কিন্তু ওর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ শুধু এইটুকুই ছিল যে সে আমার স্ত্রীর কাছে আসা যাওয়া করত।

আব্দুল লতীফ—মশাই, এ সব ছেঁদো কথা অন্য জায়গায় বলবেন। এ গলিতে আমার অনেক দিন কেটেছে আর এসব ঢের শুনেছি। এখন চলুন, আপনার সুপারিশে আমাদের কপাল ফিরবে।

শর্মাজী আর থাকতে না পেরে অস্থির হয়ে বললেন—আমি বলছি তো আমি ওখানে যাব না। আমায় নেমে যেতে দিন।

আবুল বফা—আর আমরাও বলছি নিশ্চয় নিয়ে যাব। আমাদের খাতিরে আপনাকে এটুকু কষ্ট করতেই হবে।

আব্দুল লতীফ ঘোড়াকে চাবুক লাগালেন। সে তীরবেগে ছুটল, শর্মাজী রেগে বললেন—আপনারা আমাকে অপমান করতে চান?

আবুল বফা—মশাই, না যাবার কারণটাও তো বলবেন। এই তো প্রায় এসে পড়েছি।

শর্মাজী বুঝলেন যে এ'রা তাঁর কাকুতি মিনতি শুনবেন না। সুমনের কাছে যাওয়ার চেয়ে কুঁয়োয় ঝাঁপ দেওয়াও ভাল মনে হল; তাই তিনি কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। উঠে দাঁড়িয়ে তিনি চলতি গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়লেন। শত চেষ্টাতেও নিজেকে সামলাতে পারলেন না। ছুটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। হাতের কনুইতে বেশ চোট লাগল, ভীষণ হাঁফাতে লাগলেন, সর্বাঙ্গ ঘেমে উঠল, মাথা ঘুরতে লাগল আর চোখে ঝাপসা দেখতে লাগলেন। আব্দুল লতীফ গাড়ী থামালেন। দুজনেই তাঁর কাছে এসে রুমাল দিয়ে হাওয়া করতে লাগলেন।

মিনিট পনেরো পরে শর্মাজী জ্ঞান ফিরে পেলেন। বন্ধু দুজন লজ্জা পেয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলেন। গাড়ীতে করে শর্মাজীকে বাড়ী পৌঁছে দেবার জন্য আগ্রহ দেখালেন, কিন্তু শর্মাজী রাজী হলেন না। তিনি

তাঁদের সংগ ছেড়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ীর দিকে চললেন। যেতে যেতে তাঁর মনে হল ফিটন থেকে লাফিয়ে পড়লাম কেন? যদি জোর দিয়ে বলতাম গাড়ী থামাও, তখন কি ওদের না থামাবার সাহস হত আর তাও না শুনলে ওর হাত থেকে লাগাম কেড়ে নিতে পারতাম। যাক, যা হবার তা হয়ে গেছে। তাঁরা আমায় ভুলিয়ে সুমনের দরজায় নিয়ে গেলে কি বিপদেই না পড়তাম। হয়তো গাড়ী থেকে নেমেই পাগলের কত বাজারের মধ্যে দিয়ে ছুটতাম। দাঁড়িয়ে গোহত্যা হয়তো দেখতে পারি, কিন্তু সুমনকে এই অবস্থায় দেখতে পারি না। আমাদের বড় বড় ভয়গুলো শুধু কল্পনাতেই দেখা যায়।

এ সময় তাঁর মনে হচ্ছিল যে এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী কে? পুরোনো কথা তাঁর মনে পড়ছিল। যদি আমি তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে না দিতাম তো এভাবে তার পতন হত না। আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে তার কোথাও যাবার জায়গা ছিল না, তাই এই পথ বেছে নিতে সে বাধ্য হল, এর জন্য আমিই সম্পূর্ণ দায়ী।

কিন্তু গজাধর সুমনের উপর এত ক্ষেপে গেল কেন? পর্দানশিন ছিল না, মেলা টেলাতেও যাওয়া আসা করত, শুধু একদিন দেরি করার জন্য গজাধর কখনই তাকে এমন কঠোর সাজা দিত না। সে বকাবকি করত, হয়তো একটু মারধোর করত, সুমন কান্নাকাটি করত, গজাধরের রাগ পড়ে যেত, সে সুমনের কান্না থামাত, আর সব ঝগড়া মিটে যেত। কিন্তু এমনটা হত না। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে বিঠলদাস আগে থেকেই আগুন লাগিয়েছিল, নিঃসন্দেহে সমস্ত দোষ তাঁরই। ওঁর জন্যই তো আমি সুমনকে ঘর থেকে তাড়িয়েছিলাম, উনিই তো সারা শহরে আমার বদনাম ছড়িয়ে আমায় কাপুরুষের মতো এ কাজ করতে বাধ্য করলেন। এইভাবে দোষটা বিঠলদাসের ঘাড়ে চাপিয়ে শর্মাজী অনেকটা শান্তি পেলেন। গত কয়েক মাস ধরে তাঁর মনে যে অনুতাপের আগুন জ্বলছিল তা এই সিদ্ধান্তের ফলে নিভল। বিঠলদাসকে অপমান করার সুযোগ পাওয়া গেল, বাড়ী এসেই তিনি বিঠলদাসকে চিঠি লিখতে বসলেন। জামা কাপড় ছাড়বার কথাও মনে রইল না।

প্রিয় মহাশয়, প্রণাম!

আপনি শুনে অসীম আনন্দ পাবেন যে সুমন এখন দালমণ্ডীর এক কোঠায় আশ্রয় নিয়েছে। আপনার নিশ্চয় মনে আছে যে হোলির দিন স্বামীর ভয়ে সে আমার বাড়িতে চলে এসেছিল আর যতদিন তার স্বামীর ক্রোধ শান্ত না হয় ততদিন তাকে আশ্রয় দেওয়া উচিত মনে করেছিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার নিন্দা কুৎসা ছড়াতে লাগলেন, যদিও তারা আমার স্বভাব ভালভাবেই জানতেন। এর ফলে অভাগিনী অবলাকে আমি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হই এবং শেষ পর্যন্ত সে সেই পাপকুণ্ডেই গিয়ে পড়ল। আমি এই ভয়ই করেছিলাম।

এ থেকে আপনি বুঝতে পারবেন যে দুর্ঘটনার জন্য দায়ী কে এবং তাকে আশ্রয় দেওয়া আমার উচিত কি অনুচিত ছিল।

ভবদীয়—পদ্মসিংহ

বাবু বিঠলদাস শহরের সার্বজনিক সংস্থার প্রাণ ছিলেন। তাঁর সহায়তা ছাড়া কোন কাজই সফল হত না। তিনিও হাসিমুখে এ বোঝা বইতেন। শত বাধাতেও তিনি দমে যেতেন না। খাওয়ার সময় পান না, ঘরে বিশ্রাম করা তাঁর কপালে নেই। উদাসীন ব্যবহারের জন্য স্ত্রী সব সময়ে অনুযোগ করেন। সমাজ সেবার হুজুগে বিঠলদাস নিজের সুখ ও স্বার্থের কথা ভাবতেন না। কখনো অনাথ আশ্রমের জন্য চাঁদা আদায়ে ব্যস্ত, কখনো গরীব ছাত্রদের জন্য ছাত্রবৃত্তি জোগাড়ের কাজে লেগে আছেন। জাতির সংকটে তাঁর দেশপ্রেম উথলে উঠত। দুর্ভিক্ষের সময় মাথায় আটার বস্তা নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে দেখা যেত। কলেরা, প্লেগের সময় তাঁর নিঃস্বার্থ সেবায় আত্মত্যাগ দেখে লোকে অবাক হয়ে যেত। কিছুদিন আগে গঙ্গার বন্যা হয়েছিল, তখন দু'মাস ঘরে ফিরতে পারেন নি। নিজের সমস্ত সম্পত্তি দেশের সেবায় দান করেও সেজন্য তাঁর বিন্দুমাত্র অহংকার ছিল না। লেখা পড়া বেশীদূর হয় নি। বক্তা হিসাবে সাধারণ ছিলেন। তাঁর সিদ্ধান্তে অভিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতার অভাব ছিল। আবার বিশেষ নীতিজ্ঞ, চতুর বা বুদ্ধিমান ছিলেন না। কিন্তু দেশপ্রেম গুণটি তাঁর এত বেশি ছিল যে সে জন্য শহরের সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত।

শর্মাজীর চিঠি পড়ে তাঁর মনে হল যেন গালে চড় মেরেছে, চিঠিতে যে ব্যঙ্গ ছিল, সেদিকে তাঁর নজর পড়ল না, নিজের বিশিষ্ট বন্ধুকে মিথ্যা বদনাম দেবার জন্য তাঁর দুঃখ হল না। অতীত ঘটনার জন্য অনুতাপ করা তাঁর স্বভাবে ছিল না। উপস্থিত কর্তব্য স্থির করাই আবশ্যক আর শীঘ্রই তিনি তা করে ফেললেন আগা-পিছু করা তাঁর স্বভাব নয়, কাপড় জামা পরে দালমণ্ডী পৌঁছে গেলেন। সুমনবাঈ-এর বাড়ির খোঁজ করে সোজা উপরে গিয়ে দরজার শব্দ করলেন। হিরিয়া সুমনের সব দেখাশেনা করে, সে দরজা খুলে দিল।

নটা বেজে গেছে, সুমনের মজরা শেষ হয়ে গিয়েছে। সে শোবার উপক্রম করছিল। বিঠলদাসকে দেখে চমকে উঠল। শর্মাজীর বাড়িতে তাঁকে কয়েক-বার দেখেছিল। দাঁড়িয়ে মাথা নুইয়ে বলল—মশাই, আপনি কি ভুল করে এখানে এসে পড়েছেন ?

বিঠলদাস সন্তর্পণে গালিচায় বসে বললেন—ভুলে নয় জেনে শুনেই এসেছি। যা মোটেই বিশ্বাস করি নি এখন সেটা নিজের চোখে দেখছি। আজ পদ্মসিংহের চিঠি পেয়ে মনে হল কেউ তাকে মিথ্যে খবর দিয়েছে, কিন্তু নিজের চোখকে কি করে ধোঁকা দেব ? যখন আমাদের পূজ্যা ব্রাহ্মণ মহিলারা এমন কলঙ্কের পথে চলতে শুরু করেছেন, তখন আমাদের অধঃপতনের আর সীমা

রইল না। সুমন তুমি হিন্দু জাতির মাথা হেঁট করে দিলে।

সুমন গম্ভীরভাবে উত্তর দিল—আপনি হয়তো তাই ভাবছেন কিন্তু অন্য অনেকে তো এমন মনে করে না, একটু আগে জন কয়েক ভদ্রলোক মুজরা শুনে গেলেন, সকলেই হিন্দু ; কিন্তু কারও তো মাথা হেঁট দেখলাম না। এখানে এসে তাঁরা খুশি হয়েছেন মনে হল। তারপরে এ পাড়ায় ব্রাহ্মণী আমি একাই নই, দু চারটে নাম তো এখনি বলতে পারি, তাঁরা খুব উঁচু বংশের। যখন আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে তাদের থাকা অসম্ভব হল, তারা তখন নিরুপায় হয়েই এই পথে এল। যখন হিন্দুজাতির নিজেরই লজ্জা নেই, তখন আমাদের মত মেয়েরা কতক্ষণ তা বজায় রাখতে পারে ?

বিঠলদাস—সুমন, তোমার কথা ঠিক। সত্যই হিন্দু জাতির অধঃপতন হয়েছে আর এতদিনে তা নিশ্চয় নিঃশেষ হয়ে যেত, কিন্তু হিন্দু মেয়েরাই আজ পর্যন্ত তার মর্যাদা রক্ষা করে আসছে। তাদের সত্য আর সুকৃতিই একে বাঁচিয়ে রেখেছে। শুধু হিন্দুর মান রাখতেই লক্ষ লক্ষ নারী আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে। এই দেশেই মেয়েরা কষ্ট ভোগ করে, অপমান অনাদর সহ্য করে, পুরুষের অমানুষিক ক্রুরতার কথা ভুলে হিন্দু জাতির মুখ উজ্জ্বল করছে। এসব গুণ সাধারণ মেয়েদেরই হয়, ব্রাহ্মণ কন্যাদের কথা তো বলাই বাহুল্য। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে এই দেবীরাও আজকাল এভাবে মান মর্যাদা ধুলোয় লুটিয়ে দিচ্ছেন। সুমন, স্বীকার করছি বাড়ীতে তোমার খুব কষ্ট ছিল। স্বীকার করছি তোমার স্বামী গরিব, বদরাগী, চরিত্রহীন ; স্বীকার করছি সে তোমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু ব্রাহ্মণের মেয়ে তো জাতি আর কুলের কথা ভেবে এ সব দুঃখ সহ্য করে। বিপত্তি কাটিয়ে ওঠা আর দুর্দিনে স্থির থাকাই তো আসল ব্রাহ্মণ কন্যার ধর্ম, কিন্তু তুমি যা করেছ তা নীচ জাতির কুলটারাই করে থাকে ; স্বামীর উপর রাগ করে বাপের বাড়ী যায়, আর সেখানে না বনলে বেশ্যাপাড়ার পথ ধরে। ভেবে দেখ যে অবস্থায় তোমার লক্ষ লক্ষ বোন হাসিখুশিতে দিন কাটাচ্ছে, সেই অবস্থা তোমার এত অসহ্য মনে হল যে তুমি লোক লজ্জা, কুলমর্যাদাকে লাথি মেরে কুপথে চলে এলে। তুমি কি এমন স্ত্রীলোক দেখনি যে তোমার চেয়েও বেশী দুঃখী, দরিদ্র ? কই, তাদের মনে তো এ কুচিন্তা আসে না ; তা হলে আজ আমাদের স্বর্গভূমি নরক হয়ে যেত। সুমন, তোমার এই কাজের জন্য শুধু ব্রাহ্মণের নয়, সমস্ত হিন্দুজাতির মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছে।

সুমনের চোখ ছলছল করছিল। লজ্জায় মাথা তুলতে পারল না। বিঠলদাস বলতে লাগলেন—এতে সন্দেহ নেই যে এখানে ভোগ বিলাসের প্রচুর জিনিস পাচ্ছ, দোতলায় সুসজ্জিত ঘরে বাস করছ, নরম গালিচায় বসছ, ফুলের বিছানায় শুচ্ছ, ভাল ভাল জিনিস খেতে পাচ্ছ, কিন্তু ভেবে দেখেছ কি এ সব

জিনিস কি দামে কিনছ ? নিজের মান মর্যাদা বেচে, তোমার কত সম্মান ছিল, লোকে তোমার পায়ের ধুলো মাথায় নিত, কিন্তু আজ তোমার মুখ দেখাও পাপ মনে করে···

সুমন কথার মধ্যেই বলল—মশাই, আপনি এ কি বলছেন ? আমি তো দেখছি যে সম্মান আমি আজ পাচ্ছি এর একশো ভাগের এক ভাগও তখন পেতাম না। একবার আমি শেঠ চিমনলালের ঠাকুরবাড়ীতে ঝুলন দেখতে গিয়েছিলাম, সারারাত বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজলাম, কেউ ভেতরে যেতে দিল না। কিন্তু সেই ঠাকুরবাড়ীতে কাল আমার গান হল, মনে হচ্ছিল যেন আমার পা পড়ে মন্দির পবিত্র হয়ে গিয়েছে।

বিঠলদাস—কিন্তু তুমি কি ভেবে দেখেছ ওরা কি রকম লোক ?

সুমন—তাঁদের আচরণ যেমনই হোক না কেন, তাঁরা কিন্তু নিশ্চয় কাশীর হিন্দু সমাজের নেতা। শুধু তাঁদের কথাই বা কেন ? সারাদিন আমি হাজার হাজার লোককে এই পথ দিয়ে আসতে যেতে দেখি। মুর্খ-বিদ্বান, ধনী-গরীব সব রকম লোকই নজরে পড়ে কিন্তু সবাই হয় সোজা তাকিয়ে না হয় লুকিয়ে আমায় দেখতে দেখতে যায়। এমন কাউকে দেখলাম না যে আমার কৃপাদৃষ্টি পেলে আনন্দে মাতোয়ারা হয় না, একে আপনি কি বলেন ? হতে পারে শহরে দু-চার জন আছেন যাঁরা আমার নিন্দা করেন। এঁদের মধ্যে একজন আপনি, ঐ দলে আপনার বন্ধু পদ্মসিংহও আছেন ; কিন্তু সারা সংসার যখন আমায় খাতির করছে, তখন দু'চার জনের নিন্দা কি আমি গ্রাহ্য করি ? পদ্মসিংহের যে রাগ আছে তা শুধু আমার উপরেই আছে, আমাদের দলের উপর নয়। আমি নিজের চোখে হোলির দিন তাঁকে ভোলীর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলতে দেখেছি।

বিঠলদাস কোন উত্তর খুঁজে পেলেন না। প্যাঁচে পড়ে গেলেন। সুমন বলতে লাগল—আপনি হয়তো ভাবছেন যে ভোগবিলাসের লোভে কুপথে এসেছি, কিন্তু সেটা সত্যি নয়। আমি এত অন্ধ নই যে ভালো-মন্দ বুঝতে পারব না। আমি জানি যে আমি ঘৃণিত কাজ করেছি। কিন্তু তখন আমি নিরুপায়, এ ছাড়া আমার আর কোন পথ ছিল না। যদি শুনতে চান তো আমার সব কথা বলি। এটা তো জানেন যে সংসারে সকলের প্রকৃতি একই রকমের হয় না। কেউ অপমান সহ্য করতে পারে, কেউ পারে না। আমি উচ্চ বংশের মেয়ে। বাবার দোষে আমার বিয়ে হল এক দরিদ্র মুর্খের সঙ্গে। দরিদ্র হয়ে গেলেও আমি অপমান সইতে পারতাম না। যাকে অনাদর করা উচিত তাকেই সম্মান করতে দেখে আমার মনে কুবাসনা জাগত। নিজের মনেই জ্বলতাম, কখনও বাইরে প্রকাশ করি নি। এ আগুন হয়তো পরে আপনিই নিভে যেত, কিন্তু পদ্মসিংহের জলসা এই আগুন উসকে দিল। এর পর আমার

যা দুর্গতি হল তাতো আপনি জানেন। পদ্মসিংহের ঘর থেকে বেরিয়ে আমি ভোলীবাইয়ের আশ্রয়ে গেলাম। কিন্তু তখনও আমার কুপথে যাবার প্রবৃত্তি হয় নি। আমি জামা কাপড় সেলাই করেই জীবন কাটাতে চেয়েছিলাম; কিন্তু লোকে এত জ্বালাতন শুরু করল যে শেষে এই পথে আসতে বাধ্য হলাম। যদিও এই কাজলের ঘরে কালি থেকে নিজেকে বাঁচানো শক্ত, তবু আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে আমি শুধু নাচব আর গাইব; নিজেকে ভ্রষ্ট হতে দেব না।

বিঠল—তোমার এখানে থাকাই ভ্রষ্ট হবার জন্য যথেষ্ট।

সুমন—তবে আপনিই বলুন আমি কি করতে পারি। আর কোন উপায়ে সুখে জীবন কাটাতে পারা যাবে?

বিঠল—যদি তুমি ভেবে থাক যে এখানে সুখে জীবন কাটবে, তবে সেটা তোমার ভুল। আজ না হলেও কিছু দিন পরে নিশ্চয় বুঝবে যে এখানে সুখ নেই। সন্তোষই সুখের মূল; বিলাসে কখনও সুখ মেলে না।

সুমন—সুখ না হোক এখানে আমার আদর তো হবে, আমি কারো গোলাম তো নই।

বিঠল—এটাও তোমার ভুল। এখানে তুমি আর কারো গোলাম না হতে পারো, কিন্তু নিজের ইন্দ্রিয়ের দাস তো হবে? ওই পরাধীনতার চেয়ে ইন্দ্রিয়ের দাসত্বেই বেশী দুঃখ। এখানে তুমি না পাবে সুখ না পাবে সম্মান। হ্যাঁ, কিছুদিন ভোগ বিলাসে কাটাবে বটে, কিন্তু পরে তাও মিলবে না। ভেবে দেখ, অল্পাদনের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য তুমি নিজের ও সমাজের উপর কত বড় অন্যায় করছ।

এর আগে সুমন কারো কাছে এ সব কথা শোনে নি। ইন্দ্রিয়ের সুখ ও নিজের সমাদরই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলেই এতদিন জানত। আজ সে বুঝল যে সন্তোষেই সুখ মেলে আর সমাদর মেলে সেবাতে।

সে বলল—আমি সুখ সম্মান দুটোই ছাড়ছি; কিন্তু জীবন-নির্বাহের জন্য কি করব?

বিঠলদাস—যদি ঈশ্বর তোমায় সুবুদ্ধি দেন, তবে সাধারণভাবে জীবন কাটানোর জন্য তোমায় দালমণ্ডীতে বসতে হবে না। রোজগারের এইটেই তো একমাত্র উপায় নয়। এমন অনেক কাজ আছে যা তুমি ঘরে বসেই করতে পার।

বিঠলদাসের সৎ পরামর্শে সুমনের মন শান্ত হল। সৎ লোকের কথায় মনে সৎ ভাব জাগে, সে বলল—এখানে বসতে আমার নিজেরই লজ্জা করে। বলুন, আপনি আমার জন্যে কি কাজ জোগাড় করতে পারেন? আমি ভালো গান জানি। গান শেখাবার কাজ করতে পারি।

বিঠলদাস—গান শিখবার কোন স্কুল তো এখানে নেই।

সুমন—আমি কিছু লেখাপড়াও জানি। মেয়েদের ভাল করে পড়াতে পারি।

বিঠ্‌ঠলদাস চিন্তিতভাবে উত্তর দিলেন—মেয়েদের স্কুল তো কয়েকটা রয়েছে, কিন্তু তারা তোমায় নেবে কিনা সন্দেহ।

সুমন—তবে আপনি আমায় কি করতে বলেন? হিন্দু ধর্মানুরাগী এমন কেউ আছে কি যে আমার জন্য মাসে ৫০ টাকা দিতে রাজী হবে?

বিঠ্‌ঠলদাস—এটা খুবই কঠিন মনে হয়।

সুমন—তবে কি আমাকে যাঁতায় গম ভাঙতে বলেন? আমার এমন সন্তোষে কাজ নেই।

বিঠ্‌ঠলদাস—(লজ্জিতভাবে) বিধবাশ্রমে যদি থাকতে চাও তো চেষ্টা করতে পারি।

সুমন—(একটু ভেবে) আমি তাতেও রাজী; কিন্তু সেখানে আমার সমক্ষে কানাঘুষো করলে এক মুহূর্ত্তও থাকব না।

বিঠ্‌ঠলদাস—বড়ই কঠিন শর্ত দেখছি, কার কার মুখ চেপে ধরবো? কিন্তু আমার মন বলছে পরিচালন সভা তোমায় নিতে রাজী হবে না।

সুমন ব্যঙ্গভরে বলল—আপনার হিন্দু সমাজই যখন এত নির্দয়, তবে তার মর্যাদা রাখবার জন্য আমিই বা কেন কষ্ট করব? কেন প্রাণপাত করব? আমাকে রক্ষা করার জন্য যদি আপনি তাদের প্রবন্ধ করতে না পারেন, যখন সমাজ নিজেই এত নির্লজ্জ, তখন আমার দোষ কোথায়? আমি আপনার কাছে শুধু একটা প্রস্তাব করছি আর এটাও যদি করতে অক্ষম হন তবে আপনাকে আর কষ্ট দেব না। আপনি পণ্ডিত পদ্মসিংহকে এক ঘণ্টার জন্য এখানে নিয়ে আসুন, তাঁকে আমি চুপি চুপি কিছু বলতে চাই। তার পরই আমি এখান থেকে চলে যাব। আমি শুধু দেখতে চাই যাকে আপনারা জাতির নেতা বলেন, তাঁর দৃষ্টিতে আমার অনুতাপের মূল্য কতটুকু।

বিঠ্‌ঠলদাস খুশি হয়ে বললেন—হ্যাঁ, এ আমি পারব, বলো কবে আনব?

সুমন—যেদিন আপনার ইচ্ছা।

বিঠ্‌ঠলদাস—আবার কথা পালটাবে না তো?

সুমন—এখনও এতটা নিচে নামি নি।

১৫

বিঠ্‌ঠলদাসের তখন আনন্দের সীমা নেই, যেন একটা সম্পত্তি লাভ হয়েছে। বিশ্বাস যে পদ্মসিংহ এটুকু কষ্ট স্বীকার করতে আপত্তি করবে না, শুধু গাছে যেতেই যেটুকু দেরী। হোলির কয়েকদিন আগে থেকেই তিনি

শর্মাজীর কাছে যাওয়া বন্ধ করেছিলেন এবং তাঁর নিন্দা প্রচারে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্য সেজন্য তিনি বিন্দুমাত্র লজ্জিত হন নি এবং শর্মাজীর কাছে যেতে বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নি। তাই তিনি তখনই শর্মাজীর বাড়ীর পথ ধরলেন।

রাত দশটা বেজে গেছে। আকাশ মেঘে ঢাকা, চারিদিকে অন্ধকার। কিন্তু রাগরঙ্গের বাজার ঝলমল করছে। অট্টালিকার আলো ছিটকে পড়ছে। কোথাও সুরেলা তান শোনা যাচ্ছে। কোথাও আমোদ প্রমোদের আলাপ, হাসি ভেসে আসছে। চারিদিকে বিষয় বাসনার নগ্ন রূপ যেন ফুটে বের হচ্ছে।

দালমণ্ডীর বাইরে এসে বিঠলদাসের মনে হল যেন নির্জন স্থানে এসে পড়েছেন। পথ তখনও বন্ধ হয়নি। কোন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হলেই বিঠলদাস তৎক্ষণাৎ তাকে নিজের সাফল্যের খবর দিতে লাগলেন। কোথা থেকে আসছি জানেন? সুমনবাঈএর ঘরে গিয়েছিলাম, এমন মন্ত্র ঝেড়েছি যে আর মাথা তুলতে পারে নি; বিধবাশ্রমে যেতে রাজি হয়েছে। প্রকৃত কর্মী এমনি করেই কাজ করে।

পদ্মাসিংহ চারপাইয়ে শুয়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করছিলেন, এমন সময় বিঠলদাস এসে তাঁকে ডাকলেন। জিতন কাহার নিজের ঘরে বসে সারাদিনের রোজগারের হিসাব করছিল, ডাক তার কানে গেল। চট করে সব পয়সা ট্যাঁকে গুঁজে বলল—কে?

বিঠলদাস বললেন—আরে আমি; শর্মাজী কি শুয়ে পড়েছেন? তবে ভিতরে গিয়ে তাঁকে জাগিয়ে বল যে আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। বড় দরকারী কাজ, একটু শীঘ্র আসতে বল।

জিতনের খুব রাগ হল, তার হিসেব পুরো হল না, টাকা পুরতে না জানি কত বাকী আছে, ধীরে সুস্থে উঠে দরজা খুলে শর্মাজীকে খবর দিল। তিনি বুঝলেন যে কোন নতুন খবর আছে, আর তাই এত রাতে এসেছেন। শীঘ্র উঠে বাইরে এলেন।

বিঠল—আসুন, আপনাকে কষ্ট দিলাম বলে ক্ষমা চাইছি। কোথা থেকে আসছি জানেন? সুমনবাঈএর কাছে গিয়েছিলাম। আপনার চিঠি পড়েই ছুটে গিয়েছিলাম, যদি তাকে সৎপথে আনতে পারি। এতে তারও বদনাম, সারা জাতেরও বদনাম; সেখানে গিয়ে তার ঠাট দেখে অবাক হয়ে গেছি। সেই সরল হাবা মেয়েটা এখন দালমণ্ডীর রাণী। জানিনা কি করে এত শীঘ্র এত খানি বদলে গেল। প্রথমে সে তো চুপ করে আমার কথা শুনল, পরে কাঁদতে লাগল। আমিও ভাবলাম এখন লোহা লাল হয়েছে; আর দু চার ঘা দিতেই আমার কথা মেনে নিল। প্রথমে বিধবাশ্রমের নাম শুনে ঘাবড়ে গেল। বলল—আমাকে খাওয়া পরার জন্য মাসে ৫০ টাকা জোগাড় করে দিন। কিন্তু আপনি,

তো জানেন এখানে ৫০ টাকা দেবে কে? আমি তাতে রাজী হলাম না শেষ পর্যন্ত এক শর্তে সে রাজী হল। সে শর্ত পূর্ণ করা আপনার হাতে।

পদ্মসিংহ বিস্মিত হয়ে বিঠলদাসের দিকে চেয়ে রইলেন।

বিঠলদাস—ভয় পাবেন না, শর্তটা খুব সহজ; শুধু আপনি একবার তার কাছে যাবেন, সে আপনাকে কিছু বলতে চায়। এতে আপনার কোন আপত্তি হবে না নিশ্চিত ভেবে তার কথায় রাজী হই। বলুন, কবে যাবেন? আমি বলি কি কাল সকালে চলুন।

কিন্তু পদ্মসিংহ না ভেবে চিন্তে কোন কাজ করতেন না। তিনি ভাবতে লাগলেন এমন শর্তের কি উদ্দেশ্য হতে পারে? সে আমায় কি বলতে চায়? কথাটা কি চিঠিতে জানানো যেত না? এর মধ্যে নিশ্চয় কিছু রহস্য আছে। গাড়ী থেকে আমার লাফিয়ে পড়ার খবরটা আবুল বফা হয়তো আজ তাকে দিয়েছে। আমি এমনিতে সেখানে যাব না দেখে সে হয়তো এই শর্ত দিয়ে দেখছে আমি সেখানে যাই কি না। আমাকে লোকের চোখে হেয় করতে চায়। আচ্ছা, আমি গেলেও সে যদি কথা না রাখে তো কি হবে? তার হাত এড়াবার জন্য এই যুক্তি তাঁর মনে ধরল। বললেন—আচ্ছা, সে যদি কথা না রাখে?

বিঠল—কথা রাখবে না কেন? তাও কি সম্ভব?

পদ্ম—হ্যাঁ, এটা তো অসম্ভব নয়।

বিঠল—তবে আপনি কি তার কাছ থেকে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়ে নিতে বলছেন?

পদ্ম—না, আমার সন্দেহ হচ্ছে এইজন্য যে সে এই ভোগবিলাস ছেড়ে বিধবাশ্রমে যেতে চাইছে কেন আর আশ্রয় সমিতির লোকেরা কি তাকে নিতে রাজী হবে?

বিঠল—সমিতির লোকেদের রাজী করানোর ভার আমার। রাজী না হলে তার থাকার জন্য অন্য কোন জায়গা ঠিক করব। আর ধরুন সে যদি কথা নাই রাখে, তো আমাদের তাতে কি ক্ষতি? আমাদের কর্তব্য তো করা হবে।

পদ্ম—হ্যাঁ, কর্তব্যপালনের আনন্দ পাবেন বটে, কিন্তু দেখবেন সে কখনও কথা রাখবে না।

বিঠলদাস অধীর হচ্ছিলেন, একটু রেগে বললেন—যদি কথা নাই রাখে তো তাতে আপনার কোন শ-পঞ্চাশ টাকা খরচ হয়ে যাবে।

পদ্ম—আপনার কাছে আমার কোন সম্মান না থাকতে পারে, কিন্তু আমি নিজেকে এত ছোট ভাবতে পারি না।

বিঠল—তাহলে আপনি যাচ্ছেন না?

পদ্ম—আমার যাওয়াতে কোন লাভ নেই। তবে যদি আমার সম্মান হানির উদ্দেশ্য থাকে তবে সেটা আলাদা কথা।

বিঠল—বড়ই দুঃখের কথা যে আপনি একটা জাতীয় কাজে এমন ইতস্ততঃ করছেন। আপনার চোখের সামনে এক হিন্দু নারী কুঁয়োয় পড়ে গেছে আর সেই জাতির পুরুষ হয়ে আপনি তার উদ্ধারের কাজে এত গড়িমসি করছেন। আপনার কাজ তো শুধু মূর্খ চাষী আর জমিদারদের রক্ত চোষা। আপনাকে দিয়ে আর কিছু হবে না।

শর্মাজী এই তিরস্কারের কোন উত্তর দিলেন না। নিজের অকর্মণ্যতার জন্য তিনি লজ্জিত ছিলেন এবং এই তিরস্কার তাঁর প্রাপ্য বুঝলেন বটে কিন্তু যে লোক এই অনর্থের মূল তার মুখ থেকে এটা শোনা তাঁর অসহ্য মনে হল। কড়া উত্তর দিতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে সুমনকে রক্ষা করতে চান, তবে গুপ্তভাবে। তিনি বললেন—ওর আরও তো শর্ত আছে।

বিঠল—হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কি তা পূর্ণ করতে পারবেন? খোরপোষ বাবদ সে ৫০ টাকা চায়, আপনি দিতে পারবেন?

শর্মাজী—৫০ টাকা নয়, কিন্তু ২০ টাকা পর্যন্ত দিতে রাজী আছি।

বিঠল—শর্মাজী, একটু কষ্ট করতে আপনি রাজী হলেন না, আর মাসে ২০ টাকা করে দেবেন?

শর্মাজী—আমি কথা দিচ্ছি যে মাসে মাসে ২০ টাকা দেব আর আমার আয় যদি বাড়ে তো পুরো টাকাটাই দেব। কিন্তু এখন আমি নিরুপায়। এই ২০ টাকা দেবার জন্য আমায় গাড়ী ঘোড়া বেচতে হবে। আজকাল আমার পসার কেন যে কমছে তা বুঝতে পারছি না।

বিঠল—আচ্ছা, আপনি ২০ টাকা তো দিলেন, কিন্তু বাকী টাকা আসবে কোথা থেকে। সকলের হাল তো আপনি জানেন, বিধবাশ্রমের চাঁদাই তো অতিকষ্টে আদায় হয়। দেখি যথাসাধ্য চেষ্টা করে, কিন্তু জোগাড় না হলে দোষটা আপনার ঘাড়েই পড়বে।

১৭

সন্ধ্যার সময়ে সদন ঘোড়ার পিঠে বসে দালমণ্ডীর পথে চলেছে। নজর দুধারে জানলা ও খোলা বারান্দায়। যবে থেকে সুমন এখানে এসেছে, তখন থেকেই সদন তার ঘরের কাছে এসে যে কোন অছিলায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে যায়। নতুন ফুলটিকে দেখা অবধি সদনের মনে শান্তি নেই। এই সরল সৌন্দর্যের কাছে প্রেম নিবেদন করার অভিলাষ হলেও সুযোগ হচ্ছিল না। সুমনের ঘরে

নিত্যই রসিক পুরুষদের জমাট আসর। সদনের ভয় হত যে সে দলে কাকার পরিচিত কোন লোক থাকতে পারে। তাই সে উপরে যেতে সাহস পেত না।

মনের আকাঙ্খা মনে চেপে সে নিত্য হতাশ হয়ে ফিরে যেত। কিন্তু আজ সে যাবার জন্য কৃতসংকল্প হল, তাতে যত রাতই হোক না কেন। বিরহ যন্ত্রণা আর সহ্য হচ্ছে না। সে সুমনের ঘরের সামনে এল। শ্যাম কল্যাণ রাগের মধুর সুর ভেসে আসছিল। এগিয়ে গিয়ে ঘণ্টা দুই পার্কে আর ময়দানে বেড়িয়ে নটার সময় আবার দালমণ্ডীতে ফিরে এল। আশ্বিনের চাঁদের উজ্জ্বল কিরণ দালমণ্ডীর ছাতের উপর রুপোলি চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। আবার সুমনের ঘরের সামনে এল। গান-বাজনা বন্ধ, কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে না। নিশ্চিত হল যে কেউ নেই, ঘোড়া থেকে নেমে দোকানের খুঁটিতে ঘোড়া বাঁধল আর সুমনের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। নিঃশ্বাস জোরে জোরে পড়ছে, বুক ধক ধক করছে।

সুমনের মুজরা সবে শেষ হয়েছে। তার মন এখন ক্লান্ত, শিথিল। ঝড়ের পর যেমন স্তব্ধতা আসে, তেমনি এই আমোদ-প্রমোদের পরেও তার প্রতিক্রিয়া হয়। ভোগ বিলাসে লিপ্ত মনকে যেন আত্মা এই ভাবেই সতর্ক করে দেয়। এই অবস্থায় হৃদয়ে পুরোনো স্মৃতি জাগে। কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞানচক্ষু খোলে।

সুমনের এখন সুভদ্রার কথা মনে পড়ছিল। সে তার সঙ্গে নিজের তুলনা করছিল, তার শান্তিভরা মুখ সুমনের পাওয়া অসম্ভব। এখানে শুধু ভোগের সাগর, এখানে শান্তি-সুখ কই? পদ্মসিংহের কাছারি থেকে ফেরার সময় হলে সুভদ্রা কত আনন্দে পান সাজতে বসত, তাজা হালুয়া তৈরী করত। আর তিনি ঘরে ফিরলে কত প্রেম-বিহ্বল হয়ে তাঁর কাছে ছুটে যেত। একবার তাদের প্রেমালিঙ্গনও দেখেছি, কত ভাবময়! কত আন্তরিক! আমার কপালে সে সুখ কোথায়? এখানে যে আসে সে হয় অন্ধ, না হয় তো ব্যাভিচারি। কেউ টাকার জাল ছড়ায়, কেউ বা মিষ্টি মোলায়েম কথা বলে। এদের হৃদয় আন্তরিকতাশূন্য, নোংরামিতে ভরা।

এই সময়ে সদন ঘরে ঢুকল। সুমন চমকে উঠল, সে সদনকে কয়েকদিন দেখেছিল। তার আর পদ্মসিংহের চেহারায় মিল আছে মনে হত। অবশ্য গাম্ভীর্যের বদলে ছিল উড়নচণ্ডে ভাব। তবে এই মায়াপুরীর প্রেমিকদের মধ্যে যে হীনতা বা ছলনা দেখা যায়, তার চিহ্নমাত্রও ছিল না। তাকে দেখে সহজ সরল নবযুবক মনে হচ্ছিল। সুমন আজও তাকে তার ঘরের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে দেখেছে। সে বুঝতে পারছিল যে নতুন পায়রা এখন কোন ছাদে নামবে তাই ভাবছে। আজ তাকে তার ঘরে আসতে দেখে তার এত অহংকার ও আনন্দ হল যেন কুস্তিতে জিতেছে। সে উঠে হাসিমুখে সদনকে

হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করল।

সদনের মুখ লজ্জায় লাল, চোখ নিচু হল। একটু ভয়-ভয় ভাব, মুখ দিয়ে একটি কথাও বের হল না।

যে কখনও মদ খায়নি, তার মদ খাবার ইচ্ছে হলেও প্রথম বার মুখে দিতে গেলেই গা ঘিন ঘিন করে ওঠে।

যদিও সদন সুমনকে নিজের সঠিক পরিচয় দেয়নি, নিজের নাম কুমার সদন সিংহ বলেছিল, তবু তার পরিচয় বেশিদিন লুকোনো রইল না। সুমন হিরিয়াকে দিয়ে তার সব খোঁজ খবর নিয়েছিল আর তখন থেকেই বেশ চিন্তার মধ্যে পড়েছিল। সদনকে না দেখলে তার শান্তি নেই। তার উপর সুমনের টান দিন দিন বাড়তে লাগল। সে ঘরে থাকলে অতি বড় মানী লোকও সুমনের কাছে আমল পেত না। সুমন বুঝত যে তার এই প্রেম অনুচিত ও নিষিদ্ধ, আর তাই সে এটা লুকিয়ে রাখত।

কোন অজানা কারণে তার মনে হত যে এই প্রেম হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতা। পদ্মসিংহ ও সুভদ্রা ব্যাপারটা জানতে পারলে তারা আমাকে কি ভাববে। তারা কত না দুঃখ পাবে। তাদের চোখে আমি কত নিচু হয়ে যাব। সদন যখনই প্রেম রহস্যের কথা তুলত, তখন সুমন সে প্রসঙ্গ বদলে দিত। যখন সদনের হাত দুষ্টুমি করতে চাইত তখন সে সলজ্জ চোখে তার দিকে তাকিয়ে তার হাত সরিয়ে দিত। আবার সেই সঙ্গে তাকে উত্তেজিত করে রাখতে চাইত। এই প্রেম কল্পনায় সে আনন্দ পেত বলে সেটা সে ছাড়তে পারল না।

কিন্তু সদন এসব ব্যাপারে অনভিজ্ঞ বলে সুমনের অনীহার জন্য নিজের অর্থাভাবকেই দায়ী ভাবত। তার অকপট হৃদয় ছিল প্রগাঢ় প্রেমে পূর্ণ। সুমন তার একমাত্র ধ্যান জ্ঞান। তবে প্রেম প্রবল হলেও সে নিজের কুবাসনা চেপে রাখত। তার উন্মাদনা দূর হল। সুমনের যা ভাল লাগে সে তাই করত। যে কামনা কলুষিত প্রেমে দেখা যায়, সেটা এখন প্রকৃত অনুরাগের জন্য সহৃদয়তায় রূপান্তরিত হল। কিন্তু সুমনের অনিচ্ছা দিনে দিনে বাড়ছে দেখে তার ধারণা হল যে এখানে পবিত্র প্রেমের আদর নেই। এখানকার দেবতা উপাসনায় নয়, উপহার পেলেই প্রসন্ন হন। কিন্তু উপহার দেবার টাকা আসবে কোথা থেকে? চাইবে কার কাছে? শেষে বাপের কাছে চিঠিতে লিখল যে আমার খাওয়া ভাল হচ্ছে না, লজ্জায় কাকাকে বলতে পারছি না, আমাকে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিন।

চিঠি বাড়ীতে পৌঁছলে ভামা স্বামীকে ধিক্কার দিয়ে বলল, এই ভাইয়ের উপর তোমার এত ভরসা ছিল যে গর্বে মাটিতে পা পড়ত না। এখন সে গর্ব কোথায় গেল? সেও কাকা বলতে অজ্ঞান হত। এবার তার চোখ খুলেছে। একালে ভালো করলে লোকে ভুলে যায়। ওর জন্যে আমি কী না করেছি;

আজ তারই ফল ভুগছি। ওর কোন দোষ নেই, ওকে আমি চিনি। এসব হচ্ছে মহারাণীর কাজ। একবার দেখা হলে আচ্ছা করে শুনিয়ে দেব।

মদন সিংহের সন্দেহ হল যে সদন মিথ্যা কথা লিখেছে, ভাইয়ের উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল অটুট; কিন্তু ভামা জোর করায় তিনি টাকা পাঠাতে বাধ্য হলেন। সদন রোজ ডাকঘরে গিয়ে ডাকপিয়নকে বার বার জিজ্ঞাসা করত। শেষে চারদিন পরে মনি-অর্ডার এল। পিওন তাকে চিনত। টাকা পেতে অসুবিধা হল না। সদনের আনন্দ ধরে না। সন্ধ্যায় বাজারে গিয়ে একটা ভাল রেশমী শাড়ী কিনল। তার ভয় ছিল যদি সুমনের সেটা পছন্দ না হয়। নিজেকে কুমার বলে জানিয়ে এই তুচ্ছ উপহার দিতে তার সংকোচ হচ্ছিল। শাড়ীটা পকেটে রেখে সে ঘোড়ায় চড়ে অনেকক্ষণ চারদিকে ঘুরতে লাগল।

এতদিন রোজ সে খালি হাতে অসংকোচে সুমনের ঘরে যেত কিন্তু আজ উপহার নিয়ে যেতে তার সংকোচ হচ্ছিল। অন্ধকার ঘনিয়ে এলে মন শক্ত করে সে সুমনের ঘরে এল আর পকেট থেকে শাড়ী বের করে শৃঙ্গারদানের উপর রেখে দিল। তার দেরী দেখে সুমন চিন্তিত ছিল। তাকে দেখে সে যেন ফুলের মত ফুটে উঠল। বলল, এ কি আনলে? সদন নিস্পৃহভাবে বলল, কিছু নয়, আজ আসবার পথে শাড়ীটা চোখে পড়তে বেশ ভাল মনে হল, তাই তোমার জন্য নিয়ে এলাম। সুমন মুচকি হেসে বলল, আজ এত দেরী করে আসবার প্রায়শ্চিত্ত কি এইটা? এই বলে সে শাড়ীটা দেখল। সদনের আর্থিক অবস্থায় সেটাকে বহুমূল্য বলা যায়।

সুমনের মনে প্রশ্ন জাগল, এত টাকা পেল কোথায়? বাড়ী থেকে না বলে নেয়নি তো? শর্মাজী এত টাকা দেবেন কেন? কিংবা হয়তো কোন ছুতোয় টাকাটা নিয়েছে। তার একবার মনে হল শাড়ীটা ফেরৎ দিই, কিন্তু তাতে ওর দুঃখ পাবার ভয় আছে। আবার শাড়ীটা নিলে তার দুষ্প্রবৃত্তি বেড়ে যাবার আশংকা আছে। শেষ পর্যন্ত সে ঠিক করল, এবারের মতো নিয়ে-ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করে দি। বলল—এ অনুগ্রহের জন্য কৃতার্থ হলাম কিন্তু আমি উপহারের প্রত্যাশী নই। আপনি যে কষ্ট করে এখানে পায়ের ধুলো দেন, সেটাই কি যথেষ্ট নয়? আমি শুধু আপনার কৃপাদৃষ্টি চাই।

কিন্তু যখন এই উপহার দিয়েও সদনের মনোবাসনা পূর্ণ হল না আর সুমনের ব্যবহারে কোন পার্থক্য দেখা গেল না, তখন তার মনে হল যে তার প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। একটা তুচ্ছ জিনিষ উপহার দিয়ে এত বড় ফল লাভের আশা করাই ভুল। মাটি থেকে লাফ দিয়ে সে যেন আকাশের তারা পাড়বার চেষ্টা করছে ভেবে সে মনে মনে বেশ লজ্জিত হল। এখন তার ধ্যান হল কি করে মূল্যবান প্রেমোপহার দেওয়া যায়। কয়েকমাস কেটে গেল কিন্তু কোন সুযোগ হল না।

একদিন স্নান করার সময় দেখল সাবান নেই। অন্দরের স্নান ঘর থেকে সে সাবান আনতে গেল। ভিতরে পা দিয়েই দেখল যে তাকে একটা কঙ্কণ রয়েছে। স্নান করার সময় সুভদ্রা কঙ্কণ খুলে রেখেছিল। স্নানের পর তাড়াহুড়োয় পরতে ভুলে গেছে। কাছারি যাবার সময় হয়েছে বলে তখনই রান্নাঘরে গিয়েছিল। কঙ্কণ সেখানেই পড়ে রইল। সদন দেখতে পেয়েই সেটা তুলে নিল; তার মনে তখন কোন কুচিন্তা ছিল না। সে ভাবল কাকীকে খুব জ্বালিয়ে তবে দেব, বেশ মজা হবে। কঙ্কণটা লুকিয়ে বাইরে এনে নিজের বাক্সে রেখে দিল।

সুভদ্রা দুপুরে খেয়ে ঘুমিয়ে যখন উঠল তখন প্রায় বিকেল। এই সময় শর্মাজী কাছারি থেকে ফিরে এলে তাঁর সঙ্গে গল্প করতে লাগল। কঙ্কণের কথা মনেই হল না। সদন কয়েকবার অন্দরে ঘুরে দেখে এল এ সম্বন্ধে কোন কথা হচ্ছে কিনা। কিন্তু কোন কথা শুনতে পেল না। সন্ধ্যায় যখন বেড়াতে যাবার জন্য তৈরী হল তখন এক আকস্মিক প্রেরণায় কঙ্কণটা পকেটে পুরে নিল। ভাবতে লাগল কঙ্কণটা সুমনবাঈকে উপহার দিলে কেমন হয়? এখানে তো কেউ আমাকে জিজ্ঞেসই করবে না, আর যদি জিজ্ঞেস করে তো বলে দেব, আমি জানি না। কাকী ভাববে চাকরদের কেউ নিয়েছে। এই রকম সাত পাঁচ ভেবে সে মনস্থির করে ফেলল।

আজ আর বেড়াতে ভাল লাগল না। উপহার দেবার জন্য মন ব্যাকুল। নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই সে ঘোড়াকে দালমণ্ডীর দিকে চালাল। সেখানে একটা ভেলভেটের বাক্স কিনে তাতে কঙ্কণ পুরে সে সুমনের ঘরে হাজির হল। সে চাইছিল যে এই বহুমূল্য জিনিষ এমনভাবে দেবে যেন একটা তুচ্ছ জিনিষ দিচ্ছে। আজ সে অনেকক্ষণ বসে রইল। তার জন্য সন্ধ্যার সময় ঠিক করা ছিল। কিন্তু আজ প্রেমালাপ করতে তার ভাল লাগছিল না। সে ভেবে পেল না কি ভাবে কঙ্কণটা দেবে। যখন অনেক দেরি হয়ে গেল, তখন সে উঠে বাক্সটা পকেট থেকে বের করে তার বিছানায় রেখে দিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল।

সুমন দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল—বাক্সটায় কি আছে?

সদন—কিছু নেই, খালি বাক্স।

সুমন—না, না, একটু দাঁড়ান, আমি দেখে নিই।

এই বলে সে সদনের হাত ধরল আর বাক্সটা খুলে দেখল। এ কঙ্কণ সে সুভদ্রার হাতে দেখেছিল। গড়নটা খুব সুন্দর। চিনতে পেরে বুকে যেন ভার বোধ হল। উদাসভাবে বলল—আমি তো আপনাকে বলেছি যে আমি এ সব জিনিষের প্রত্যাশী নই। আপনি আমায় অনর্থক লজ্জা দিচ্ছেন।

রাজ-রাজড়ার ভঙ্গীতে সে তাচ্ছিল্য দেখিয়ে বলল—গরীবের তুচ্ছ উপহারটা

নেওয়া উচিত।

সুমন—আপনার কৃপাই আমার কাছে অমূল্য জিনিষ, সেটা থাকলেই হবে। এ কঙ্কণ আপনি আমার হয়ে আপনার নতুন রাণীসাহেবাকে দেবেন। আপনার জন্য আমার হৃদয়ে যে পবিত্র প্রেম, সেখানে এ সব জিনিসের আকাঙ্খা নেই। আপনার ব্যবহারে মনে হচ্ছে যে আপনি আমাকে বাজারের মেয়ে ভাবছেন। আপনিই একমাত্র পুরুষ যাকে আমি আমার প্রেম, আমার সর্বস্ব অর্পণ করেছি কিন্তু আপনি এখনও তার মূল্য বোঝেন নি।

সদনের চোখে জল এসে গেল। সে বুঝল, বাস্তবিক এটা আমারই দোষ। আমি ওর অমূল্য প্রেমকে তুচ্ছ উপহারের ইচ্ছা বলে ভেবেছি। অসম্ভব জিনিষের আশায় এই রমণীর প্রতি আমি অন্যায় আচরণ করছি। এর একটি কটাক্ষে নিজের সর্বস্ব লুটিয়ে দেবে না এমন লোক শহরে ক'জন আছে? কত ধনী এখানে আসে, কিন্তু কারো দিকে ও চোখ তুলে তাকায় না; আর আমি এত নীচ যে এই প্রেম পয়সা দিয়ে কিনতে চাইছি। সুমনের গ্লানিতে সে কেঁদে ফেলল। সুমন বুঝল যে তার কথায় ওর বুকে ঘা লেগেছে। করুণ স্বরে বলল—আপনি কি আমার কথায় অসন্তুষ্ট হলেন?

সদন চোখ মুছে বলল—হ্যাঁ, হয়েছি তো।

সুমন—কেন?

সদন—তুমি বাক্যবাণে বিঁধছো বলে। তুমি ভাবছ তুচ্ছ জিনিষ দিয়ে প্রেম কিনতে চাইছি।

সুমন—তবে এমন জিনিষ আনেন কেন?

সদন—আমার ইচ্ছা।

সুমন—না, এবার থেকে আমায় ক্ষমা করবেন।

সদন—আচ্ছা, সে দেখা যাবে।

সুমন—আপনার খাতিরে উপহারটা আমার কাছে জমা রাখলাম। আপনি এখন স্বাধীন নন। যখন আপনি রাজ্যের মালিক হবেন, তখন আপনার কাছ থেকে ইচ্ছেমত জিনিষ নেব। এখন নয়।

১৮

বাবু বিঠলদাস কোন কাজ মাঝপথে ছাড়তেন না। পদ্মসিংহের কাছে নিরাশ হয়ে তার চিন্তা হল সুমনবাঈএর জন্য প্রতি মাসে ৫০ টাকা কি করে জোগাড় হবে। তাঁর স্থাপিত সংস্থাগুলো চাঁদার উপরই চলত, কিন্তু চাঁদা

আদায় একটা সমস্যা। বিধবাশ্রমের জন্য বাড়ী শুরু করলেন কিন্তু দু'বছরে তার দেওয়াল ভেঙ্গে পড়ছে, ছাত তৈরী করার টাকা যোগাড় হচ্ছে না। দাতব্য গ্রন্থাগারের বই উইয়ে কাটছে, আলমারী জুটছে-না। এত বাধা থাকলেও তবু চাঁদা ছাড়া টাকা যোগাড়ের অন্য উপায় তাঁর জানা ছিল না। শেঠ বলভদ্রদাস ছিলেন শহরের প্রধান নেতা, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট এবং মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান। প্রথমেই তাঁর কাছে গেলেন। শেঠজী আরাম চেয়ারে বসে তামাক খাচ্ছিলেন। ফর্সা, রোগা চেহারা, যেমন রসিক তেমনি বিলাসী। প্রত্যেকটি কাজ অতি ভেবে চিন্তে করতেন। বিঠলদাসের প্রস্তাব শুনে বললেন —প্রস্তাব তো ভালই, কিন্তু সুমনকে আপনি কোথায় রাখতে চান ?

বিঠলদাস—বিধবাশ্রমে।

বলভদ্র—আশ্রমের বদনাম হবে আর অন্য বিধবারাও আশ্রম ছেড়ে দিতে পারে।

বিঠল—তবে অন্য ঘর ভাড়া করে রাখব।

বলভদ্র—পাড়ার ছেলেরা খুনোখুনি করে মরবে।

বিঠল—তবে আপনিই বলুন কি করা যায় ?

বলভদ্র—আমার মত হচ্ছে যে আপনি এ ঝামেলায় যাবেন না। যে মেয়ের লোকলজ্জার ভয় নেই, কারো ক্ষমতা নেই যে তাকে শোধরায়। যখন আমাদের কোন অঙ্গ পচে যায়, তখন সেটা কেটে ফেলাই নিয়ম হওয়া উচিত, মনে হচ্ছে আপনি আমার সঙ্গে একমত নন। যা হোক আমার মত আপনাকে স্পষ্ট জানালাম। আশ্রমের পরিচালক সভার আমিও একজন সদস্য। আমি কোন ক্রমেই এক বেশ্যাকে আশ্রমে স্থান দেবার পরামর্শ দেব না।

বিঠলদাস বললেন—সার কথা এই হল যে আপনি আমায় কোনও সাহায্য দেবেন না। আপনার মত মহাপুরুষেরই যখন এই মত, তখন অপরের কাছে আর কী বা আশা করা যায়। আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম, ক্ষমা করবেন।

এই বলে বিঠলদাস সেখান থেকে উঠে শেঠ চিমনলাল জীর কাছে গেলেন। শ্যাম বর্ণ, মোটা বেটপ চেহারা। যেন হাড়ের জায়গায় মাংস আর মাংসের জায়গায় হাওয়া ভরা। বুদ্ধিও শরীরের অনুরূপ। তিনি ধর্ম-ধর্ম সভার সভাপতি, রামলীলা কমিটির চেয়ারম্যান আর রামলীলা পরিষদের প্রবন্ধক। তাঁর কাছে রাজনীতি হচ্ছে বিষাক্ত সাপ আর সংবাদপত্র যেন সাপের বিষদাঁত। উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে খুব মেলা মেশা করেন। ইংরেজ সমাজেও যথেষ্ট সম্মান। তাঁরা তাঁর সদ্‌গুণের খুব প্রশংসা করেন। তিনি না উদার না কৃপণ, এ বিষয়ে চাঁদাদাতাদের নামের তালিকা দেখে নিজের কর্তব্য স্থির করতেন। তিনি খুব আমোদপ্রিয়। এই সদ্‌গুণ তাঁর অনেক দুর্বলতা ঢেকে দিত।

বিঠলদাসের প্রস্তাব শুনে বললেন—মশাই, আপনি তো পুরো বেরসিক দেখছি। একটুও রস কস নেই। কতকাল পরে দালমণ্ডীতে চোখে পড়ার মত একটা জিনিষ এসেছে, আর আপনি তাকে গায়েব করে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। এ বারের রামলীলাটা অন্ততঃ কেটে যাক। রাম রাজা হবার দিন ওর জলসা হবে, দারুণ জমবে। শেষে তো তুর্কী এসে মন্দির অপবিত্র করবে; তার জায়গায় ব্রাহ্মণী থাকলে ক্ষতি কি! যাক হাসিঠাট্টা করলাম বলে ক্ষমা করবেন। এসব সৎকাজ আপনার জন্যই সফল হয় বলে আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কই চাঁদার ফিরিস্তি দেখি।

বিঠলদাস মাথা চুলকে বললেন—এখন তো শুধু বলভদ্রদাসের কাছে গিয়েছিলাম। আপনি তো জানেন তিনি শুধু বাক্যির জাহাজ, আজে বাজে কথা বলে ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলেন।

যদি বলভদ্রদাস এক লিখতেন তবে এখানে যে দুই মিলিত তাতে সন্দেহ নেই। দুই লিখলে এখানে নিশ্চয় চার মিলিত। কিন্তু গুণেক যখন শূন্য তখন গুণফল শূন্য ছাড়া আর কি হতে পারে? কিন্তু ছুতো একটা চাই, আর তা মিলেও গেল। বললেন—মশাই, আপনার কাজে আমার সহানুভূতি আছে, কিন্তু বলভদ্রদাস কিছু ভেবেই তো গা করেন নি। একটু তলিয়ে ভেবে বুঝছি এতে রাজনীতির গন্ধ আছে। আপনি হয়তো ব্যাপারটা এভাবে দেখছেন না, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এতে গুপ্তভাবে রাজনীতি ঠাসা আছে। মুসলমানদের এটা নিশ্চয় খারাপ লাগবে, আর বড় কর্তাদের কাছে নালিশ করবে। কর্তাদের তো চেনেন, তাঁদের চোখ নেই, শুধু কান আছে। তাঁরা বুঝে নেবেন এর মধ্যে ষড়যন্ত্র আছে।

বিঠলদাস একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন—পরিষ্কার করে বলে দিলেই হয় যে কিছু দেবেন না।

চিমনলাল—আপনি ঠিক বুঝেছেন। গোটা জাতের উদ্ধারের ঠিকে আমি নিই নি।

বিঠলদাস বিফল মনোরথ হলেও এটা তার কাছে নতুন নয়। এমন নৈরাশ্যের ব্যথা তার নিত্যই জোটে। এর পর তিনি ডঃ শ্যামাচরণের কাছে গেলেন। তিনি যথেষ্ট বিদ্বান ও বুদ্ধিমান। শহরের এক প্রবীন রাজনৈতিক নেতা; ওকালতিতেও তাঁর খুব পসার। খুব হিসেব করে প্রত্যেকটি কথা বলেন। তাঁর মৌন গাম্ভীর্যকে লোকে জ্ঞানীর লক্ষণ ভাবত। খুবই শান্তি প্রিয় লোক; তাঁর বিরোধে কারো ক্ষতি হয় না বা সমর্থনেও কারো লাভ হয় না। সকলে তাঁকে বন্ধু ভাবে আবার সবাই তাকে শত্রুও ভাবে। তিনি নিজের এলাকার উপদেষ্টা সমিতির একজন সদস্য। বিঠলদাসের কথা শুনে বললেন—আমার ক্ষমতায় যা সম্ভব তা করতে আমি রাজী। কিন্তু আমাদের চেষ্টা করতে

হবে যাতে এই সমস্যার মূল কুপ্রথাটা দূর করতে পারি। আপনি এখন একজনকে রক্ষা করবেন কিন্তু তাতে কি হবে? এ ব্যাপার তো এখানে নিত্যই ঘটছে। মূল কারণ দূর করা দরকার। আচ্ছা, কাউন্সিলে কি এ বিষয়ে প্রশ্ন তুলব?

বিঠলদাস উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, এ তো খুব ভালোই হবে।

ডঃ শ্যামাচরণ তৎক্ষণাৎ প্রশ্নমালা তৈরী করে ফেললেন—

১। সরকার কি জানাবেন যে গত বৎসর বেশ্যার সংখ্যা কত বেড়েছে?

২। সরকার কি এই বৃদ্ধির কারণ জেনেছেন এবং এর প্রতিরোধের কি ব্যবস্থা করেছেন?

৩। এর জন্য মনোবিকার কতটা দায়ী, কতটা আর্থিক পরিস্থিতি দায়ী এবং সামাজিক কুপ্রথা কতখানি দায়ী?

এর পর তিনি নিজের মক্কেলদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। বিঠলদাস আধ ঘণ্টা বসে থেকে শেষে বললেন—তা আমার বিষয়ে কি বলছেন?

শ্যামাচরণ—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এবার কাউন্সিলের বৈঠকে এ প্রসঙ্গ আমি নিশ্চয় তুলব।

বিঠলদাসের ইচ্ছা হল কিছু কড়া কথা শোনাতে, কিন্তু ভেবে চিন্তে চুপ করে গেলেন। অন্য কোন বড়লোকের কাছে যেতে আর সাহস হল না। কিন্তু তিনি নিরুৎসাহ হলেন না। রোজ ভদ্রলোকদের কাছে সাহায্য চাইতেন। তাঁর পরিশ্রম সব সময় বিফল হত না। কয়েকশো টাকা নগদ এবং কয়েকশো টাকার অঙ্গীকার পাওয়া গেল, কিন্তু দরকার হচ্ছে মাসিক ৫০ টাকা; এ সামান্য টাকায় তা হওয়া অসম্ভব। তিন মাস ছুটোছুটি করে অতিকষ্টে মাসিক ১০ টাকা আদায় করতে পারলেন।

আর বেশী যোগাড় করা সম্ভব নয় দেখে তিনি একদিন সকালে সুমনবাঈএর কাছে গেলেন। তাঁকে দেখে সুমন একটু বিব্রত হয়ে বলল—বসুন, কি মনে করে পায়ের ধুলো পড়ল?

বিঠল—তোমার প্রতিজ্ঞা মনে আছে তো?

সুমন—এতদিন পরে যদি ভুলে যাই তো সেটা আমার দোষ নয়।

বিঠল—আমি তো তাড়াতাড়ি যোগাড় করতে চাইছিলাম, কিন্তু এমন লোকেদের পাল্লায় পড়েছি যাদের জাতীয়তা একেবারে লোপ পেয়েছে। তবু আমার প্রয়াস একেবারে ব্যর্থ হয় নি। মাসে ৩০ টাকার যোগাড় হয়েছে; আশা করি বাকীটাও পাওয়া যাবে। এখন তোমার কাছে আমার অনুরোধ যে তুমি এই নিয়ে আজই এ নরককুণ্ড ছেড়ে দাও।

সুমন—শর্মাজীকে আপনি আনতে পারলেন না?

বিঠল—কোনমতেই তাঁকে রাজী করানো গেল না। তবে এই ৩০ টাকায়

মধ্যে মাসিক ২০ টাকা তিনিই দেবেন বলেছেন।

সুমন—বিস্মিত হয়ে বলল—তাই নাকি? খুব উদার মনে হচ্ছে। শেঠজীদের কাছ থেকে কিছু সাহায্য পেলেন?

বিঠল—শেঠজীদের কথা বলো না। চিমনলাল রামলীলার জন্য হাজার দু' হাজার খুশি হয়ে দেবেন। বড় অফিসারদের আপ্যায়নে বলভদ্রদাস এর চেয়েও বেশী খরচ করতে রাজী হবেন, কিন্তু এ ব্যাপারে হাত গুটিয়ে নিয়েছেন।

সুমন এ সময় সদনের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল। যে প্রেমের আনন্দ আগে সে কখনো পায় নি এখন তা ছাড়তে তার মন চাইছিল না। যদিও সে জানত যে এই প্রেমের পরিণাম বিয়োগান্তক হতে বাধ্য তবু তার মন বলছিল যতদিন আনন্দ পাচ্ছি সেটা ভোগ করে নেব না কেন। ভবিষ্যতে কি হবে, জীবন কোন্ আবর্তে পড়ে, না জানি কোথায় কোথায় ঘুরবে। ভবিষ্যতের চিন্তা করতে সে ভয় পেত। কারণ সেখানে ঘোর অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কাজেই যে উদ্ধারের আশায় সে বিঠলদাসের প্রস্তাবে সায় দিয়েছিল সেটা ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। এ সময় বিঠলদাস মাসে ১০০ টাকার লোভ দেখালেও তার মন উঠত না; কিন্তু একবার কথা দিয়ে সেটা অস্বীকার করতে তার লজ্জা হচ্ছিল। বলল —আমি এর উত্তর কাল দেব। আমায় একটু ভাবতে দিন।

বিঠল—এতে আর ভাবনা-চিন্তার কি আছে?

সুমন—কিছু না, তবু কালকেই কথা হবে।

রাত দশটা বেজে গেছে। সারা আকাশে শরতের জ্যোৎস্না ছেয়ে আছে। সুমন জানলা দিয়ে বাইরের নীল আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। চাঁদের আলোয় তারার জ্যোতি যেমন ম্লান হয়ে গিয়েছে, তার হৃদয়াকাশে চাঁদ রূপে সুবিচার যেন বিকার রূপী তারাদের ম্লান করে দিচ্ছিল।

সুমনের সব চেয়ে বড় সমস্যা বিঠলদাসকে কি উত্তর দেব? কাল জবাব দেব বলে আজ সে বিঠলদাসকে এড়িয়েছে। কিন্তু সারাদিন চিন্তা করার ফলে তার মন কিছুটা বদলে গিয়েছিল।

যদিও সুমন ভোগবিলাসের সব জিনিষ পেয়েছিল, কিন্তু সেজন্য তাকে এমন সব লোককে অভ্যর্থনা করতে হত, যাদের দেখে তার ঘৃণা হত, যাদের কথা শুনলে তার গা জ্বালা করত। তার সৎ স্বভাব এখনও সম্পূর্ণ লোপ পায় নি; তার অধোগতি এখনও সেই স্তরে পৌঁছায় নি।

ভোগ বিলাসের জিনিষ তার প্রিয় হলেও বিলাসিতার সামগ্রী সংগ্রহের জন্যে তাকে যতটা নামতে হত তা তার অসহ্য মনে হত। কখনো একলা বসে সে তার বর্তমান অবস্থার সঙ্গে অতীতের অবস্থার তুলনা করত। সেখানে বৈভব ছিল না বটে কিন্তু সমাজ তাকে সম্মানের চোখে দেখত। পড়শীদের কাছে নিজের কুল, ধর্ম, ভক্তির প্রভাব দেখাতে পারত। কারো সামনে মাথা নিচু করতে হত না।

কিন্তু এখানে সব সময় লজ্জায় মাথা নিচু করে থাকতে হয়। আগেকার অনাদর অপমানের তুলনায় এখনকার প্রেমালাপ ও চোখের ইশারা অনেক বেশী দুঃখ দেয়। আর তখনই পদ্মসিংহের উপর রাগ হয়। বদনামের ভয়ে সেদিন নিষ্ঠুরের মত আমাকে তাড়িয়ে না দিলে আমাকে এ পাপ কুণ্ডে ঢুকতে হত না। চারটে দিন আমায় থাকতে দিলে আমি হয়তো ঘরে ফিরে যেতাম কিংবা আমার স্বামী আমায় ঘরে নিয়ে যেত। তেমনি ঝগড়া বিবাদের মধ্যেই বাকী জীবন কেটে যেত। সেইজন্যই সে বিঠলদাসকে বলেছিল পদ্মসিংহকে নিয়ে আসতে।

কিন্তু আজ যখন বিঠলদাসের কাছে শুনল পদ্মসিংহ তাকে উদ্ধার করতে কত উৎসুক, তাকে সাহায্য করবার জন্য কতটা উদার হয়েছে, তখন ঘৃণার বদলে পদ্মসিংহের উপর শ্রদ্ধা হল। সে অকারণেই তাঁর মত ভদ্রলোকের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছিল। এখন তার ইচ্ছা হচ্ছিল তাঁর পায়ে পড়ে বলে, আপনি অভাগীর যে উপকার করেছেন সেজন্য ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। কংকণটাও ফেরৎ দেব। এতে তাঁর ধারণা হবে যে অযোগ্য লোককে তিনি উদ্ধার করেন নি। তারপর পাপের এই মায়াজাল কেটে বেরিয়ে যাব।

কিন্তু সদনকে কি করে ভুলব?

নিজের মনের চাঞ্চল্যে তার রাগ হল। কলুষিত প্রেমের জন্য জীবন শুধরে নেবার এই দুর্লভ সুযোগ হাতছাড়া করব? চারদিনের জ্যোৎস্নার লোভে চিরকাল এই অন্ধকার পাপকুণ্ডে পড়ে থাকব? নিজের হাতে এক সরল যুবকের জীবন নষ্ট করব? যে ভদ্রলোক আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করছে তার সঙ্গে এই ছলনা! না—আমি এই দূষিত প্রেম উপড়ে ফেলে তাকে ভুলে যাব। তাকে বলব তুমিও আমায় এই মায়াজাল থেকে বের হতে দাও।

ওঃ! কি ভুলই না করেছি! এ জায়গা দূর থেকে কত সুন্দর, কত মনোরম, কত সুখময় দেখাত। আমি একে ফুলের বাগান ভেবেছিলাম, কিন্তু এটা কী? এক ভয়ংকর বন, যেখানে হিংস্র পশু আর বিষাক্ত পোকামাকড় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এ জীবনটা যেন একটা নদী, দূর থেকে মনে হয় চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে। কিন্তু এখানে কি আছে? হাঙ্গর কুমীরেরা মহানন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুমন এই সব চিন্তায় ডুবে ছিল। ভাবছিল কখন সকাল হবে, বিঠলদাস আসবে আর এখান থেকে সে উদ্ধার পাবে। রাত দুপুর হয়ে গেলেও চোখে ঘুম নেই। তার ভয় হল যদি বিঠলদাস সকালে না আসে তবে কি হবে? তবে কি আমার আবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গান পাগল মানুষদের খোসামোদ শুনতে হবে? আবার এই সব দুর্বৃত্তদের আদর অভ্যর্থনা করতে হবে? এখানে ছ মাসও সে আসে নি কিন্তু এর মধ্যেই সে এখানকার সব হাল জানতে পেরেছে। এখানে সারাদিন এই সব দুরাচারীদের ভিড়। তারা নিজেদের কুকর্মের কথা

গর্ব করে জানায়। তাদের কেউ নামী পকেটমার, কেউ বা তাসের জুয়ায় নিপুণ, কেউ চুরি বিদ্যায় পটু, কেউ বা দেয়াল টপকাতে ওস্তাদ—সবাই নিজের কেরামতির জন্য গর্বিত। পাড়ার মেয়েদেরও যাতায়াত ছিল, কি তাদের রং ঢং, কি সাজের বাহার, আলোর মত ঝলমল করছে। কিন্তু সবাই যেন স্বর্ণপাত্রে ভরা কালকূট বিষ—কি নির্লজ্জ, ছলনাময়ী ও চরিত্রহীনা! পতিতাবৃত্তির বিবরণ কত আনন্দেই শোনায়। লজ্জার লেশ নেই, সব সময় ছল চাতুরী, মনে সব সময় পাপতৃষ্ণা।

শহরের যারা সচ্চরিত্র, তাদের এরা গালমন্দ করত, হাসিঠাট্টা করত, হাঁদা, বোকা, গাধা ইত্যাদি পদবীতে ভূষিত করত। সারাদিন শহরের চুরি, ডাকাতি, হত্যা, ব্যাভিচার, গর্ভপাত, বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনার কথা লেগে থাকত। এখানকার আদর আর প্রেমের স্বরূপ সে জেনেছে—এখানে প্রেম ভালবাসা নেই, আছে শুধু ভোগ লিপ্সা।

এতদিন সুমন এইসব বিপদ এড়িয়ে এসেছে। সে বুঝে নিয়েছে এই নরক কুণ্ডে জীবন কাটাতে হলে এ সব এড়ানো যাবে না। নরকে থাকলে নরকের ধর্ম মেনেই চলতে হবে। প্রথমে যখন বিঠলদাস তার কাছে এসেছিলেন, সে মনে মনে তাঁকে উপেক্ষা করেছিল। তখন সে এখানকার সব রং ঢং জানত না। কিন্তু আজ সামনে মুক্তির দরজা খোলা দেখে এই কারাগারে ক্ষণিকের জন্য থাকা তার অসহ্য মনে হচ্ছিল, যেমন সুযোগ পেলেই মানুষের পাপের ইচ্ছে জেগে ওঠে, তেমনি সুযোগ পেয়ে তার মুক্তির ইচ্ছাও প্রবল হয়ে উঠল।

রাত তিনটে বেজেছে, সুমন বিছানায় এপাশ ওপাশ করছে। মন জোর করে সদনের দিকে চলেছে। যতই সকাল হয়ে আসছে, তার ব্যগ্রতাও ততই বাড়ছে। সে নিজের মনকে বোঝায়, তুই এই প্রেমের গর্ব করছিস, জানিস না এর মূল্য শুধু রং-রূপ। এটা প্রেম নয়, শুধু কামনা। খাঁটি প্রেমের জন্য কেউ এখানে আসে না। যেমন খাঁটি উপাসনা করতে কেউ মন্দিরে যায় না, তেমনি এই মণ্ডীতে কেউ খাঁটি প্রেমের সওদা করতে আসে না, আসে শুধু সাময়িক মনের তৃপ্তির জন্য। এই প্রেমের ফাঁদে পড়িস না।

ভোরের বেলা সুমন ঘুমিয়ে পড়ে।

১৭

সন্ধ্যা হয়ে এল, সুমন সারাদিন বিঠলদাসের পথ চেয়ে বসে আছে, এখনো এলেন না। সুমনের মনে যে সব শঙ্কা উঁকি মেরে যাচ্ছিল তা বাড়তে লাগল। তিনি আর আসবেন না, নিশ্চয় কোথাও বিঘ্ন ঘটেছে। হয়তো অন্য কাজে আটকে গেছেন। না হয় যারা সাহায্য দেবে বলেছিল তারা পিছিয়ে গেছে, যাই হোক বিঠলদাসের এখানে একবার আসা উচিত ছিল। আমি তা হলে ব্যাপারটা জানতে পারতাম। যদি কেউ আমাকে সাহায্য না করে তো না করুক, আমি নিজেই কোন কাজ করে চালিয়ে নেব, শুধু মাথার উপর একজন ভদ্রলোক থাকা চাই। বিঠলদাস কি এটুকুও পারবেন না? যাই, তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলি আমার আর্থিক সাহায্যের দরকার নেই, আপনি এর জন্য ঘোরাঘুরি করবেন না, শুধু আমার মাথা গোঁজার ঠাঁই দিয়ে একটা সামান্য কাজ অনন্ত দিন যাতে কোন রকমে আমার পেট চলে যায়। আমি আর কিছু চাই না, কিন্তু আমি তো তার বাড়ী চিনি না। কোথায় তাঁকে খুঁজে বেড়াব?

পার্কের দিকেই যাই, সেখানে অনেকে হাওয়াখেতে আসেন সেখানে হয়তো তাঁর দেখা মিলতে পারে। শর্মাজী নিত্য ঐ দিকে বেড়াতে যান, তাঁর সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে। তাঁকে কঙ্কণটা দিয়ে দেব আর এই সুযোগে তাঁর সঙ্গেও এ বিষয়ে কিছু কথাবার্তা করে নেব।

এই স্থির করে এক ভাড়াটে গাড়ী আনিয়ে সুমন একলা বেড়াতে বের হলো। গাড়ীর জানালা বন্ধ করে খড়খড়ি দিয়ে দেখতে লাগল। ছাউনি পর্যন্ত দু'ধার দেখতে দেখতে গেল কিন্তু দুজনের কাউকেই দেখতে পেল না। কোচমানকে কুইন্স পার্কের দিকে যাবার জন্য বলতে গিয়ে দেখলে সদন ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে, সুমনের বুকটা তোলপাড় হতে লাগল। মনে হল যেন অনেক বছর পরে দেখা। জায়গা বদলাবার ফলে কখনো কখনো প্রেমে নতুন জোয়ার আসে। তার ইচ্ছে হল ওকে ডাকে, কিন্তু সে মনের ইচ্ছে মনেতেই চেপে রাখল। যতক্ষণ না সদন চোখের আড়ালে গেল ততক্ষণ সে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল। সদনের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য এর আগে কোনদিন তাকে এত মুগ্ধ করেনি।

গাড়ী কুইন্স পার্কের দিকে চলেছে। পার্কটা শহর থেকে দূরে, খুব কম লোকই এদিকে আসে, কিন্তু নির্জনতা-প্রিয় পদ্মসিংহের মন তাঁকে এখানে টেনে আনত। এখানে খোলা মাঠে ঠেসান দেওয়া বেনচে বসে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা

ধরে নানা চিন্তা করতেন। গাড়ী যখন গেটের ভিতর ঢুকল তখন সুমন দেখল মাঠে শর্মাজী একলা বসে আছেন। সুমনের বুক কাঁপতে লাগল। এরকম লাগবে জানলে সে এখানে আসতেই পারত না। কিন্তু এতদূরে এসে শর্মাজীকে সামনে বসে থাকতে দেখে এখন ফিরে যাওয়া বোকামি। একটু দূরে গাড়ী থামিয়ে গাড়ী থেকে নেমে সে শর্মাজীর দিকে চলল, যেমনভাবে শব্দ বায়ুর প্রতিকূলে চলে।

শর্মাজী কৌতূহলের সঙ্গে গাড়ীটা দেখছিলেন। তিনি সুমনকে চিনতে পারেন নি। এক মহিলাকে এদিকে আসতে দেখে অবাক হচ্ছিলেন। মনে হল হয়তো কোন খৃষ্টান মহিলা হবে, কিন্তু সুমন কাছে এলে তাকে চিনতে পারলেন। যখন সুমন মাথা নিচু করে তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল, তখন তিনি এদিকে ওদিকে এমনভাবে তাকালেন যেন লুকোবার গর্ত খুঁজছেন। তারপর হঠাৎ উঠে পিছন ফিরে চলতে আরম্ভ করলেন। সুমনের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। কি আশা নিয়ে সে এখানে এসেছে আর কি দেখছে! হে ভগবান! ইনি আমাকে এত নীচ ভাবেন যে আমার ছায়াও মাড়াতে চান না। শর্মাজীর উপর যে শ্রদ্ধা তার মনে জেগেছিল তা নিমেষে মিলিয়ে গেল। বলল—আমি আপনাকে কিছু বলতে এসেছি, দয়া করে একটু দাঁড়ান।

শর্মাজী চলার বেগ বাড়ালেন, যেন ভূত দেখেছেন। এ অপমান সুমনের অসহ্য ঠেকল। সে তীব্রস্বরে বলল—আমি আপনার কাছে কিছু চাইতে আসিনি আপনি মিথ্যে ভয় পাচ্ছেন। আমি শুধু আপনাকে কঙ্কণ দিতে এসেছি। এই নিন, আমি চলে যাচ্ছি।

এই বলে সে কঙ্কণটা বের করে শর্মাজীর দিকে ছুঁড়ে দিল।

সুমন গাড়ীর দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল, শর্মাজী কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি এ কঙ্কণ কোথায় পেলে?

সুমন—যদি আমি আপনার কথার উত্তর না দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাই সেটা আপনার বোধ হয় খারাপ লাগবে না।

পদ্ম—সুমনবাঈ, আমায় লজ্জা দিয়ো না। আমি তোমার সামনে মুখ দেখাবার যোগ্য নই।

সুমন—কেন?

পদ্ম—বার বার এই ভেবে আমি কষ্ট পাই যে তখন তোমাকে আমার বাড়ী থেকে চলে যেতে না বললে এ বিপর্যয় ঘটত না।

সুমন—তা এর জন্য আপনি লজ্জা পাচ্ছেন কেন? আপনার ঘর থেকে তাড়িয়ে তো আমায় কৃপাই করেছেন, আমার জীবন শুধরে দিয়েছেন।

এই বক্রোক্তিতে শর্মাজী জ্বলে উঠে বললেন—এ কৃপা হচ্ছে গজাধর পাণ্ডের আর বিঠলদাসের। আমি এমন কৃপা করতে চাই না।

সুমন—আপনার কাজটা হয়েছে সেই গল্পের মত 'প্রাণে মারিস না, হাত

পা বেঁধে নদীতে ফেলে দে, যাই বলুন আমি তো মনে আপনার দয়া জানি। শর্মাজী, আমাকে মুখ খোলাবেন না, মনের কথা মনেই থাক; কিন্তু আপনার মত সহৃদয় মানুষের কাছে এ নিষ্ঠুরতা প্রত্যাশা করি নি। আপনারা হয়তো ভাবেন যে আদর সম্মান বড়লোকদের একচেটিয়া, কিন্তু দীন দুঃখীদেরও এ সবের প্রত্যাশা কম নয়, বরং বেশি, কারণ তাদের এ সব পাওয়া শক্ত। আদর সম্মানে যে সন্তোষ পাওয়া যায়, ঐশ্বর্যে ভোগ বিলাসে তা মেলে না। আমার মনে সব সময় প্রশ্ন জাগত কি করে সকলের কাছে খাতির পাওয়া যায়, নানারকম প্রশ্নও মনে জেগেছিল, কিন্তু আপনার বাড়িতে হোলির জলসার দিন এর সব সমাধান মিলল, আমার ভুলও ভাঙ্গল। আমি আপনাদের সম্মান পাবার পথ খুঁজে পেলাম। যদি সে জলসা না দেখতাম তো আজ আমি কুঁড়ে ঘরেই সন্তুষ্ট থাকতাম। আপনাকে সচ্চরিত্র পুরুষ বলে জানতাম, তাই আপনার ব্যবহারে আমি বিশেষভাবে প্রভাবিত হই। ভোলাবাঈ আপনার সামনে যখন গর্বভরে বসল তখন আপনি তার সামনে একেবারে অনুগত ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। আপনার বন্ধুরা তার ইশারায় যেন কাঠপুতুলের মতো নাচছিল। একজন সরল হৃদয় প্রেমপিপাসু স্ত্রীর এই দৃশ্য দেখে যে ফল হওয়া সম্ভব আমার তাই হল। কিন্তু এ সব বলে এখন কি লাভ? যা হবার তাই হয়েছে। আপনাকে কেন দোষ দিই? এ সব আমারই দোষ। আমি······

সুমন আরো কিছু বলতে চাইছিল, কিন্তু শর্মাজী গম্ভীরভাবে তার কথা শুনতে শুনতে মাঝপথে তাকে থামিয়ে বললেন—সুমন, তুমি এ সব কথা কি আমাকে লজ্জা দেবার জন্য বলছ না সত্যি কথা বলছ?

সুমন—আপনাকে লজ্জা দেবার জন্য বললেও কথাগুলো সত্যি। এ সব কথা অনেকদিন ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু এখন আপনাকে আমার ছায়ার কাছ থেকেও দূরে যেতে দেখে সে সব কথা মনে পড়ল। এখন আমার নিজেরই অনুশোচনা হচ্ছে, আমাকে ক্ষমা করুন।

শর্মাজী মাথা নিচু করেই ভাবতে লাগলেন। সুমন তাঁকে ধন্যবাদ দিতে এসেছিল কিন্তু কথাবার্তার ধরন এমন হল যে সে অবসর হল না। এই অপ্রিয় আলোচনার পর তার পক্ষে অনুগ্রহ আর কৃপার কথা তোলা সুমনের অসংগত মনে হল। সে নিজের গাড়ীর দিকে এগোল। হঠাৎ শর্মাজী বললেন—আর কঙ্কণ?

সুমন—এক বন্ধকের কারবারী কাল আমায় এটা দেখিয়েছিল। আমি বহুজীর হাতে এটা দেখেছিলাম, চিনতে পেরে সেখান থেকে নিয়ে এসেছি।

শর্মা—কত দিতে হয়েছে?

সুমন—কিছু না, উল্টে আরো ধমক দিয়েছি।

শর্মা—তার নাম বলতে পার?

সুমন—না, তাকে কথা দিয়েছি—এই বলে সুমন চলে গেল। শর্মাজী কিছুক্ষণ বসে থেকে শেষে বেনচে শুয়ে পড়লেন। সুমনের প্রত্যেকটি কথা তাঁর মনে বিঁধছিল। গভীর চিন্তা তাঁকে এমনভাবে গ্রাস করল যে কেউ সামনে এসে দাঁড়ালেও বুঝতে পারতেন না। সমস্ত চিন্তা তাঁকে বজ্রাহতের মতো স্তম্ভিত করে ছিল। যেন তাঁর হৃদয় কঠিন আঘাতে গুঁড়িয়ে গেছে। সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে এলো। স্বভাবতঃ তিনি ভাবপ্রবণ, সুভদ্রা ঠাট্টা করেও যেটুকু বিদ্রূপ করত তিনি সে কথা অনেকদিন ভুলতে পারতেন না। এতদিন তাঁর নিজের ব্যবহার, আচার-বিচার কর্তব্যপালন সম্বন্ধে বেশ গর্ব ছিল। আজ সে গর্ব দূর হল, যে অপরাধ তিনি গজাধর আর বিঠলদাসের ঘাড়ে চাপিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন, সেটা আজ শতগুণ বেশী হয়ে তাঁকে চেপে ধরেছে। অপরাধের ভারে মাথা নুয়ে পড়েছে। তাঁর বিবেকদংশনের মধ্যে শুনতে পেলেন বহুদূর থেকে যেন শব্দ ভেসে আসছে, 'এই জলসা না হলে আজ আমি কুঁড়ে ঘরেই সুখে থাকতাম।' হঠাৎ হাওয়া উঠল, পাতা দুলতে লাগল, গাছগুলো নিজেদের ভয়ংকর কালো কালো মাথা নেড়ে যেন বলতে লাগল, সুমনের এই দুর্গতির জন্য তুমিই দায়ী।

শর্মাজী চমকে উঠে পড়লেন। সামনের গির্জার চূড়া থেকে ঘণ্টা বাজার শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঘণ্টার শব্দটাও যেন বলছে সুমনের এই দুর্গতির জন্য তুমি দায়ী।

শর্মাজী মন থেকে সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে এগোলেন। আকাশে দৃষ্টি পড়ল সেখানেও যেন কালো মেঘের গায়ে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা রয়েছে, সুমনের এই দুর্গতির জন্য তুমিই দায়ী।

খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে আকাশে ঘন মেঘ দেখলে লোকে যেমন দূরের গাছের দিকে ছোটে, শর্মাজী সেই ভাবে লম্বা লম্বা পা ফেলে পার্ক ছেড়ে বসতির দিকে এগিয়ে চললেন, কিন্তু চিন্তার জাল তাঁকে ছাড়ল না। সুমন তাঁর পিছনে আসতে লাগল, কখনো পথের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলে, আমার দুর্গতি তুমিই করেছ। কখনো ডাইনে, কখনো বাঁয়ে এসে সেই কথাই বলে। শর্মাজী অনেক কষ্টে বাড়ী ফিরে ঘরে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়লেন। সুভদ্রা বার বার খেয়ে নেবার কথা বললে তিনি মাথার যন্ত্রণার দোহাই দিয়ে এড়িয়ে গেলেন। সারারাত সুমন তাঁর হৃদয়ে চেপে বসে তাঁকে অভিযোগ করতে লাগল, তুমি বিদ্বান হয়েছ, নিজের বুদ্ধি-বিবেকের জন্য তোমার অহংকার, কিন্তু তুমি খড়ের ঘরের কাছে বারুদভরা হাউই ছাড়ছ। নিজের পয়সা ওড়াতে চাও তো মাঠে গিয়ে ওড়াও, গরীব-দুঃখীর ঘর জ্বালাও কেন?

সকাল হতেই শর্মাজী বিঠলদাসের বাড়ীতে হাজির হলেন।

২০

সন্ধ্যার সময় সুভদ্রার কঙ্কণের কথা মনে পড়ল। ছুটে স্নানঘরে গেল। তার বেশ মনে পড়ল যে সে কঙ্কণটা তাকেই রেখেছিল, কিন্তু তার কোন চিহ্ন নেই। সে বেশ ঘাবড়ে গেল, নিজের ঘরে এসে সব তাক, আলমারি খুঁজে দেখল। রান্নাঘরের চারপাশে খুঁজে দেখল, দুশ্চিন্তা বাড়তে লাগল। শেষে সব বাক্স প্যাঁটরা, সিন্দুক তন্নতন্ন করে খুঁজল যেন ছুঁচ খুঁজছে, কিন্তু কঙ্কণের কোন চিহ্ন কোথাও নেই। ঝিকে জিজ্ঞাসা করলে সে নিজের ছেলের দিব্যি করে বলল যে সে কিছু জানে না। জিতনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল। সে বলল—মালকিন, বুড়ো বয়সে এ বদনাম দিয়ো না। সারা জীবন অনেক ভালো লোকের কাছে চাকরি করেছি, কিন্তু কখনও অধর্মের কাজ করিনি। আর ক'টা দিন বাঁচবো যে অধর্ম করব?

সুভদ্রা হতাশ হয়ে ভাবল, আর কাকে জিজ্ঞাসা করি? মন মানল না, আবার সিন্দুক পুঁটলি সব খুলে দেখতে লাগল। চাল ডালের হাঁড়িও বাদ গেল না, জলের কলসীতেও হাত ডুবিয়ে দেখল। শেষে হতাশ হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। সে সদনকে স্নান ঘরের দিকে যেতে দেখেছিল, তবে কি সে-ই মজা করবার জন্য লুকিয়ে রেখেছে? কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হল না। ভাবল, শর্মাজী বেড়িয়ে ফিরে যখন খেতে আসবে তখন তাকে বলব। শর্মাজী ঘরে ফেরার সঙ্গেই সুভদ্রা তাকে ব্যাপারটা জানাল।

শর্মাজী বললেন—ভালো করে খোঁজ; ঘরেই আছে, যাবে আর কোথায়?

সুভদ্রা—সারা বাড়ী তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি।

শর্মাজী—চাকরকে জিজ্ঞাসা করেছ?

সুভদ্রা—হ্যাঁ, দুজনেই দিব্যি গেলে বলছে জানে না। আমার বেশ মনে পড়ছে যে আমি সেটা স্নানঘরের তাকে রেখেছিলাম।

শর্মাজী—তবে কি তার পাখা গজাল যে উড়ে গেল?

সুভদ্রা—চাকরদের উপর আমার সন্দেহ হচ্ছে না।

শর্মা—তবে আর কে নেবে?

সুভদ্রা—বলো তো সদনকে জিজ্ঞাসা করি। আমি তাকে ঐ ঘরে যেতে দেখেছিলাম, হয়তো ঠাট্টা করে লুকিয়ে রেখেছে।

শর্মা—বলিহারী তোমার বুদ্ধি! সে লুকোলে কি আর বলত না?

সুভদ্রা—জিজ্ঞাসা করলে ক্ষতি কি? হয়তো ভাবছে খুব হয়রান করে তবে বলব।

শর্মা—ক্ষতি আছে বৈ কি। সে যদি না করে থাকে তবে ভাববে আমার ঘাড়ে চুরির দোষ চাপানো হচ্ছে।

সুভদ্রা—আমি নিজের চোখে দেখেছি সে ঐ ঘরে গিয়েছিল।

শর্মা—সে কি তোমার কঙ্কণ নিতে ওখানে গিয়েছিল? অনর্থক বাজে কথা বলছ। ভুলেও ওকে জিজ্ঞেস কোরো না। এক সে হয়তো নেয়ই নি, আর যদি নিয়ে থাকে তবে আজ না হয় কাল ফিরিয়ে দেবে; ব্যস্ত হবার কি আছে?

সুভদ্রা—তোমার মত বুদ্ধি কোথায় পাব? জিজ্ঞেস করে নিশ্চিন্ত হওয়া তো যায়।

শর্মা—যাই হোক, তুমি ওকে কক্ষনো জিজ্ঞেস কোরো না।

সুভদ্রা তখন চুপ করে গেল, কিন্তু রাতে যখন কাকা-ভাইপো খেতে বসল, তখন সে থাকতে পারল না। সদনকে বলল—লালা, আমার কংকণটা পাচ্ছি না। লুকিয়ে রেখে থাকো তো দিয়ে দাও।

সদনের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, বুক কাঁপতে লাগল। চুরি করে জোর গলায় অস্বীকার করবার ঢঙ সে এখনো শেখেনি। মুখ ভর্তি খাবার, চিবোতে ভুলে গেল। এমন ভাবে চুপ করে রইল যেন কথাটা কানেই যায় নি। শর্মাজী সুভদ্রার দিকে এমন জ্বলন্ত চোখে তাকালেন যে তার রক্ত শুকিয়ে গেল। আর কিছু বলার সাহস হল না। এদিকে সদন তাড়াতাড়ি দুচার গ্রাস খেয়ে উঠে রান্নাঘর ছেড়ে চলে গেল।

শর্মাজী বললেন—তোমার এ কেমন স্বভাব যে, যে কাজ মানা করব, তাই আগ বাড়িয়ে করবে?

সুভদ্রা—তুমি ওর চেহারা দেখলে না? নিশ্চয় ওই নিয়েছে, এ আমি হলফ করে বলতে পারি। না নিয়ে থাকলে চুরির পাপ আমার লাগবে।

শর্মা—এ সামুদ্রিক বিদ্যা কবে থেকে আয়ত্ত হল?

সুভদ্রা—ওর চেহারা দেখেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

শর্মা—আচ্ছা মানছি, ওই নিয়েছে, তাতে কি? কঙ্কণ তো সামান্য জিনিস, আমার শরীরটাই তো ওদের দান। আমার প্রাণ চাইলে তাও দিতে হবে। আমার সব কিছুই ওর। তা সে চেয়েই নিক বা না বলেই নিক।

সুভদ্রা রাগ করে বলল—তুমি গোলামির জুতো বেঁধেছ তো গোলামি করো, আমার জিনিষ চুরি করলে আমি চুপ করে থাকব না।

পরদিন সন্ধ্যায় শর্মাজী বেড়িয়ে ফিরলে সুভদ্রা তাকে খাবার জন্য ডাকতে গেল। তিনি তার সামনে কঙ্কণ ফেলে দিলেন। সুভদ্রা ছুটে গিয়ে সেটা কুড়িয়ে নিল। চিনতে পেরে বলল—আমি তো বলেই ছিলাম ওই লুকিয়ে রেখেছে, অই সত্যি হল তো?

শর্মা—আবার ঐ সব বলছ যার মাথা-মুণ্ডু নেই। এটা আমি এক বন্ধকী কারবারীর দোকানে পেয়েছি। তুমি সদনকে সন্দেহ করে মিথ্যে তাকে কষ্ট দিলে আর নিজেকেও কলঙ্কিত করলে।

২১

বিঠলদাসের সন্দেহ হল যে সুমন ৩০ টাকা মাসোহারায় রাজী নয়, তাই সে কাল উত্তর দেবে বলে আমায় এড়িয়েছে ; তিনি পরের দিন তার কাছে আর গেলেন না ; ভাবতে লাগলেন বাকী টাকা কি করে পাওয়া যাবে ? কখনো ভাবেন অন্য শহরে গিয়ে এ জন্য আবেদন করি, কখনো ভাবেন নাটক মঞ্চস্থ করি। যদি তাঁর ক্ষমতা থাকত তবে তিনি শহরের সব ধনীদের জাহাজে পুরে কালাপানিতে পাঠিয়ে দিতেন। শহরে এক সজ্জন উদার পুরুষ আছেন, নাম কুমার অনিরুদ্ধ সিং। বিঠলদাস তাঁর দরজা থেকে এইজন্য ফিরে এলেন যে ভিতরে তবলার বোল শোনা যাচ্ছিল। তাঁর মনে হল যে যারা গান বাজনায় মত্ত তারা কি তাঁর কাজে সাহায্য করবে ? তাঁর বিচারে তাঁর কাজে সাহায্য করাই পুণ্য আর অবহেলা করা পাপ। সুমনের কাছে যাব, কি যাব না, এই সব ভাবছিলেন এমন সময় দেখলেন পদ্ম সিংহ আসছেন। চোখ দুটো লাল, মুখ শুকনো, যেন সারা রাত ঘুম হয়নি। চিন্তা আর গ্লানির জীবন্ত প্রতিমূর্তি। তিন মাস বিঠলদাস তাঁর কাছে যান নি, মন কষাকষি ছিল। কিন্তু এখন শর্মাজীর এই দশা দেখে গলে গেলেন, হাত ধরে বললেন—ভাই, একি চেহারা হয়েছে আপনার ! সব কুশল তো ?

শর্মাজী—হ্যাঁ সব ভালোই। কয়েকমাস আপনার সঙ্গে দেখা নেই, তাই দেখা করতে চাইছিলাম। সুমনের বিষয়ে কি স্থির হল ?

বিঠল—ঐ চিন্তাই তো করছি। এত বড় শহর অথচ মাসে ৩০ টাকা জোগাড় হচ্ছে না। মনে হয় আমিই চাইতে জানি না, অপরের মন গলাবার ক্ষমতা আমার নেই। আমি অন্যের দোষ দিচ্ছি, দোষটা কিন্তু আমারই। এতদিনে শুধু ১০ টাকার জোগাড় হয়েছে। সম্ভ্রান্ত ধনী লোকদের হৃদয় একেবারে পাথর। ধনীদের কথা বাদ দিচ্ছি, মিঃ প্রভাকর রাও সোজা কথায় অস্বীকার করলেন। তাঁর লেখা পড়লে মনে হবে যে তিনি দেশপ্রেম আর দয়ার সাগর। হোলির জলসার পর মাসের পর মাস আপনার গায়ে কাদা ছেটালেন, কিন্তু কাল তাঁর কাছে গেলে বললেন, জাতির জন্য সব দায় কি আমার ? আমার কাছে কলম আছে, আমি তাই দিয়ে জাতির সেবা করি। যার টাকা আছে সে টাকা দিয়ে করুক। তাঁর কথায় অবাক হলাম। নতুন বাড়ি তৈরী করাচ্ছেন, কয়লা কোম্পানীর শেয়ার কিনছেন, কিন্তু এই জাতির কাজে হাত গোটালেন। অন্য লোকে দিতে না পারলে একটু সংকোচ দেখায়, আর ইনি উলটে আমাকেই কথা শোনালেন।

শর্মাজী—আপনার কি স্থির বিশ্বাস যে মাসে ৫০ টাকা পেলেই সুমনবাঈ

বিধবাশ্রমে চলে যাবে ?

বিঠল—হ্যাঁ, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তবে অন্য কথা হচ্ছে যে আশ্রম কমিটি যদি তাকে না রাখতে চায়। তখন অন্য ব্যবস্থা করব।

শর্মা—আচ্ছা, আপনার সব চিন্তা দূর করে দিচ্ছি। আমি প্রতি মাসে ৫০ টাকা দিতে রাজী আর ঈশ্বর সহায় হলে আজীবন দিয়ে যাবো।

বিঠলভাই বিস্মিত হয়ে শর্মাজীকে দেখলেন। তারপর তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বললেন—ভাই, তুমিই ধন্য। এ সময়ে তুমি এমন কাজ করলে যে তোমার পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করছে, তুমি হিন্দুজাতির মান রাখলে আর লাখপতিদের মুখে চুনকালি মাখালে। কিন্তু এত বড় বোঝা কি করে সামলাবে ?

শর্মা—হয়ে যাবে ; ঈশ্বর নিশ্চয় কোন না কোন উপায় করে দেবেন।

বিঠল—আজকাল কি আমদানী ভালই হচ্ছে ?

শর্মা—সেদিকে পাথর চাপা কপাল। ঘোড়াগাড়ী বেচে দেব, তাতে ৩০ টাকা বাঁচবে। বিজলীর খরচ বন্ধ করলে ১০ টাকা এমনিই আসবে। আর ১০ টাকা এদিক ওদিক থেকে টানাটানি করে এসে যাবে।

বিঠল—একলা তোমার ঘাড়ে এত বড় বোঝা চাপাতে আমার কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু কি করি, শহরের বড়লোকদের কাছে ঘুরে হার মেনেছি। গাড়ী বেচে দিলে কাছারী যাবে কি করে ? রোজ গাড়ী ভাড়া করে যাবে ?

শর্মা—না, গাড়ী ভাড়া করতে হবে না। আমার ভাইপো বাদামী রং-এর একটা ঘোড়া কিনেছে ; তাতে চড়েই যাওয়া যাবে।

বিঠল—আরে, ঐ তো না যাকে মধ্যে মধ্যে বিকেলে চকে ঘুরে বেড়াতে দেখি ?

শর্মা—সম্ভবতঃ সেই হবে।

বিঠল—চেহারায় আপনার সঙ্গে মিল আছে। ডোরাকাটা সার্জের কোট গায়ে, বেশ মোটাসোটা, ফর্সা রং, বড়-বড় চোখ, ব্যায়ামপুষ্ট যুবক।

শর্মা—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার বর্ণনা ঠিক। ওই বটে।

বিঠল—আপনি ওর বাজারে ঘোরা বন্ধ করেন না কেন ?

শর্মা—কোথায় বেড়ায় তাতো জানি না। হয়তো কখনো বাজারেও চলে যায়। কিন্তু ছেলেটি খুব সচ্চরিত্র, তাই ওর জন্য আমার চিন্তা হয় না।

বিঠল—এ আপনার মস্ত বড় ভুল। আগে ও যতই সচ্চরিত্র হোক, কিন্তু এখন ওর চালচলন ভাল নয়। একবার নয়, অনেকবার তাকে আমি এমন জায়গায় দেখেছি যেখানে তার দেখা পাওয়া উচিত নয়। সুমনবাঈ-এর প্রেম-জালে পড়েছে মনে হয়।

শর্মাজীর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। বললেন—আপনি তো সাংঘাতিক

খবর দিলেন, ও হচেছ আমাদের কুলপ্রদীপ। যদি ও কুপথে যায় তবে তো আমার সর্বনাশ হবে। লজ্জায় দাদার কাছে আর মুখ দেখাতে পারব না।

বলতে বলতে শর্মাজীর চোখ সজল হয়ে উঠল। বললেন—মশাই, ওকে কোন রকমে বোঝান, দাদার কানে এ ব্যাপারের একটুও গেলে তিনি আমার মুখ দেখবেন না।

বিঠল—না, না, ওকে ভাল পথে আনবার চেষ্টা করতে হবে। আমি তো আজ পর্যন্ত জানতাম না যে ও আপনার ভাইপো। আমি আজ থেকেই লাগছি, আর সুমন কাল ওখান থেকে সরে গেলে ও আপনিই শুধরে যাবে।

শর্মা—সুমন চলে গেলেই কি আর বাজার খালি হয়ে যাবে। আর কারো ফাঁদে পড়বে। কি করি? ওকে গাঁয়ের বাড়ীতে পাঠিয়ে দি?

বিঠল—সে কি আর সেখানে থাকবে? প্রথমে তো যেতেই চাইবে না, আর গেলেও পরের দিনই পালিয়ে আসবে। যৌবনে দুর্বাসনা বড়ই প্রবল হয়। এ সবই তার তার ফল। মনোবিকার তৈরী করবার দৃশ্য লুপ্ত না রেখে আমরা সার্বজনিক প্রকাশ্য স্থানে তার দোকান সাজিয়েছি আর সরল প্রকৃতির যুবকদের কুপ্রবৃত্তি জাগিয়ে তুলছি। এ যে কত বড় অত্যাচার তা কে বলবে। বুঝি না এমন প্রথা কি করে চালু হল? আমার তো মনে হয় বাদশাহী আমলে এর সূচনা হয়। যেখানে লাইব্রেরী, ধর্মসভার স্থান হওয়া উচিত সেখানে এদের বাজার বসানো হয়েছে। এটা মানুষের দুর্বাসনাকে নিমন্ত্রণ করে ডেকে আনা ছাড়া আর কি হতে পারে? জেনে শুনেই আমরা ছেলেদের গর্তে ফেলে দিচ্ছি। কি লজ্জার কথা!

শর্মা—আপনি তো এ বিষয়ে একটা আন্দোলন করেছিলেন?

বিঠল—হ্যাঁ, করেছিলাম তো। কিন্তু আপনি যেমন মৌখিক সহানুভূতি দেখিয়ে থেমে গেলেন, অন্যেরাও তেমনি দু'চার কথা বলে চেপে গেলেন, তা ভাই এ সব কাজ কি একলা হতে পারে? আমার না আছে ধন, না আছে ঐশ্বর্য, না আছে কোন বড় উপাধি, আমার কথা শুনবে কে? লোকে ভাবে আমি বাজে বকবক করি। শহর এত সুযোগ্য বিদ্বান সুখে দিন কাটাচ্ছে, কেউ ভুলেও আমার কথায় কান দেয় না।

শর্মাজী ঢিলেঢালা স্বভাবের লোক। তাঁকে কর্তব্যের পথে আনতে হলে প্রবল উত্তেজনার দরকার। বন্ধুদের বাহবা সাধারণ লোকের ঘুম ভাঙিয়ে দেয় কিন্তু তাতে শর্মাজীকে জাগানো যেত না। তিনি কুম্ভীর করে জেগে ঘুমোতেন, তাই তাঁকে জাগাতে হলে শুধু বাহবা দিয়ে ডাকলে হবে না, কিন্তু কৌশলটা চাই। ঘুমন্ত লোককে জাগানোর চেয়ে জাগ্রত লোককে জাগানো কঠিন। ঘুমন্ত লোক নিজের নাম শুনলেই ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে, কিন্তু জাগ্রত লোক ভেবে দেখে কে ডাকছে, কেন ডাকছে, একে দিয়ে আমার কিছু

কাজ হবে কিনা ? এ সব প্রশ্নের মনোমত উত্তর পেলে তবেই ওঠে, না হলে সাড়া দেয় না। পদ্ম সিংহ এই জেগে-ঘুমোনো লোকদের দলে। আগে কতবার জাতীয় আহ্বান তাঁর কানে এসেছে কিন্তু তিনি জাগেননি, এবারের ডাক তাঁকে জোর করে জাগিয়ে দিয়েছে। নিজের ভাইপোকে তিনি নিজের ছেলের চেয়েও ভালবাসতেন, তাকে কুপথে যাওয়া থেকে বাঁচাতে, দাদার অপ্রসন্নতা দূর করতে তিনি সব কিছু করতে রাজী। যে কুব্যবস্থার এই ভয়ঙ্কর পরিণাম তার মূলোচ্ছেদ করতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হবার জন্য অন্য কারণের দরকার ছিল না। বাল বিধবা-বিবাহের ঘোর শত্রুকেও কখনো কখনো এর সমর্থন করতে দেখা যায়। প্রত্যক্ষ উদাহরণের চেয়ে বড় প্রমাণ আর কিছু হয় না। শর্মাজী বললেন—আপনার কাজে আমার দরকার হলে বলবেন, আমি সব রকমে সাহায্য করতে রাজী।

বিঠলদাস উল্লাসে বলে উঠলেন—ভাই, তুমি যদি আমার কাজে যোগ দাও, তবে আমি আকাশ পাতাল এক করতে পারি ; কিন্তু ভাই, কিছু মনে করো না, তোমার সংকল্প দৃঢ় হয় না। এখন বলছ বটে, কিন্তু কালই হয়তো নিস্পৃহ হয়ে পড়বে। এ সব কাজে ধৈর্য বড় বেশী দরকার।

শর্মাজী লজ্জিত হয়ে বললেন—ঈশ্বরের ইচ্ছায় এবার আপনার সে কথা বলার সুযোগ হবে না।

বিঠল--তবে তো আমার সাফল্য একেবারে নিশ্চিত।

শর্মাজী—সেটা ভগবানের ইচ্ছা, আমি না বলতে পারি, না লিখতে পারি, আপনি যে পথে যেতে বলবেন, চোখ বুঁজে সেই পথেই যাবো।

বিঠল—ভাই, সব হবে, শুধু উৎসাহ চাই। দৃঢ় সংকল্প থাকলে হাওয়াতে প্রাসাদ গড়া যায়। আপনার বক্তৃতার এমন প্রভাব হবে দেখবেন যে লোকে মেতে উঠবে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু মনে রাখবেন যে ধৈর্য হারানো চলবে না।

শর্মা—আপনি আমাকে সামলে নেবেন।

বিঠল—আচ্ছা, আমার কাজ কি তা শুনুন। প্রথম কাজ হচ্ছে বেশ্যাদের সার্বজনিক স্থান থেকে সরানো আর দ্বিতীয় হচ্ছে বেশ্যাদের নাচগানের প্রথা লোপ। আপনি আমার সঙ্গে একমত কি না ?

শর্মা—এখনও কি এতে কোন সন্দেহ আছে ?

বিঠল—নাচগানের বিষয়েও আপনি সায় দিচ্ছেন তো ?

শর্মা—একটা ঘর জ্বালাবার পর কি আর ঐ পথে যাই, কেন যে তখন এ দুর্মতি হল জানি না। এখন আমার স্থির বিশ্বাস যে আমার সেদিনের জলসাই সুমনকে ঘরছাড়া করেছিল। কিন্তু এ বিষয়ে আমার কিছু সন্দেহ আছে। আমরাও তো এই শহরে এতদিন কাটিয়েছি, আমরা কেন কুপথে গেলাম না ? নাচগান তো বরাবর হয় কিন্তু তার ভীষণ পরিণাম কমই চোখে পড়ে। এ

থেকে মনে হয় যে মানুষের স্বভাবই হচ্ছে প্রধান। আপনি আন্দোলন করে তো স্বভাব বদলাতে পারবেন না।

বিঠল—আমার উদ্দেশ্য তা নয়, আমি শুধু এইটুকুই চাই যাতে দুর্বল স্বভাবের লোক ফাঁদে না পড়ে। কেউ জন্ম থেকেই মোটা হয়, তার বিশেষ কোন জিনিষ খাবার দরকার হয় না ; আবার কিছু লোক আছে যারা দুধ-ঘি ইত্যাদি খেয়ে মোটা হয়, আর এমন কিছু লোক আছে যারা চিরকাল রোগা, তাদের ঘি-দুধের হাঁড়িতে পুরে রাখলেও মোটা হবে না। আমাদের কাজ হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের জন্য। আমার আপনার মত লোক কি কুপথে যাবে ? রুজি-রোজগারের জন্য আমাদের একতিল ফুরসৎ নেই ; বিশ্বাসই হয় না যে এই প্রেমের মণ্ডীতে আমাদের অভ্যর্থনা হবে। ওপথে কদর হবে তাদের—যারা ধনী, রূপবান, মুক্তহস্ত আর রসিক। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তিনি নারীকে যদি সুন্দর করে গড়েন তবে তাকে যেন নির্ধন না করেন। গরীব, সুন্দর, বুদ্ধিমতী মেয়েদের উপর দুর্বাসনের মন্ত্র শীঘ্র ভালভাবে কাজ করে।

২২

পার্ক থেকে ফিরে সুমনের মনে হল আমি শর্মাজীকে এমন কটুকথা বললাম কেন ? তিনি উদার ভাবে আমাকে সাহায্য করছেন, তাঁর সঙ্গে আমি এমন ব্যবহার করলাম ? আমার নিজের দোষটা তাঁর ঘাড়ে চাপালাম। সংসারে তো কত নাচগান হয়, ছোট-বড়, দীন দুঃখী সবাই দেখে কত আনন্দ পায়। যদি আমি নিজে কুপ্রবৃত্তির জন্য গর্তে ঝাঁপ দিই তবে শর্মাজী বা অন্যের কি দোষ ? বাবু বিঠলদাস শহরের লোকেদের কাছে ছোটাছুটি করেছেন ; যে শেঠেরা আমার কাছে আসেন, তাদের কাছেও কি যান নি ? কিন্তু কেউ তাঁকে সাহায্য করল না কেন ? আমি এখান থেকে চলে যাই এটা বোধ হয় তাঁরা চান না। আমি চলে গেলে তাঁদের কামতৃষ্ণায় ভাটা পড়বে। তাঁরা নিষ্ঠুর বাঘের মত আমার মনে ঘা মেরে মেরে আমার কষ্ট দেখে দেখে আনন্দ পেতে চান। শুধু একজনই আমাকে এই অন্ধকূপ থেকে উদ্ধারের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, আর আমি কিনা তাকেই এত অপমান করলাম।

আমাকে কত কৃতঘ্ন ভাবলেন। আমাকে দেখে কেমন ছুটে পালালেন ! কোথায় আমি লজ্জায় মাটিতে মিশে যাব, তা না করে উলটে নির্লজ্জের মত তাঁকে গালমন্দ করলাম ! যারা কলুষিতভাবে আমার জীবন নষ্ট করছে, তাদেরই আমি অভ্যর্থনা করি ! পাখীকে জালে পড়তে না দেখলে পাখীর উপরই রাগ করে। কোন ছেলে যখন কোন অশুদ্ধ জিনিষ ছুঁয়ে ফেলে বা মাড়িয়ে ফেলে, তখন সে ছুটে ছুটে অন্য ছেলেদের ছুঁতে চায় যাতে তারাও

অপবিত্র হয়ে পড়ে। আমিও কি ঐ হৃদয়হীন ব্যাধ অথবা অবোধ বালক হয়ে গেছি ?

যে কোন লেখককে জিজ্ঞাসা কর যে নিরপেক্ষ সমালোচকের কটূক্তির তুলনায় নির্বিচার প্রশংসার মূল্য তার কাছে কতটুকু। সুমনের কাছে শর্মাজীর এই ঘৃণা অন্যান্য প্রেমিকদের রসিকতার চেয়ে বেশী প্রিয় মনে হচ্ছিল।

সারা রাত তার এই সব চিন্তায় কাটল। স্থির করল যে সকালেই বিঠলদাসের কাছে গিয়ে আশ্রয় চাইব। বলবো, 'আমি আর কোন সাহায্য চাই না শুধু একটু সুরক্ষিত স্থান চাই। আটা পিসে, কি কাপড় সেলাই করে নিজের পেট চালিয়ে নেব।

সকাল হল। সুমন বিঠলদাসের বাড়ী যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে, এমন সময় তিনি এসে হাজির হলেন। সুমনের এত আনন্দ হল যেন ভক্ত তার আরাধ্যদেবতার দর্শন পেয়েছে। বলল—আসুন, আমি কাল সারাদিন আপনার প্রত্যাশায় ছিলাম। এখন তো আপনার কাছে যাবার চিন্তা করছিলাম।

বিঠলদাস—নানা কারণে কাল আসতে পারি নি।

সুমন—তা আপনি আমার থাকবার কোনও উপায় করেছেন ?

বিঠল—আমি তো কিছু করতে পারি নি, তবে পদ্মসিংহ মান রেখেছেন। তিনি তোমার শর্ত পুরো করে দিয়েছেন, তিনি একটু আগে আমার কাছে এসে কথা দিয়েছেন যে তিনি তোমায় মাসে ৫০ টাকা আজীবন দেবেন।

বিস্ময়ে সুমনের চোখে জল এল। শর্মাজীর উদারতায় তার মনে ভক্তি, শ্রদ্ধা আর নির্মল প্রেম জাগল। নিজের কটু কথার জন্য বড় ক্ষোভ হল। বলল—শর্মাজী দয়া ধর্মের সাগর, এ জীবনে তার ঋণ শোধ হবার নয়। ঈশ্বর তাকে চিরসুখী করুন। কিন্তু তখন আমি যা বলেছিলাম তা শুধু পরীক্ষা করবার জন্য। আমি জানতে চাইছিলাম যে সত্যিই আমার উদ্ধার চান, না শুধু মৌখিক শিষ্টাচার দেখাচ্ছেন। এখন বুঝেছি আপনারা দুজনে সজ্জন, দেবতার মতো। আপনাদের বৃথা কষ্ট দিতে চাই না। আমি শুধু সহানুভূতি চাই আর তা পেয়েছি। আমার ভার আর আপনাদের উপর চাপাব না। শুধু আমার এমন থাকার জায়গা করে দিন যেখানে নির্বিঘ্নে থাকতে পারি।

বিঠলদাস অবাক হয়ে গেলেন। আনন্দে তাঁর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তাঁর মনে হল যে আমাদের দেশে পতিতাদেরও এমন উঁচু আদর্শ আছে। বললেন—সুমন, তোমার কথা শুনে আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে তা বলতে পারি না। কিন্তু টাকা না হলে তোমার চলবে কি করে ?

সুমন—আমি খেটে খাবো। দেশে কত দুঃখী রয়েছে, ঈশ্বর ছাড়া কে তাদের সাহায্য করে ? নিজের পেট চালানোর জন্যে আপনাদের কাছ থেকে

টাকা নেব না।

বিঠল—সে কষ্ট তুমি সইতে পারবে?

সুমন—আগে হয়তো পারতাম না, কিন্তু এখন সব সইতে পারবো। এখানে এসে বুঝেছি পতিতাবৃত্তি সবচেয়ে দুঃসহ। অন্য কষ্টে শুধু শরীরই দুঃখ পায়, কিন্তু এ কষ্ট যে আত্মাকে নষ্ট করে দেয়। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তিনি আমাকে রক্ষা করতে আপনাদের পাঠিয়েছেন।

বিঠল—সুমন, তুমি সত্যই বিদুষী।

সুমন—তা আমি এখান থেকে কবে যাব?

বিঠল—আজই। আমি এখনও কমিটিতে তোমার থাকার প্রস্তাব তুলি নি, কিন্তু সে জন্য কোন বাধা হবে না; তুমি সেখানেই থাকো। যদি কমিটি কোন আপত্তি করে তো দেখা যাবে। হ্যাঁ, একটা কথা মনে রেখো, নিজের বিষয়ে কাউকে কিছু বলো না। তাহলে বিধবাদের মধ্যে হুলস্থূল পড়ে যাবে।

সুমন—আপনি যা বলেন আমি তাতেই রাজী।

বিঠল—সন্ধ্যার সময় যেতে হবে।

বিঠলদাস চলে গেলে দুজন বেশ্যা সুমনের সঙ্গে দেখা করতে এল। মাথা ধরার দোহাই দিয়ে সুমন তাদের বিদায় করল। সুমন নিজের হাতে রান্না করত। পতিতা হলেও তার খাওয়া দাওয়ার বাছ-বিচার ছিল। আজ উপবাস করবে স্থির করল। কয়েদিদেরও মুক্তি পাবার দিন খাবার রোচে না।

দুপুরে এক দল ফুর্তি করতে এল। তাদেরও সুমন তাড়াল কোন ছুতোয়; তাদের মুখ দেখতে এখন তার ঘৃণা হচ্ছিল। শেট বলভদ্রদাসের কুঠী থেকে এক বুড়ি নাগপুরী কমলালেবু এল; সুমন সঙ্গে সঙ্গে সেটা ফেরৎ দিল। চারটের সময় চিমনলাল ফিটন গাড়ী পাঠালেন সুমন বেড়াতে যাবে বলে। সেটাও সে ফিরিয়ে দিল।

অন্ধকারের পর যখন প্রথম সূর্য ওঠে তখন যেমন পাখীরা কলরব শুরু করে আর বাছুরেরা ছুটোছুটিতে মেতে ওঠে, সুমনের মনেও তেমনি একটু খেলা করবার প্রবল ইচ্ছা হল। সে এক প্যাকেট সিগারেট আনাল আর এক বোতল বার্নিশ আনিয়ে তাকে রেখে দিল। তারপর চেয়ারের একটা পায়া ভেঙে চেয়ারটাকে দেওয়ালে ঠেকিয়ে রাখল। পাঁচটা বাজতে বাজতে মুন্সী অবুল বফার আগমন হল। এই ভদ্রলোক খুব সিগারেট খেতেন। সুমন তাঁকে আজ বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করল, আর কিছু কথাবার্তার পর বলল—আজ আপনাকে এমন সিগারেট খাওয়াবো যা চিরকাল মনে থাকবে।

অবুল বফা—তবে তো আমার কপাল ফিরেছে দেখছি।

সুমন—আপনার জন্য এক সাহেবের দোকান থেকে আনিয়েছি। এই নিন।

অবুল বফা—তা হলে আজ আমি ভাগ্যবানদের দলে পড়লাম। কি সৌভাগ্য!

অবুল বফা মুখে সিগারেট গুঁজলেন। সুমন একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাল। অবুল বফা সিগারেট ধরাবার জন্য মুখ বাড়ালেন। কিন্তু না জানি কি করে আগুনটা সিগারেটে না লেগে তাঁর দাড়িতে লেগে গেল। খড়ের আগুনের মতন দেখতে দেখতে আধখানা দাড়ি পুড়ে ছাই। সিগারেট ফেলে দু হাতে দাড়ি রগড়াতে শুরু করলেন। আগুন নিভল, কিন্তু ততক্ষণে দাড়ির সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। ছুটে গিয়ে আয়নায় মুখ দেখলেন। দাড়ি এখন সিদ্ধ সুথনী শাকের ছিবড়ের মত দেখাচ্ছে। সুমন লজ্জিত হয়ে বলল—আগুন লাগুক আমার হাতে! কেন মরতে দেশলাই জ্বালাতে গেলাম?

আটকাবার অনেক চেষ্টা করলেও ঠোঁটের কোণে হাসি দেখা দিল। অবুল বফার তখন অনাথ সর্বহারার অবস্থা। সুমনের হাসি দেখে গা জ্বলে গেল। তাঁর চেহারায় তখন রাগ আর দুঃখের অপূর্ব সংমিশ্রণ। বললেন—কবেকার শোধ নিলে?

সুমন—মুন্সীজী, সত্যি বলছি, যদি আমি ইচ্ছে করে আগুন লাগিয়ে থাকি তবে আমি যেন অন্ধ হয়ে যাই। আপনার সংগে যদি শত্রুতাও থাকতো তো দাড়ি বেচারা কি আমার কোন ক্ষতি করেছে?

অবুল—প্রেমিকার নষ্টামি দুষ্টুমি ভাল লাগে বটে তবে মুখ পুড়িয়ে দেওয়া সহ্য হয় না। এর চেয়ে ভাল হতো যদি তুমি আমার গায়ে কোথাও ছ্যাঁকা দিতে। এ পোড়া মুখ কি করে লোক সমাজে দেখাব? হায় আল্লা? আজ তুমি আমার সর্বনাশ করলে।

সুমন—কি করি, নিজেই আপসোস করছি। আমার দাড়ি থাকলে আপনাকে দিয়ে দিতাম; আচ্ছা, নকল দাড়িও তো পাওয়া যায়?

অবুল—সুমন, কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিয়ো না। আর কেউ এমন করলে তাকে খুন করতাম।

সুমন—বা-বা? কটা চুলই না পুড়ে গেছে নাকি আর কিছু হয়েছে। দু এক মাসের মধ্যে আবার গজাবে। এইটুকুর জন্য আপনি এত হায়-হায় করছেন।

অবুল—দ্যাখো সুমন, জ্বালিয়ো না, এর পর আমি আর রাগ সামলাতে পারব না।

সুমন—নারায়ণ, নারায়ণ, একটু দাড়ি গেছে আর তাতেই স্বরূপ বেরিয়ে পড়ল। ধরুন, আমি ইচ্ছে করেই দাড়ি জ্বালিয়েছি। কিন্তু আপনি যে নিত্যই আমার আত্মা, আমার ধর্ম, আমার হৃদয় জ্বালাচ্ছেন তার দাম কি আপনার দাড়ির চেয়ে কম? মিঞা সাহেব, প্রেমিক হওয়া মুখের কথা নয়। যান, এবার নিজের পথ দেখুন, এখানে আর আসবেন না। এমন ছ্যাঁচড়া লোককে আমার দরকার নেই।

অবুল বফা ভীষণ রেগে সুমনের দিকে তাকালেন, তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে দাড়ি ঢেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর মতো লোকদের সকলের সামনে বেশ্যার সংগে আমোদ প্রমোদে লজ্জা হয় না।

সদনের আসবার সময় হয়ে এল। আজ তার সংগে দেখা করবার জন্য সুমন উদ্‌গ্রীব। আজই তাদের দেখাশোনার শেষ। এ প্রেমের আজই সমাপ্তি। আর সে মোহিনী মূর্তি দেখতে পাবে না। জীবন আবার নীরস প্রেমহীন হয়ে যাবে। কলুষিত হলেও প্রেমটা ছিল খাঁটি। ভগবান যেন আমায় এ বিচ্ছেদ সইবার শক্তি দেন। না, সদন না এলেই ভালো হয়। দেখা না হলেই কল্যাণ। কে জানে, ওর সামনে হয়তো সংকল্পে স্থির থাকতে পারবো না। কিন্তু সে এলে তার সংগে প্রাণ খুলে কথা বলে নেব, তাকে এই নরককুণ্ডে ডোবা থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করব।

এমন সময় সুমন দেখল বিঠলদাস এক ভাড়াটে গাড়ী থেকে নামছেন। তার বুক ধড়ফড় করতে লাগল।

বিঠলদাস উপরে এসে বললেন—আরে, তুমি এখনও তৈরী হও নি।

সুমন—আমি তো তৈরী হয়েই বসে আছি।

বিঠল—এখনো বিছানা বাঁধা হয় নি?

সুমন—এখানকার কোন জিনিষ সংগে নিয়ে যাব না। এটা তো আমার পুনর্জন্ম হবে।

বিঠল—তবে এ সব জিনিষপত্র কি হবে?

সুমন—আপনি এ সব বেচে কোন সৎকাজে লাগাবেন।

বিঠল—ভাল কথা, আমি তালা বন্ধ করে দেব। এবার ওঠো, গাড়ী মজুদ।

সুমন—দশটার আগে যেতে পারবো না। আজ সব প্রেমিকদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে। কিছু শোনা বাকী, কিছু বলা বাকী। আপনি ছাদে বসুন, আমি তৈরী জানবেন।

বিঠলদাসের এটা খারাপ লাগল। তবু তিনি ধৈর্য ধরে উপরে খোলা ছাতে বেড়াতে লাগলেন।

সাতটা বেজে গেল তবু সদন এল না। আটটা পর্যন্ত সুমন তার প্রত্যাশায় বসে রইল। এতদিনে আজই সে প্রথম অনুপস্থিত হল, সুমনের মনে হল সে বুঝি কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। তার হৃদয়ে এক তীব্র আকাঙ্খা মধুর বেদনায় উদ্বেল হয়ে উঠছিল। মন বলছিল, সে এল না কেন? কোন অনিষ্ট হয়নি তো?

আটটার সময় চিমনলাল এলেন। সুমন তাঁর গাড়ী দেখেই বারান্দায় এসে বসল। শেঠজী বহুকষ্টে উপরে উঠে হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন—কোথায় গো দেবী, আজ ফিটন ফেরৎ পাঠালে কেন? আমি কি দোষ করেছি?

সুমন—বারান্দায় চলে আসুন, ভিতরে গরম। আজ মাথা ব্যথা করছিল বলে বেড়াতে যেতে ইচ্ছা হয় নি।

চিমনলাল—হিরিয়াকে আমার কাছে পাঠালে না কেন? হকীম সাহেবের কাছ থেকে ওষুধ তৈরী করিয়ে দিতাম, ও'র কাছে অনেক ভালো তেলের ওষুধ আছে।

বলতে বলতে শেঠজী চেয়ারটায় বসলেন, কিন্তু একটা পায়া ভাঙা বলে চেয়ারটা উলটে গেল। আর শেঠজী উলটো মুখো হয়ে কাপড়ের বস্তার মত মাটিতে পড়ে গেলেন। মুখ দিয়ে একবার শুধু 'আরে' বের হল, আর কোন কথা নয়। চেতনা জড়ের কাছে হার মানল।

সুমনের ভয় হল হয়তো বেশী লেগেছে। আলো এনে দেখে হাসি আটকাতে পারল না।

শেঠজীর ভাব দেখে মনে হল যেন পাহাড় থেকে পড়ে গেছেন। পড়ে থেকেই বললেন—বাপ রে, কোমর ভেঙে গেছে। সহিসটাকে ডাকো, আমি বাড়ী যাবো।

সুমন—খুব বেশী লেগেছে? আপনিই তো চেয়ারটা টানলেন, দেয়ালে ঠেকানো অবস্থায় বসলে পড়তেন না। আমারই ভুল হয়েছে যে আগে আপনাকে জানাই নি, মাপ করবেন, কিন্তু আপনি এটুকু সামলাতে পারলেন না? উলটে পড়ে গেলেন?

চিমন—আমার কোমর ভেঙে গেল আর তুমি ঠাট্টা করছ?

সুমন—তা আমার কি দোষ? আপনি হালকা হলে তুলে বসিয়ে দিতাম। নিজেই একটু চেষ্টা করুন না, তাহলেই উঠে যাবেন।

চিমন—এখন আমার বাড়ী ফেরাই মুস্কিল। কি অশুভক্ষণেই বেরিয়েছিলাম এখন সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়েই আমার দম আটকে যাবে। বাঈজী কবেকার শোধ তুললে আজ?

সুমন—শেঠজী, আপনি আমায় আর লজ্জা দেবেন না।

চিমন—থাক্ থাক্ আর মিথ্যে দোহাই দিতে হবে না। তুমি ইচ্ছে করেই আমায় ফেলেছ।

সুমন—আপনার সঙ্গে কি শত্রুতা আছে? আর তাই যদি হয় তো আপনার কোমর তো আমার কোন শত্রুতা করে নি।

চিমন—এখানে যে আসবে তার সর্বনাশ হবে।

সুমন—শেঠজী, এইটুকুতেই আপনি এত রাগ করছেন। ধরুন, সত্যিই যদি আমি ইচ্ছে করেই ফেলে দিয়ে থাকি, তো কি হবে?

এই সময় বিঠলদাস ছাদ থেকে নেমে এলেন। তাঁকে দেখে শেঠজী হতভম্ব হয়ে গেলেন। লজ্জায় মাটিতে মিশে গেলেন।

বিঠলদাস হাসি চেপে বললেন—বলুন শেঠজী, আপনি কি দেখে এখানে ফেঁসে গেলেন ? আপনাকে এখানে দেখে আমার খুব আশ্চর্য লাগছে।

চিমন—এখন আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। যদি এখানে আসি তো আমার যেন সর্বনাশ হয়। আমাকে কোন রকমে নিচে নিয়ে চলুন।

বিঠলদাস এক হাত ধরলেন, সাইস এসে কোমর ধরল, এইভাবে ধরাধরি করে কোনক্রমে তাঁকে নামিয়ে গাড়ীতে শুইয়ে দেওয়া হল।

উপরে এসে বিঠলদাস বললেন—গাড়ী এখনো দাঁড়িয়ে আছে। দশটা বেজে গেছে আর দেরী করো না।

সুমন বলল—আর একটা কাজ বাকী। পণ্ডিত দীননাথ এলেন বলে। তাঁর সঙ্গে ব্যাপারটা চুকিয়ে তার পর যাব। আপনি আর একটু কষ্ট করুন।

বিঠলদাস ছাদে যেতে না যেতেই পণ্ডিত দীননাথ এসে গেলেন, মাথায় বারাণসী পাগড়ী, গায়ে রেশমী আচকান, পরণে কালাপেড়ে মিহি ধুতি, পায়ে কালো বার্নিশের পাম্পশু।

সুমন বলল—আসুন মহারাজ, পায়ের ধুলো দিন।

দীননাথ—মঙ্গল হোক, যৌবন চিরস্থায়ী হোক, বোকা বড়লোকরা ফাঁদে পড়ুক, খুব বাড়-বাড়ন্ত হোক।

সুমন—কাল আপনি এলেন না। অনেক রাত পর্যন্ত আপনার প্রতীক্ষায় ছিলাম।

দীননাথ—আর বোলো না, কাল এক ফ্যাসাদে পড়েছিলাম। ডক্টর শ্যামাচরণ আর প্রভাকর রাও জোর করে স্বরাজ্য পার্টির সভায় নিয়ে গেল। শুধুই বকবক-ঝকঝক হতে লাগল। আমাকে ভাষণ দিতে বলেছিল। অনেক কষ্টে তাদের হাত এড়িয়ে ফিরতে অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল।

সুমন—কদিন হলো আপনাকে দরজায় বার্ণিশ লাগিয়ে দিতে বলেছিলাম। তা আপনি বলেছিলেন বার্নিশ পাওয়া যাচ্ছে না। এই দেখুন আমি এক বোতল বার্ণিশ আনিয়েছি। কালকেই এটা লাগিয়ে দিন।

পণ্ডিত দীননাথ বালিশ ঠেসান দিয়ে আসন পিঁড়ি হয়ে বসেছিলেন। তাঁর মাথার উপরের তাকে বার্ণিশ রাখা ছিল। সুমন হাতে বোতল তুলল, কিন্তু না জানি কি করে বোতলের তলাটা আলাদা হয়ে গেল আর পণ্ডিতজী বার্ণিশে স্নান করছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন রসের নাদা থেকে উঠে এলেন। তিনি চমকে উঠে পড়ে পাগড়ী নামিয়ে রুমাল দিয়ে মুছতে লাগলেন।

সুমন বলল—বোতলটা কি ফাটা ছিল ? সব বার্নিশ নষ্ট হয়ে গেল।

দীননাথ—তোমার বার্ণিশের চিন্তা লেগেছে, এখানে সব কাপড় ভিজে চটচট করছে। ঘরে ফেরাই মুস্কিল দেখছি।

সুমন—রাতে কে আর দেখছে, চুপি সাড়ে চলে যাবেন।

দীনানাথ—থাক, আর বলতে হবে না। সমস্ত কাপড়ের সর্বনাশ করে দিয়ে এখন উপায় দেখানো হচ্ছে। এ সব আর ধোয়াও যাবে না।

সুমন—তা আমি কি জেনে শুনে ফেলে দিয়েছি?

দীনানাথ—তোমার মনের কথা কে আর জানে?

সুমন—আচ্ছা বেশ, আমি ইচ্ছে করেই ফেলেছি।

দীনা—আরে, আমি কি তাই বলছি? ইচ্ছে হয় তো আরো ফেলে দাও না।

সুমন—বড় জোর আপনার জামাকাপড়ের দামই নেবেন।

দীনা—আহা, রাগ করছ কেন? আমি তো বলছি, ফেলেছ, বেশ করেছ।

সুমন—এমন ভাবে বলছেন যেন আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিচ্ছেন।

দীনা—সুমন, আমায় লজ্জা দিচ্ছ কেন?

সুমন—কাপড় একটু খারাপ হয়ে গেছে, তাতেই স্বরূপ বেরিয়ে পড়ল। এই হচ্ছে আপনার ভালবাসা বা শুনতে শুনতে আমার কান পচে গেল। আপনি যে কেমন তা আজ বুঝলাম। ভাল সময়েই আপনি আমায় জানিয়ে দিলেন। এখন দয়া করে বাড়ী চলে যান। আর এখানে আসবেন না, আপনার মত মুখ সর্বস্ব লোক আমি চাইনা। বিঠলদাস ছাদে বসে মজা দেখছিলেন। বুঝলেন যে নাটক শেষ হয়েছে। নিচে নেমে এলেন। দীননাথ তাঁকে দেখে চমকে গেলেন আর ছড়িহাতে দ্রুতপায়ে নিচে নেমে গেলেন।

একটু পরে সুমন নিচে নামল। পরনে শাদা শাড়ী, হাতে একগাছা চুড়িও নেই। মুখমণ্ডলে উদাস ভাব, সেটা ভোগবিলাস ছেড়ে যাচেছ বলে নয়, এই নরককুণ্ডে কেন এসেছিল তাই ভেবে। এ উদাসীনতায় মালিন্য নেই, আছে সংযম। মাতালের ভাবলেশহীন উদাসীনতা নয়, ত্যাগের মহিমা ফুটে উঠেছে।

বিঠলদাস ঘর তালাবন্ধ করলেন আর গাড়ীর কোচবাক্সে বসলেন। গাড়ী রওনা হল।

বাজারের দোকান সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে তবে পথে লোকজন আছে। সুমন জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। লণ্ঠনের আলোর সুন্দর মালা দেখা যাচ্ছে। গাড়ী এগিয়ে চলে তো আলোর মালাও এগিয়ে চলল। লণ্ঠন গুলো দূরে দূরে কিন্তু আলোর আসায় ছেদ নেই।

গাড়ী বেগে যাচ্ছিল। সুমনের ভাবী জীবন তরীও চিন্তার সাগরে হেলে দুলে আবার আলোর জ্বলজ্বল করতে করতে ছুটে চলেছে।

২৩

সকালে অন্দরে ঢুকে সদন কাঞ্চীর হাতে কঙ্কণ দেখে লজ্জায় মাটিতে মিশে গেল। জলখাবার কোন রকমে খেয়ে বাইরে এসে ভাবতে লাগল, কঙ্কণ কাঞ্চীর কাছে কি করে এল।

সুমনের পক্ষে কি ওটা এখানে পাঠানো সম্ভব ? সে কি জানতো কঙ্কণটা কার ? আমি তো আমার পরিচয় দিই নি। হয়তো এটা সেই রকম অন্য কঙ্কণ ; কিন্তু এত শীঘ্র তো তা তৈরী হতে পারে না। সুমন নিশ্চয় আমার সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে কংকণটা কাকীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে।

সদন অনেক ভাবল কিন্তু কোন কুল কিনারা পেল না। আচ্ছা ধরে নিই যে সে আমার পরিচয় জানতে পেরেছে। তবু আমার দেওয়া জিনিষ এখানে পাঠিয়ে দেওয়া কি তার উচিত ছিল, এটাকে তো বিশ্বাসঘাতকতা বলা যায়।

যদি সুমন আমার পরিচয় জেনে থাকে তবে সে তো মনে মনে আমাকে ধূর্ত, পাষণ্ড, জালিয়াৎ ভাবছে। কঙ্কণ কাকীর কাছে পাঠিয়ে আমাকে চোর বলেও জেনেছে।

সে সন্ধ্যায় সুমনের কাছে যাবার সাহস তার হল না। চোর, দাগাবাজ পরিচয়ে কি করে তার কাছে যাওয়া যাবে ? মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল, ঘরে বসে থাকা বড় খারাপ লাগল। মনে কষ্ট হলেও সে সুমনের কাছে যেতে পারল না।

এইভাবে এক সপ্তাহ কেটে গেল। সুমনের কাছে যাবার আকাংখা প্রবল হলেও ভয় তার আকাংখাকে দমিয়ে রাখল। সন্ধ্যার সময় সে যেন পাগল হয়ে যেত, অসুখ হলে মানুষ যেমন উদাস হয়ে পড়ে, কারো সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে না., নড়াচড়া করতে ইচ্ছা করে না, সদনের তখনকার অবস্থা তেমনি ছিল।

শেষে আর ধৈর্য ধরতে পারল না। অষ্টমদিনে সে ঘোড়ার পিঠে চড়ে সুমনের সঙ্গে দেখা করবার জন্য রওনা হল। সে ঠিক করল যে আজই তাকে সমস্ত কথা খুলে বলবে। যাকে ভালবাসি তার সংগে লুকোচুরি ? কেন হাত জোড় করে বলবো—ভালো মন্দ যাই হই না কেন, আমি তোমার অনুগত। যে শাস্তি দিতে চাও না কেন আমি মাথা পেতে নেব। চুরি করেছি বা ঠকিয়েছি সব কিছু কিন্তু তোমার ভালবাসা পাবার জন্যই করেছি। তুমি আমায় ক্ষমা কর।

নীতি, জ্ঞান আর সংকোচ কোন কিছুই বাসনাকে আটকাতে পারে না। এর নেশায় মানুষ বেহুঁস হয়ে পড়ে।

ব্যাকুল হয়ে পাঁচটার সময় বেরিয়ে সদন নদীর ধারে পৌঁছে গেল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার শরীর জুড়িয়ে গেল। স্নিগ্ধ শীতল জলধারা বয়ে চলেছে, তাতে মাঝে মাঝে রুপোলী মাছ জল ছেড়ে ক্ষণিকের জন্য লাফিয়ে উঠছে, ঠিক যেন পাতলা ঘোমটার আড়ালে সুন্দরীর চঞ্চল চোখের চমক।

সদন ঘোড়া থেকে নেমে নদীর পাড়ে বসে একমনে মনোরম দৃশ্য দেখতে লাগল। হঠাৎ এক জটাধারী সাধুকে গাছের আড়াল থেকে তার কাছে আসতে দেখা গেল। তাঁর গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, চোখ লাল। মুখে জ্ঞান ও যোগের

প্রতিভার বদলে সারল্য ও দয়ার আভাস রয়েছে। সদন তাঁকে কাছে আসতে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করল।

সাধু এসে এমনভাবে তার হাত ধরলেন যে তার সঙ্গে পরিচয় আছে। তিনি বললেন—সদন, কয়েকদিন থেকেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলাম। তোমার ভালোর জন্য কথাটা বলছি। তুমি সুমন বাঈ-এর কাছে যাওয়া ছাড়ো, নইলে তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। তুমি জাননা সে কেমন। প্রেমের নেশায় তুমি ওর দোষ দেখতে পাচ্ছো না। তুমি ভাবছ ও তোমায় ভালবাসে, কিন্তু এটা তোমার ভুল। যে নিজের স্বামীকে ছেড়েছে সে কি আর কাউকে ভাল-বাসতে পারে? তুমি তো এখন সেখানেই যাচ্ছ। সাধুর কথা মেনে ঘরে যাও। এতেই তোমার ভাল হবে।

এই বলে মহাত্মা যেদিক দিকে এসেছিলেন সেইদিকে চলে গেলেন আর দেখতে দেখতে দূরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সদন কোন কথা বলার সুযোগ পেল না।

সদন ভাবতে লাগল সাধুটি কে? তিনি আমায় কি করে চিনলেন? খানিকটা স্থান মাহাত্ম্য, খানিকটা মানসিক অবস্থা, কিছুটা মহাত্মার আকস্মিক আবির্ভাব আর তাঁর অন্তর্দৃষ্টি—এ সব মিলে তাঁর কথাগুলো দৈববাণীর মত মনে হল। সদনের মনে এক ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা হল। সুমনের কাছে যাবার সাহস হল না। সে ঘোড়ায় চড়ে এ অদ্ভুত ঘটনার কথা ভাবতে ভাবতে ঘরের দিকে রওনা হল।

নিজের কঙ্কণের জন্য যেদিন সুভদ্রা সদনকে সন্দেহ করল সেদিন থেকেই পদ্মসিংহ তার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। সুভদ্রার তাই সেখানে থাকতে ভাল লাগছিল না। শর্মাজীও চাইছিলেন কোন উপায়ে তাকে দেশের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতে। সদনেরও এখানে থাকতে আর ভাল লাগছিল না। তারও বাড়ী ফেরার ইচ্ছা কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারত না। কিন্তু পরদিনই পণ্ডিত মদন সিংহের এক চিঠি সব ইচ্ছা পূরণ করে দিল। চিঠিতে ছিল, সদনের বিয়ের কথা চলছে, তাকে বৌমার সঙ্গে শীঘ্র পাঠিয়ে দাও।

এ কথা শুনে সুভদ্রা খুব খুশি, ভাবল দু এক মাস খুব আমোদ আহ্লাদ হবে, গান বাজনা হবে, সময়টা ভালই কাটবে। সে উল্লাস চেপে রাখতে পারল না। আর শর্মাজী তার এই নিষ্ঠুরতা দেখে আরো উদাস হয়ে পড়লেন। মনে মনে বললেন, নিজের আনন্দে আমার সম্বন্ধে কোন খেয়ালই নেই, দু এক মাস আর দেখা হবে না, কিন্তু তবু কেমন খুশি হয়েছে।

সদনও যাবার জন্য তৈরী হল। শর্মাজী ভেবেছিলেন যাবার নামে সে হয়তো আপত্তি করবে, কিন্তু সে সব কিছু হল না।

এখন আটটা বাজে। গাড়ী ছাড়ে বেলা দুটোয়, তাই শর্মাজী কাছারি

গেলেন না। প্রেম বিহ্বল হয়ে কয়েকবার অন্দরে গেলেন। কিন্তু সুভদ্রার তখন তাঁর সঙ্গে কথা বলবার অবসর কোথায়? সে তখন নিজের গয়না-কাপড় আর প্রসাধনের জিনিষ নিয়ে ব্যস্ত। কিছু গয়না তেঁতুল জলে রয়েছে, কিছু পরিষ্কার করছে। পানের বাটা মাজা হচ্ছে, পাড়ার কয়েকজন স্ত্রীলোক বসে রয়েছে, আনন্দে আজ সুভদ্রার খাওয়া হয় নি। পুরি তৈরী করে শর্মাজী আর সদনের জন্য বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে।

এমনি করেই একটা বেজে গেল। জিতন গাড়ী ডেকে আনল। সদন নিজের বাক্স বিছানা গাড়ীতে রেখে দিল। তখন শর্মাজীর কথা সুভদ্রার মনে পড়ল। ঝিকে বলল, একটু দ্যাখ তো কোথায় আছেন, ডেকে নিয়ে আয়। ঝি বাইরে দেখল, ঘরে উঁকি মেরে দেখল, নিচে গিয়ে দেখল, শর্মাজীর খোঁজ নেই। সুভদ্রা ব্যাপার বুঝল। বলল, উনি না এলে আমি যাব না, শর্মাজী কোথাও যান নি। উপরে ছাদে বসে ছিলেন, যখন একটা বেজে গেল অথচ সুভদ্রা রওনা হল না তখন তিনি রাগ করে ঘরে এসে সুভদ্রাকে বললেন—তুমি এখনো এখানে? এদিকে একটা বেজে গেছে।

সুভদ্রার চোখে জল এল। যাবার সময় শর্মাজীর এই রূঢ় ব্যবহারে মনে কষ্ট হল। নিষ্ঠুরতার জন্য শর্মাজী লজ্জিত হলেন। তার চোখ মুছিয়ে আদর করে গাড়ীতে তুলে দিলেন।

স্টেশনে যখন এল তখন গাড়ী ছাড়ার মুখে, সদন ছুটে গাড়ীতে উঠে পড়ল। সুভদ্রা বসবার আগেই গাড়ী ছেড়ে দিল। সে জানলা দিয়ে শর্মাজীর দিকে চেয়ে রইল। যতক্ষণ চোখে দেখা গেল ততক্ষণ সে জানলার কাছ থেকে নড়ল না।

সন্ধ্যার সময় গাড়ী তাদের গন্তব্য স্টেশনে এল। মদন সিংহ পালকী ও ঘোড়া নিয়ে স্টেশনে হাজির ছিলেন। সদন ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিল।

যতই গ্রামের কাছে আসতে লাগল, সদনের ব্যগ্রতা ততই বাড়তে লাগল। যখন প্রায় আধ মাইল বাকী আর ধান ক্ষেতের আল দিয়ে ঘোড়া ছোটানো শক্ত মনে হল তখন সে ঘোড়া থেকে নেমে গাঁয়ের দিকে ছুটে চলল। আজ তার কাছে গ্রাম ফাঁকা ঠেকল। সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। চাষীরা ক্ষেত থেকে বলদ নিয়ে ফিরে আসছে। সদন কারো সঙ্গে কথা না বলে সোজা ঘরে এসে মায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল, মা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করলেন।

ভামা—ওরা কোথায়?

সদন—আসছে, আমি সোজা ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে চলে এসেছি।

ভামা—কাকা-কাকীর কাছে থাকার সখ মিটেছে তো?

সদন—কেন?

ভামা—সে তো চেহারাই বলে দিচ্ছে।

সদন—বাঃ, আমি তো মোটা হয়ে গিয়েছি।

ভামা—মিথ্যুক, কাকী নিশ্চয় থেতে দিত না।

সদন—কাকী জান না, এখানের চেয়েও বেশী আরামে ছিলাম। ওখানে আরো সুখ পেতাম।

ভামা—তবে টাকা চেয়েছিলি কেন?

সদন—তোমাদের ভালবাসা কতটা তাই জানতে। এতদিনে তোমাদের কাছে শুধু ২০ টাকা নিয়েছি না? কাকার কাছ থেকে সাত শো নিয়েছি। চারশো টাকা দিয়ে ঘোড়া কিনেছি, রেশমী জামাকাপড় তৈরী করিয়েছি, শহরে বড়লোকের মত ঘুরে বেড়িয়েছি। সকালে কাকী গরম হালুয়া তৈরী করে দিতেন, তারপর এক সের দুধ; তৃতীয় প্রহরে ফল মিষ্টি। ওখানে যে আরামে থেকেছি তা কখনো ভুলব না। আমি ভেবেছিলাম আমাদের রোজগারে তো যথেষ্ট সুখ পেয়েছি; এটুকুই বা ছাড়ি কেন? সব শখ পুরিয়ে নিয়েছি।

ভামার মনে হল সদনের কথাবার্তা যেন কেমন কেমন হয়ে গেছে। তার সব কিছুতে শহুরে ভাব এসেছে।

সদন নিজের নাগরিক জীবন খুব উৎসাহের সঙ্গে বর্ণনা করল, এটা যৌবনের ধর্ম।

সরলা ভামার মন সুভদ্রার উপর প্রসন্ন হল।

পরের দিন সকালে গ্রামের মান্য গণ্য লোক নিমন্ত্রিত হল আর তাঁদের সামনে সদনের আশীর্বাদ হল।

এ সময় সদনের মনে প্রেম-বাসনা এত প্রবল যে সামনে বিয়ে নামক বেড়িটি দেখেও সে চিন্তিত হল না। সুমনের প্রতি ভালবাসায় তৃষ্ণার ভাগ বেশী। সুমন তার হৃদয়ে গাঁথা থাকলেও তার জীবনের সাথী হতে পারে না। সদনের কাছে কুবেরের ঐশ্বর্য থাকলে তা সে সুমনকে দিতে পারে, কিন্তু দুঃখ দুর্দশার ভাগ দিতে পারে না। তার সঙ্গে সুখের আনন্দ ভোগ করা যায় কিন্তু দুঃখের আনন্দ পাওয়া যায় না। যে বিশ্বাস প্রেমের প্রাণ শক্তি সুমনের কাছে তা মেলে না। এখন সে তার কপট প্রেমের মায়াজাল থেকে মুক্ত হবে। আর তাকে বহুরূপী সাজতে হবে না। এখন সে প্রেমের সত্যরূপ দেখতে ও দেখাতে পারবে। এখানে সে এমন অমূল্য জিনিষ পাবে যা সুমনের কাছে কখনো পেতে পারে না।

এই সব ভেবে সদন নতুন প্রেমের জন্য লালায়িত হল। শুধু একটা ভয় যে যদি স্ত্রী রূপবতী না হয়। রূপ লাবণ্য হচ্ছে প্রাকৃতিক গুণ যা বদলাতে পারে না। স্বভাব হচ্ছে উপার্জিত গুণ যা শিক্ষা ও সৎসঙ্গে সংশোধিত হতে পারে। সদন ঠিক করল যে শ্বশুরবাড়ী থেকে যে নাপিত এসেছে তার কাছ থেকে এ বিষয়ে জানতে হবে। তাকে খুব সিদ্ধি খাওয়াল, সঙ্গে প্রচুর মিঠাই। নিজের একটা ধুতি তাকে দান করল। নেশার ঘোরে

নাপিত ভাবী বধূর খুব প্রশংসা করল। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত শরীরের এমন ছবি আঁকল যে সদনের কোনো সংশয় থাকল না। বর্ণনা সুমনের সঙ্গে অনেকটা মেলে। অতএব নববধূকে স্বাগত জানাবার জন্য সদন উৎসুক হয়ে রইল।

২৪

কথাটা মিথ্যা নয় যে ঈশ্বর যে কোন উপায়ে সকলকে অন্নবস্ত্র দেন। বাঁধা রোজগারের পথ না থাকলেও পণ্ডিত উমানাথ সুখেই সংসার চালাচ্ছেন। তাঁর আকাশী বৃত্তি ছিল। নিজের গরু মহিষ না থাকলেও বাড়ীতে ঘি দুধের নদী বইত। চাষ না থাকলেও ঘরে সব শস্য মজুদ। গ্রামে কোথাও মাছ ধরা হলে, কোথাও পাঁঠা কাটা হলে, কোথাও আম পাড়া হলে, কোথাও ভোজ হলে উমানাথের ভাগ না চাইতেই তাঁর ঘরে পৌঁছে যেত। অমোলা গ্রামটা বেশ বড়, দু তিন হাজার লোকের বাস। কিন্তু তাঁর সম্মতি ছাড়া গাঁয়ে একটা কাজও হত না।

গয়না গড়াতে হলে মেয়েরা উমানাথকে বলত। ছেলে মেয়ের বিয়ে উমানাথের মারফতে স্থির হত। বন্ধকী দলিল, খরিদ বিক্রির কাগজ লেখা প্রভৃতি কাজ উমানাথের পরামর্শ নিয়ে হত। মামলা মোকদ্দমা তাঁকে দিয়েই রুজু করানো হত, তবে মজার ব্যাপার এই যে তাঁর এই প্রভাব আর সম্মান তাঁর সজ্জনতার জন্য নয়। গাঁয়ের লোকের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল রূঢ়। তিনি ছিলেন স্পষ্টবাদী, খোসামোদ করতেন না, কিন্তু তার কড়া কথাও লোকে দুধের মত দরকারী ভাবত। বলা যায় না তাঁর স্বভাবে কি যাদু ছিল। কেউ বলত তাঁর অদৃষ্ট, কেউ বলত তাঁর উপর মহাবীরের আশীর্বাদ আছে। কিন্তু আমাদের মনে হয় এটা তাঁর মানব-স্বভাব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার ফল। তিনি জানতেন কোথায় মাথা নিচু করতে হবে আর কার কাছে উঁচু রাখতে হবে। গ্রামের লোকের সামনে দাপট দেখালে কাজ হয় আর অধিকারীদের সামনে ঝুঁকে থাকতে হয়।

থানা ও কাছারির আমলা, চাপরাশী থেকে তসিলদার পর্যন্ত সকলের কৃপা দৃষ্টি তাঁর উপর। তসিলদার সাহেবের রাশিফল তৈরী করতেন, ডেপুটিসাহেবকে তাঁর ভাবী উন্নতির সম্ভাব্য সময় জানাতেন, কানুনগো আমিন তাঁর অনাহুত অতিথি হত। কাউকে মন্ত্র দিতেন, কাউকে গীতা পড়ে শোনাতেন, আর তাঁর কথায় যাদের শ্রদ্ধা ছিল না তাদের মিষ্টি আচার চাটনি খাইয়ে সন্তুষ্ট রাখতেন।

থানার বাবুদের ডান হাত ছিলেন তিনি। যে কাজে কেউ নাক গলাতে পারত না, পণ্ডিতজী সেখানে কাজটা ষোল আনা হাসিল করতেন। গাঁয়ে এমন মানুষকে লোকে পুজো না করে পারে?

নিজের বোন গঙ্গাজলীকে উমানাথ ভালবাসতেন। কিন্তু বাপের বাড়ী এসে গঙ্গাজলী অল্পদিনের মধ্যেই টের পেল যে ভাইয়ের ভালবাসা ভাজের অবজ্ঞার সামনে দাঁড়াতে পারছে না। উমানাথ বোনকে নিজের বাড়ীতে এনে পস্তাচ্ছিলেন। নিজের স্ত্রীর মন রাখতে হ্যাঁ হ্যাঁ করে তার কথায় সায় দিতে বাধ্য হতেন। গঙ্গাজলীর পরিষ্কার কাপড় পরে থাকবার দরকার কি? শান্তা আগে যতই আদর যত্নে থাকুক, এখন কি তার উমানাথের মেয়েদের মতো থাকা সাজে? উমানাথ স্ত্রীর এ সব অনুযোগ শুনতেন এবং সায় দিতেন। গঙ্গাজলীর যখন রাগ হত, তখন দাদার উপর রাগ হত। দাদা যদি বৌকে বকে তবে কি আর সে আমার পিছনে লাগতে সাহস পায়। উমানাথ সুযোগ পেলেই গোপনে গঙ্গাজলীকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতেন। কিন্তু এক তো জাহ্নবী দেবী তাঁকে সে সুযোগই দিত না, আর গঙ্গাজলীরও দাদার সহানুভূতিতে কোন বিশ্বাস ছিল না।

এইভাবে এক বছর কেটে গেল। চিন্তায়, শোকে, হতাশায় গঙ্গাজলী অসুখে পড়ল। প্রায়ই জ্বর হতে লাগল। উমানাথ প্রথমে সাধারণ ঔষধপত্র দিলেন, কিন্তু তাতে ফল না পেয়ে চিন্তায় পড়লেন। একদিন তাঁর স্ত্রী প্রতিবেশীর বাড়ীতে গেলে উমানাথ বোনের ঘরে গেলেন। জ্বরে বেহুঁশ হয়ে আছে, বিছানাপত্র সব ময়লা, পরনের শাড়ী শতচ্ছিন্ন। শান্তা পাশে বসে হাওয়া করছে। এ দৃশ্য দেখে উমানাথ কেঁদে ফেললেন। যে বোনের সেবায় দুজন ঝি সবসময় লেগে থাকত তার আজ এই দুর্দশা দেখে নিজের দুর্বলতার জন্য তাঁর বড় দুঃখ হল। গঙ্গাজলীর মাথার কাছে বসে কাঁদতে কাঁদতে তিনি বললেন—বোন, তোমাকে এখানে এনে বড় কষ্ট দিয়েছি; এমন হবে ভাবিনি। আমি আজই একজন বৈদ্য ডেকে আনছি। ভগবানের কৃপায় তুমি শীঘ্রই ভাল হয়ে যাবে।

এই সময় জাহ্নবীও এসে পড়ায় কথাগুলো তার কানে গেল। বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাবে বৈকি শীঘ্র বৈদ্য ডাকো, নইলে অনর্থ ঘটে যাবে। আগে আমি যখন একমাসের উপর জ্বরে পড়েছিলাম তখন তো বৈদ্যের কাছে যেতে হয়নি। আমিও যদি চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকতাম তবেই জানা যেত যে রোগ হয়েছে। কিন্তু আমি কি করে পড়ে থাকব? তাহলে সংসারের চাকা ঘোরাবে কে? আমার কি তেমন সুখের কপাল?

উমানাথের উৎসাহ উপে গেল। বৈদ্য ডাকবার সাহস হল না। তিনি জানতেন যে এমনিতে যদি বা গঙ্গাজলী দু চার মাস বাঁচে, বৈদ্য ডাকলে সে

কখনও বাঁচবে না।

গঙ্গাজলীর অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত জ্বরাতিসার হয়ে দাঁড়াল। বাঁচবার কোন আশা রইল না, যে সাবু হজম করতে পারে না সে কি করে রুটি হজম করবে? তার রোগ জর্জর দেহ এ কষ্ট বেশিদিন সইতে পারল না। ছ মাস রোগে ভুগে দুঃখিনী অকাল মৃত্যুর কবলে পড়ল।

সংসারে শান্তার আর কেউ রইল না। সুমনের কাছে দুটো চিঠি লিখল, কিন্তু সেখান থেকে কোনও উত্তর এল না। শান্তা বুঝল যে দিদির সঙ্গেও সম্বন্ধ রইল না। দুর্দিনে কে আর সঙ্গী হতে চায়? যতদিন গঙ্গাজলী বেঁচে ছিল শান্তা তার আঁচলে মুখ লুকিয়ে কাঁদত। এখন সে উপায়ও রইল না। অন্ধের হাতের লাঠিও চলে গেল। শান্তা এখনও ঘরের কোণে মুখ লুকিয়ে কাঁদে কিন্তু ঘরের কোণ আর মায়ের আঁচলের মধ্যে অনেক তফাৎ। একটা মরুভূমি, অন্যটা ঠাণ্ডা জলের আধার।

শান্তার এখন শান্তি নেই। সব সময় বুকে আগুন জ্বলে। সে জানে যে মামা মামী তার মাকে মেরে ফেলেছে। যতদিন গঙ্গাজলী বেঁচে ছিল তাকে গালমন্দ খাওয়া থেকে বাঁচাবার জন্য শান্তা চেষ্টা করত। মামীর মুখের কথা খসতে না খসতেই সে ছুটে যেত যাতে মাকে কোন কথা না শুনতে হয়। একবার গঙ্গাজলীর হাত থেকে ঘি-এর হাঁড়ি পড়ে গেলে শান্তা মামীকে বলেছিল, এটা আমার হাত থেকে গেছে, খুব গালাগালি গেল। সে জানত যে তার মা এত আঘাত সইতে পারবে না।

কিন্তু শান্তার আর সে ভয় নেই। পিছুটান না থাকায় তার জোর বেড়েছে। এখন সে আগের মত সইতে পারে না, চট করে রেগে যায়। অনেক কথায় সমানে উত্তর দিয়ে যায়। বাক্য যন্ত্রণা সহ্য করবার জন্য সে নিজেকে তৈরী করে নিয়েছে। মামার কাছে চুপ করে থাকে কিন্তু মামীর কথায় চুপ করে থাকে না আর মামাতো বোনদের তো সমান তালে জবাব দেয়। এক কথায় শান্তা এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে।

এইভাবে আরো এক বছর কেটে গেল। উমানাথ তার বিয়ের জন্য খুব ছুটোছুটি করতে লাগলেন, কিন্তু যত সস্তায় কাজ সারতে চাইছিলেন তেমন পাত্র কোথাও মিলল না। তিনি থানা-তসিল থেকে ধরাধরি করে ২০০ টাকা চাঁদা যোগাড় করেছিলেন, কিন্তু এত সস্তায় বর মিলবে কোথায়? জাহ্নবীর মতে চললে সে শান্তাকে কোন ভিখারীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তাকে বিদায় করত, কিন্তু উমানাথ এই প্রথমবার সে প্রস্তাবের বিরোধিতা করে সুযোগ্য বর খুঁজতে লাগল। গঙ্গাজলীর আত্মদানের ফলে উমানাথের মন কিছুটা শুদ্ধ হয়েছিল।

২৫

প্রতিভাবান লোকেরা প্রায়ই সার্বজনিক সংস্থাগুলোকে এড়িয়ে চলেন। যদিও বিঠলদাসের অনুগামীর সংখ্যা কম ছিল না, কিন্তু তারা প্রায় সবাই সাধারণ অবস্থার লোক। উচ্চ শ্রেণীর লোক এদিকে বিশেষ ঘেঁসত না। পদ্মসিংহ যোগ দেওয়ায় সংস্থাটি প্রাণ পেল। নদীর ক্ষীণ ধারা উপচে পড়ল, বড়লোকদের মধ্যে এর আলোচনা হতে লাগল। সংস্থার উপর লোকের বিশ্বাস বৃদ্ধি পেল।

পদ্মসিংহ একলা এলেন না। কোন কাজ ভাল বলে মনে হলেও তাতে যোগ দিতে আমরা প্রায়ই দ্বিধাগ্রস্ত হই, বদনামের ভয় করি; কবে বড়রা এসে যোগ দেবে সেই প্রত্যাশায় থাকি। কাউকে এপথে আসতে দেখলে আমাদের সাহস বাড়ে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভয় থাকে না। নিজের ঘরেও একলা ভয় লাগে; আবার দুজনে হলে আমরা জঙ্গলেও নির্ভয়ে থাকি। প্রফেসর রমেশ দত্ত লালা ভগতরাম আর মিস্টার রুস্তমভাই গুপ্তভাবে বিঠলদাসকে সাহায্য করতেন। এবার তাঁরা প্রকাশ্যে করতে লাগলেন। সাহায্যকারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়তে লাগল।

সংস্কারের কাছে মৃদুভাষী হওয়া বিঠলদাস অনুচিত ভাবতেন, তাই তাঁর কথা শুনতে ভাল লাগত না। মিঠে ঘুমের আমেজ পাওয়া লোকেদের কানে তাঁর কঠোর ভাষণ অপ্রিয় লাগত। বিঠলদাস তাতে ভ্রূক্ষেপ করতেন না।

পদ্মসিংহ একজন বিশিষ্ট ধনী। তিনি বেশ্যাদের শহরের মুখ্য স্থান থেকে সরাবার জন্য খুব উৎসাহ নিয়ে আন্দোলন শুরু করলেন। মিউনিসিপ্যালিটির দু চারজন কর্মকর্তা বিঠলদাসের ভক্ত ছিলেন, কিন্তু এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করবার যথেষ্ট সাহস তাঁদের ছিল না। সমস্যাটা এতই জটিল যে তার কল্পনা করতেও লোকে ভয় পেত। তাঁদের মনে হত যে এই প্রস্তাব উঠলে শহরে কত হৈ চৈ পড়ে যাবে। শহরের অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের, অনেক রাজ কর্মচারীর, অনেক ব্যবসায়ীর এই প্রেমমণ্ডীর সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। কেউ এক জায়গায় নিয়মিত আসা যাওয়া করেন, কেউ এখানে ওখানে মুখ বদলে ঘুরে বেড়ান, এঁদের শত্রু করে তুলতে কার সাহস হবে? মিউনিসিপ্যালিটির কর্তারা তো তাঁদের হাতের পুতুল বললেই চলে।

পদ্মসিংহ মেম্বারদের সঙ্গে দেখা করে তাদের প্রস্তাবের পক্ষে আনলেন। প্রভাকররাওয়ের তীক্ষ্ণ লেখনী তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করল। প্রচার-পত্র ছাপানো হল। জনতাকে সজাগ করবার জন্য ধারাবাহিক ভাষণের বন্দোবস্ত

হল। রমেশ দত্ত ও পদ্মসিংহ এ বিষয়ে যথেষ্ট নিপুণ ছিলেন, ভাষণের ভার তাঁরাই নিলেন। এরপর আন্দোলনে নিয়মিত গতি সঞ্চার হল।

পদ্মসিংহ প্রস্তাবটা তুললেন বটে, কিন্তু এ বিষয়ে যতই ভাবেন ততই যেন অন্ধকারে তলিয়ে যান। তাঁর বিশ্বাস হত না যে বেশ্যাদের সরিয়ে দিলেই আশাতীত উপকার হবে। উপকারের বদলে অপকার হওয়াও অসম্ভব নয়। অসত্যের মধ্যে প্রতিকার হচ্ছে সদ্‌জ্ঞানে। এ ছাড়া কোন উপায়ই সফল হতে পারে না। কখনো কখনো এই সব ভাবতে ভাবতে হতাশ হয়ে পড়তেন। কিন্তু নিজে এই আন্দোলনের এক সভ্য বলে অপরের কাছে এ কথা বলতে পারতেন না। জনতার সামনে এক সংস্কারক হতে তাঁর কোন সংকোচ ছিল না, কিন্তু বন্ধুদের সামনে শক্ত হতে পারতেন না। কেউ বলত, তুমিও শেষে বিঠলদাসের খপ্পরে পড়লে? আরামে দিন কাটাও, কেন মিথ্যে এ সব ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছ? কেউ বলত, ভাই মনে হচ্ছে কোন মেয়ে তোমায় দাগা দিয়েছে। তাই তুমি বেশ্যাদের পিছনে উঠে পড়ে লেগেছ। এমন বন্ধুদের কাছে আদর্শ আর উপকারিতার কথা বলা অর্থহীন।

বক্তৃতা দেবার সময় যখন শর্মাজী কোন ভাবপূর্ণ কথা বলতেন বা করুণ দৃশ্যের অবতারণা করতে চাইতেন তখন উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পেতেন না আবার শব্দ পেলেও সেটা বলতে তাঁর বড় লজ্জা হত। সত্যি বলতে এ রসে তাঁর কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। নিজের ভাবের অভাব দেখে তাঁর মনে হত যে তাঁর ভিতরে এ বিষয়ের প্রতি কোন আগ্রহ নেই।

বক্তৃতা দেবার পর শ্রোতারা কতটা প্রভাবিত হল তা জানতে তাঁর তেমন ইচ্ছা হত না। তিনি জানতে চাইতেন যে ভাষণ কত সুন্দর, প্রামাণ্য এবং ওজস্বী হয়েছে।

যাই হোক সমস্যা থাকলেও আন্দোলন দিন দিন বাড়তে লাগল। ফলে তাঁর উৎসাহও বৃদ্ধি পেল।

মদন সিংহের বিয়ের এখনও দু মাস দেরী। ঘরের চিন্তা থেকে ছাড়া পেয়ে শর্মাজী আন্দোলনে জোর দিলেন। কাছারির কাজে বিশেষ মন থাকত না। প্রায় সব সময় এই আলোচনাই হত। সব সময় একই বিষয়ে ভাবনা চিন্তা থাকলে সে বিষয়ে আসক্তি জন্মায় আর শর্মাজীরও তাই হল।

কিন্তু বিয়ের দিন যত এগিয়ে আসতে লাগল তাঁর উৎসাহে ততই ভাঁটা পড়তে লাগল। মনে চিন্তা জাগল, দাদা এখন নিশ্চয়ই আমাকে বাঈজী ঠিক করতে লিখবেন, তখন আমি কি করব? নাচ না হলে তো বিয়ের আসর ফাঁকা লাগবে। দূর দূর থেকে গাঁয়ের লোক নাচ দেখতে আসবে আর নাচ নেই দেখে নিরাশ হবে। দাদাও রাগ করবেন, এ অবস্থায় আমার কি করা উচিত? দাদাকে বলে এই কুপ্রথা বন্ধ করাতে হবে। কিন্তু এই দুরূহ কাজে কি সফল হতে

পারব ? বড়দের সঙ্গে ন্যায় অন্যায় উচিত অনুচিতের আলোচনা অনুচিত মনে হচ্ছে। দাদার মনে ধুমধামের বড় বড় পরিকল্পনা আছে, তাতে কোথাও খুঁত থাকলে তিনি দুঃখ পাবেন। কিন্তু যাই হোক না কেন, আমার সিদ্ধান্তে অটল থাকাই আমার কর্তব্য।

যদিও তাঁর সিদ্ধান্তের ফলে অল্পলোকই খুশি হবে এবং অসন্তুষ্ট হবে অধিকাংশ তবু তিনি অল্পসংখ্যককেই প্রসন্ন করাই উচিত ভাবলেন। তিনি স্থির করলেন যে নাচের বন্দোবস্ত করবেন না। নিজের ঘরেই যদি সংস্কার না করা যায় তবে পরকে শোধরাবার চেষ্টা বজ্জাতি ছাড়া আর কি ?

এই স্থির করে শর্মাজী বরযাত্রার সাজসজ্জার জিনিষ যোগাড় শুরু করলেন। এখন আনন্দোৎসবে কার্পণ্য করা অনুচিত মনে হল। সেই সঙ্গে অন্যান্য জিনিষে বেশি খরচ করে তিনি নাচের অভাব মেটাতে চাইছিলেন যাতে কেউ তাঁকে কৃপণ বলে দোষ না দেয়।

একদিন বিঠলদাস বললেন—এই সব যোগাড় করতে আপনার কত খরচ হল ?

শর্মা—এর হিসাব সব চুকে গেলে জানা যাবে।

বিঠলদাস—তবু দু এক হাজারের কম হবে না।

শর্মা—হ্যাঁ, হয়তো কিছু বেশিই হবে।

বিঠল—এত টাকা আপনি জলে ফেললেন। কোন ভাল কাজে দিলে কত উপকার হত। আপনার মত বিবেচক লোকও যদি এ ভাবে টাকা নষ্ট করেন, তবে আর অপরের কাছে কী আশা করা যায় ?

শর্মা—এ বিষয়ে আপনার মতে সায় দিতে পারছি না। যাকে ঈশ্বর দিয়েছেন, আনন্দোৎসবে তার প্রাণ খুলে খরচ করা উচিত। অবশ্য ধার করে নয়, ঘর বেচে নয়, নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী করতে হবে। দিল দরিয়া হবার এই তো সুযোগ।

বিঠল—আপনার বিবেচনায় ডঃ শ্যামাচরণের পাঁচ-দশ হাজার খরচ করবার সামর্থ্য আছে কি না ?

শর্মা—তার চেয়ে অনেক বেশি করতে পারেন।

বিঠল—কিন্তু সে দিন তাঁর ছেলের বিয়েতে তিনি বাজি-বাজনা, নাচ গান, তামাসার জন্য অনেক কম খরচ করেছেন।

শর্মা—হ্যাঁ, নাচ তামাসায় খরচ কম করেছেন বটে কিন্তু ডিনার পার্টিতে সে ঘাটতি পুষিয়ে গেছে, হয়তো আরো বেশী খরচ হয়েছে। তাঁর খরচ কমানোতে কি ফল হল ? যে টাকা বাজনদারেরা, ফুল-পাতা সাজাবার আতশবাজির কারিগরেরা পেত, সেটা 'মারে কোম্পানী' আর 'হোয়াইট ওয়ে কোম্পানী' নিয়ে গেল। এমন ব্যয়-সংকোচ আমার মতে অনুচিত।

২৬

রাত নটা। পদ্মসিংহ দাদার সঙ্গে বসে বিয়ের সম্বন্ধে কথাবার্তা বলছিলেন। কাল বরযাত্রীরা যাবে। দরজার সামনে শানাই বাজছে, অন্দরে বিয়ের মঙ্গল গান হচ্ছে।

মদনসিংহ—তুমি যে গাড়ীগুলো পাঠিয়েছ, তা কাল সন্ধ্যার মধ্যে অমোলায় আসবে তো?

পদ্মসিংহ—আজ্ঞে না, দুপুরে নাগাদ পৌঁছে যাবে। অমোলা বিন্ধ্যাচলের কাছে। আমি আজ দুপুরের আগেই তাদের রওনা করে দিয়েছি।

মদন—তা হলে এখান থেকে কি কি জিনিষ নিয়ে যাওয়া দরকার?

পদ্ম—সামান্য খাবার দাবার নিয়ে চলুন। আর সব জিনিষ আমি ঠিক করেছি।

মদন—নাচ কত টাকায় ঠিক করলে? দু দল ঠিক করেছ তো?

পদ্মসিংহের ভয় হচ্ছিল যে এবার নাচের কথা এলো বলে। প্রশ্ন শুনে লজ্জায় তাঁর মাথা নিচু হয়ে গেল। মৃদু স্বরে বললেন—নাচ তো আমি ঠিক করিনি।

মদন সিংহ চমকে উঠলেন যেন কেউ তাঁকে চিমটি কেটেছে, বললেন—ধন্য তুমি! তুমি তো ভরা নৌকোই ডুবিয়ে দিলে। তবে আর বরসভার জন্য কি আয়োজন করেছ? কেন? সময় পাওনি, না, খরচের ভয়ে পেছিয়ে গেলে? এই জন্যেই তো তোমাকে চারদিন আগেই লিখেছিলাম। যে বামুনকে নেমন্তন্ন করে, দক্ষিণা দেবার সামর্থ্যও তার থাকে। খরচ করতে তোমার ভয় লাগল তো আমাকে পরিষ্কার করে জানালেই হতো, আমি এখান থেকে টাকা পাঠিয়ে দিতাম। ভগবানের দয়ায় আমি এখনও কারো মুখ চেয়ে থাকি না। এখন বলো কি উপায় করা যায়? মুখে চুণকালি পড়ল তো? এক ভদ্রলোকের বাড়ী যাচ্ছি, উনিই বা কী মনে করবেন? দূর দূর থেকে আত্মীয় কুটুম আসবে, দূর দূর গাঁয়ের লোক বরসভা দেখতে আসবে, তারা সব কী মনে করবে? রাম—রাম।

মুন্সী বৈজনাথ গাঁয়ের আট আনার মালিক। মদন সিংহের দিকে মর্মভেদী দৃষ্টি হেনে বললেন—শুধু মনেই করবে না মশাই, খোলাখুলি বলবে, গালমন্দ করবে। বলবে মুখেই বারফট্টাই, কাজে অণ্টরম্ভা। সব জায়গায় নিন্দে হবে। নাচ না থাকলে আর বরসভার থাকে কি? অন্ততঃ আমি তো এমন কখনও

দেখিনি। হয়তো ভাই সাহেবের খেয়ালই হয় নি, আর না হয় লগনশার চাপে, যোগাড় করতে পারেন নি।

পদ্মসিংহ ভয়ে ভয়ে বললেন—ব্যাপারটা তা নয়···

মদন—তবে আর কী? তুমি হয়তো ভেবেছ যে সমস্ত বোঝা তোমার মাথায় পড়বে; কিন্তু সত্যি বলছি, এ রকম ভেবে আমি তোমাকে লিখি নি; আমি অন্যের মাথায় কখনো কাঁঠাল ভাঙি না।

পদ্মসিংহ বড় ভাইয়ের কটু কথা সহ্য করতে পারলেন না। চোখে জল এসে গেল। বললেন—দাদা, দোহাই আপনার, আমার সম্বন্ধে এমন ধারণা করবেন না; আমি প্রাণ দিলেও যদি আপনার কাজ হয়, তাতে আমি পেছ পা নই। আপনার সেবা করাই আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা। আজকাল শহরে এই নাচের প্রথাকে খারাপ বলছে বলেই আমার এই অপরাধ হয়েছে শিক্ষিত সমাজ এর বিরোধিতা করছে আর আমিও তাদের দলে আছি বলে আমার এ কাজ করতে সাহস হল না।

মদন—এই ব্যাপার! এতে যদি লোকের চোখ খোলে তো ভালো; আমিও এই প্রথাকে নিন্দের বলে মনে করি, কিন্তু আগে থেকে নাক গলাতে চাই না। সকলে ছাড়লে আমিও ছাড়ব। আমার কি দায় পড়েছে যে আমিই আগ বাড়িয়ে কাজ করব। আমার একটাই ছেলে, তার বিয়েতে সব সাধ পুরো করা চাই। বিয়ের পরে তোমার মতে সায় দেব। এ সময় আমায় পুরোনো রীতি মানতে দাও, যদি খুব কষ্ট না হয় তো ভোরের গাড়ীতে যাও আর বায়না দিয়ে ওখান থেকেই অমোলা চলে যেও। তোমাকে ওখানে লোকে চেনে বলেই বলছি, অন্য লোক পাঠালে তাকে ঠকিয়ে লুটে নেবে।

পদ্মসিংহ মাথা নিচু করে ভাবতে লাগলেন। তাঁকে নিরুত্তর দেখে মদনসিংহ রেগে বললেন—চুপ করে আছ কেন? যাবার ইচ্ছে নেই?

পদ্মসিংহ অত্যন্ত দীনভাবে বললেন—দাদা, মাপ করবেন আমি······

মদনসিংহ—না, না, তোমার উপর আমি জোর করছি না; না যেতে চাও যেও না। মুন্সী বৈজনাথ, আপনার কষ্ট হবে জানি, কিন্তু আমার খাতিরে আপনিই যান।

বৈজনাথ—আমার কোন আপত্তি নেই।

মদন—ওখান থেকেই অমোলা চলে যাবেন, দয়া করে এটা করুন।

বৈজনাথ—আপনি নিশ্চিন্ত হোন, আমি যাবো।

কিছুক্ষণ তিন জনই চুপ করে রইলেন, মদনসিংহ ভাইকে কৃতঘ্ন ভাবছিলেন। বৈজনাথের চিন্তা এই যে মদনসিংহের পক্ষে কাজ করায় পদ্মসিংহ অসন্তুষ্ট হবেন কিনা কে জানে, আর পদ্মসিংহ দাদার অপ্রসন্নতার ভয়ে দমে গিয়েছিলেন, মাথা তুলতে সাহস হচ্ছিল না। একদিকে দাদার অসন্তোষ, অন্যদিকে সিদ্ধান্ত আর

ন্যায়ের খণ্ডন। একদিকে অন্ধকার খাদ, অন্যদিকে খাড়া পাহাড়, যাবার কোন পথ নেই। শেষে ভয়ে ভয়ে বললেন—দাদা, আপনি তো আমার অনেক ভুল কতবার ক্ষমা করেছেন। আমার আর এক ধৃষ্টতাও ক্ষমা করবেন। আপনি যদি নাচের রীতিটা খারাপই মনে করেন তবে তার উপর এত জোর দিচ্ছেন কেন?

মদনসিংহ ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন—তুমি এমনভাবে বলছো যেন তুমি এদেশে জন্মাওনি, যেন অন্য দেশ থেকে এসেছ। শুধু এই একটা কি, কতো কুপ্রথা রয়েছে যেগুলো দূষিত জেনেও তা পালন করতে হয়। নানারকম গালাগাল দিয়ে গান গাওয়া কি ভালো? যৌতুক নেওয়া কি ভালো? কিন্তু লোকাচার না মানলে লোকে ধিক্কার দেবে। নাচ না নিয়ে গেলে লোকে বলবে পয়সা বাঁচাবার জন্যে আনে নি। মর্যাদা ধুলোয় লুটোবে। আমার সিদ্ধান্ত, নীতির কথা কে ভাববে?

পদ্মসিংহ বললেন—আচ্ছা, এই টাকাটা যদি অন্য ভালো কাজে খরচ করেন তবে তো আর লোকে কৃপণ বলতে পারবে না। আপনি দুজন বাঈজী আনতে চাইছিলেন। বিয়ের মরসুমে বেশী টাকা লাগে। তিন শো টাকার কমে হবে না। আপনি তিন শো'র বদলে পাঁচশো টাকার কম্বল কিনে যদি অমোলা গ্রামের গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেন তো কেমন হয়? অন্ততঃ দুশো লোক আপনাকে আশীর্বাদ দেবে আর যতদিন কম্বলের একগাছা সুতোও থাকবে ততদিন আপনার গুণগান করবে। যদি এটা পছন্দ না হয় তো দুশো টাকা দিয়ে অমোলায় একটা পাকা কুঁয়ো তৈরী করিয়ে দিন। আপনার কীর্তি চিরকাল থাকবে, টাকার যোগাড় আমি করবো।

বদনাম হবে বলে যে আপত্তি মদনসিংহ তুলেছিলেন, এই প্রস্তাবের সামনে তা আর টিঁকলো না। কি উত্তর দেবেন ভাবছিলেন, এমন সময় পদ্মসিংহের অসন্তুষ্ট হবার ভয় থাকা সত্ত্বেও মুন্সী বৈজনাথ নিজের বুদ্ধির বহর দেখাবার প্রবল ইচ্ছায় বলে উঠল—ভাই, যখনকার যা তাই করাই উচিত, দানের সময় দান করা উচিত আর নাচের সময় নাচ। বেহিসেবী কাজ ভাল হয় না, তার উপর শহরের খবর জানা লোক হলেও না হয় হতো। গ্রামের মূর্খ জমিদারদের সামনে কম্বল দিতে লাগলে তারা আপনাকে দেখে হাসবে।

মদনসিংহ মিইয়ে গিয়েছিলেন। মুন্সী বৈজনাথের কথায় জোর পেলেন। কৃতজ্ঞ হয়ে তার দিকে চেয়ে বললেন—হাসবে না তো কি? বসন্তের সময় মল্লার গাইলে কে আর ভাল বলবে? অসময়ের কোন কাজ কখনো ভাল হয় না। আমি তো তাই বলছি আপনি সকালেই চলে যান আর দুটো দল ঠিক করে আসুন।

পদ্মসিংহ দেখলেন যে এঁরা নিজের মনোমত কাজ করবেন ঠিকই, তবু

দেখা যাক কেমন যুক্তি দিয়ে নিজেদের পক্ষ সমর্থন করেন। তখন তিনি নিঃসংকোচে বললেন—তা বিয়েটা আনন্দোৎসবের সময় মনে করব কেন? আমার তো মনে হয় যে দান আর উপকার করবার এর চেয়ে কোন ভালো সুযোগ নেই। বিয়ে একটা ধার্মিক ব্রত, আত্মিক প্রতিজ্ঞা। যখন আমরা গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করি, যখন পায়ে ধর্মের বেড়ী পড়ে, যখন আমরা সাংসারিক কর্ত্তব্যের সামনে মাথা নিচু করি, যখন জীবনের ভার ও ভাবনা আমাদের মাথায় পড়ে তখন এমন পবিত্র সংস্কার যথাযোগ্য গাম্ভীর্যের সঙ্গেই করা উচিত। যখন আমাদের আত্মীয় যুবক এমন এক কঠিন ব্রত আরম্ভ করতে যাচ্ছে সেই সময় আমাদের আনন্দোৎসবে মেতে ওঠা কতোখানি নিষ্ঠুরতা। তার ঘাড়ে গুরু দায়িত্ব চাপছে আর আমরা নাচ গানে মত্ত হচ্ছি। এই উল্টো প্রথা আজকাল চলছে বলে আমরাও কি সেই উল্টোপথেই চলবো? শিক্ষার অন্ততঃ এটুকু প্রভাব তো হওয়া উচিত যে ধর্মের বিষয়ে মূর্খদের খুশি করাই প্রবীন মনে না করি।

মদন সিংহ আবার চিন্তায় ডুবে গেলেন। পদ্মসিংহের কথা সর্বাংশে সত্য বলে বুঝলেন, কিন্তু রীতি বা লোকাচারের সামনে ন্যায়, সত্য, সিদ্ধান্ত সবাইকে মাথা নীচু করতে হয়। তার মনে হল মুন্সী বৈজনাথ এর কোন উত্তর দিতে পারবেন না। কিন্তু মুন্সীজী এতো শীঘ্র রাজী নন। তিনি বললেন—ভাই তুমি উকিল, তোমার সঙ্গে তর্ক করে কি আমরা পারি? কিন্তু যেটা চিরকাল থেকে চলে আসছে, সেটা উচিত হোক কি অনুচিত হোক, বাদ দিলে বদনাম নিশ্চয় হবে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা তো আকাট মূর্খ ছিলেন না, তারা কিন্তু ভেবেই তো এই প্রথা চালু করেছিলেন।

মদনসিংহের মাথায় এ যুক্তি আসে নি। শুনে খুব খুশি হলেন। বৈজনাথকে আরো খাতির দেখিয়ে বললেন—ঠিক কথা, তাঁরা যে সব প্রথা চালু করেছেন, নিশ্চয় তার কিছু গুপ্ত কারণ আছে। হয়তো আজকাল আমরা সেটা বুঝতে পারি না। আজকাল লোকের বিচার নতুন। তারা পুরোনো সব প্রথা ভাঙাতেই গৌরব ভাবে। অপরের মত মানতে চায় না। তারা এটা বোঝে না যে আজ আমাদের যা বিদ্যা, জ্ঞান, বিচার, আচরণ রয়েছে সে সব সেই পূর্বপুরুষদের কাছে থেকেই পাওয়া। কেউ বলে, পৈতে রেখে কি লাভ? কেউ শিক্ষার জড় উপড়ে ফেলতে কোমর বেঁধেছে, কেউ চাইছে যে শূদ্র, চণ্ডাল সবাই ক্ষত্রিয় হয়ে যাক, কেউ বিধবা বিয়ের সুর তুলেছে। আবার কিছু মহাত্মা জাতি বর্ণের ভেদ মিটিয়ে ফেলতে চান। তা বলে এ সব তো আমরা মানতে পারি না। যার ইচ্ছে হয় মানুক, আমাদের পুরোনো চালই পছন্দ। বেঁচে থাকলে দেখবো বিলিতি গাছে এদেশে কেমন ফল ধরে। আমাদের বাপ-দাদারা তো চাষ বাসকেই সর্বোত্তম বলে গেছেন কিন্তু আজকাল সাহেবদের দেখাদেখি লোকে কল-কারখানার পিছনে ছুটছে। কিন্তু দেখো এমন দিন আসবে যখন

ইউরোপের লোকেরাই কল কারখানা ভেঙে সেখানে চাষ করবে। চাষীর সঙ্গে মিল মজুরের তুলনা হয়? যে দেশে বাইরে থেকে খাবার জিনিষ না এলে লোক না খেয়ে মরে সেটা আবার দেশ নাকি? যে দেশের জীবন এই উলটো নিয়মে চলে, সে দেশ আমাদের আদর্শ হতে পারে না। যতদিন পৃথিবীতে দুর্বল অসমর্থ দেশ থাকবে ততদিনই এই সব কল কারখানার মহত্ব। তাদের কাছে সস্তা মাল গছিয়ে সাহেবেরা আরামে দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু যখন এই জাতিরা জাগবে তখন ইউরোপের প্রাধান্য নষ্ট হবে। আমি বলছি না যে ইউরোপের কাছ থেকে কিছু শিখো না। না, আজ তারা পৃথিবীর মালিক, তাদের অনেক সদ্‌গুণ আছে। তাদের গুণগুলো ত্যাগ করা উচিত। আমাদের রীতিনীতি আমাদের অবস্থার অনুকূল, সেগুলো বদলানো উচিত নয়।

মদনসিংহ কথাগুলো একটু গর্বের সঙ্গে বললেন যেন একজন বিদ্বান নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন। বাস্তবপক্ষে এসব তাঁর শোনা কথা যার মর্ম তিনি একবিন্দুও জানেন না। পদ্মসিংহ কথাগুলো স্থির হয়ে শুনলেন, কোন উত্তর দিলে তর্ক বেড়ে যাবার ভয় ছিল। কোন বাদ যখন বিবাদের রূপ নেয় তখন তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। তর্কের সময় নম্রতা ও বিনয়ের প্রভাব প্রবল যুক্তির চেয়েও বেশি। তাই তিনি বললেন, 'তবে আমিই যাবো মুন্সী বৈজনাথকে কষ্ট দেবেন কেন? উনি গেলে এখানকার কাজের ক্ষতি হবে। চলুন মুন্সীজী আমরা বাইরে যাই। আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

মদনসিংহ—তা এখানেই বলো না কেন? চাও তো আমিই চলে যাচ্ছি।

পদ্ম—আজ্ঞে না, এমন কোন কথা নয়। আমি মুন্সীজীর সঙ্গে কয়েকটি প্রশ্নের আলোচনা করতে চাই। আচ্ছা ভাই বলুন তো, অপেরার দর্শকের সংখ্যা কত হবে? হাজার খানেক। আচ্ছা, আপনার মতে এদের মধ্যে কতো গরীব চাষী আর কতোজন জমিদার?

বৈজনাথ—চাষীরাই বেশির ভাগ, তবু জমিদার দু তিন শ'য়ের কম হবে না।

পদ্ম—আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন যে গরীব চাষীরা ধুতি বা কম্বল পেয়ে যত খুশি হবে নাচ দেখে তত খুশি হবে না?

বৈজনাথও তৈরী ছিলেন, বললেন—না, আমি তা মানি না। অধিকাংশ কৃষক দান নিতে চাইবে না। তারা জলসা দেখতে আসবে আর জলসা ভাল না হলে নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে।

পদ্মসিংহ মুস্কিলে পড়লেন। প্রশ্নের যে পরম্পরা ঠিক করেছিলেন তা কাজে লাগল না। বুঝলেন যে মুন্সীজী সাবধান হয়ে গেছেন। এবার অন্য পথ ধরতে হবে। তিনি বললেন—আপনি তো মানেন যে বাজারে আমরা সে সব মাল দেখতে পাই যার গ্রাহক থাকে, আর গ্রাহকের কম বেশি হওয়ার উপর মালের

কম বেশি হওয়া নির্ভর করে।

বৈজনাথ—আজ্ঞে হ্যাঁ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পদ্মসিংহ—তাহলে গ্রাহকের উপরেই বাজারে মালের আমদানি নির্ভর করে। যদি কেউই মাংস না খায়, তবে কি আর ছাগলের গলায় ছুরি পড়বে?

বৈজনাথ বুঝল যে উনি তাকে অন্য প্যাঁচে ফেলতে চাইছেন, কিন্তু প্রশ্নের মর্ম বুঝতে না পেরে বলল—হ্যাঁ, কথাটা সত্যি।

পদ্ম—যদি আপনি এটা মানেন, তবে আপনাকে এও মানতে হবে যে যারা বেশ্যাদের ডেকে আনে, টাকা দিয়ে তাদের বিলাসের জিনিষ কিনে দেয় আর তাদের ঠাটবাটের সঙ্গে থাকবার যোগাড় করে দেয়, তারা কি ছাগল-কাটা কসাইদের চেয়ে কম পাপের ভাগী হয়? উকিলদের যদি ঠাটের সঙ্গে টমটম হাঁকিয়ে যেতে না দেখতাম তবে কি আমি উকিল হতাম?

বৈজনাথ হেসে বলল—ভাই, তুমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তোমার কথা মানতে বাধ্য করছ। যাই হোক, তুমি যা বলছ তা কিন্তু সত্যি।

পদ্ম—আজ যে শত শত স্ত্রীলোক লজ্জা আর সতীত্ব খুইয়ে বাজারে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের সর্বনাশের জন্য আমরাই যে দায়ী এটা বুঝতে কি কষ্ট হয়? এই কুপথে গিয়ে হাজার হাজার পরিবারের যে সর্বনাশ হচ্ছে তার জন্যে ঈশ্বরের দরবারে আমাদেই দায়ী হতে হবে। যে প্রথা এত জঘন্য সেটা ত্যাগ করা কি উচিত নয়?

মদনসিংহ মন দিয়ে কথাগুলো শুনছিলেন। নৈতিক ও সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে নিরপেক্ষ হয়ে বিচার করবার মতো উচ্চশিক্ষা তাঁর ছিল না। তিনি ছিলেন সাধারণ বুদ্ধির মানুষ। কোন কথা বিশ্বাস হলে তর্কের খাতিরে তর্ক করে যাওয়া তাঁর স্বভাবে নেই। হেসে মুন্সী বৈজনাথকে বললেন—বলুন মুন্সীজী, এর কি জবাব দেবেন?

বৈজনাথ হেসে বলল—আমি তো উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না।

মদন—ভাই, কিছু বাজে তর্কও তো করো।

বৈজনাথ—কিছুদিন ওকালতি পড়লে তাও করতে পারতাম! এখন তো কোন উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না। আচ্ছা ভাই পদ্মসিংহ, তুমি আমার জায়গায় হলে কি উত্তর দিতে?

পদ্মসিংহ—(হেসে) ফল মিলুক না মিলুক উত্তর কিছু না কিছু নিশ্চয় দিতাম।

মদন—এ সব জলসায় গিয়ে মন যে চঞ্চল হয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যৌবনে যখন আমি এই সব জলসা থেকে ফিরতাম তখন মাসের পর মাস এই বেশ্যাদের রূপ-রঙ্গ হাব-ভাবের আলোচনা লেগে থাকত।

বৈজনাথ—ভাই, পদ্মসিংহের কথা মতোই কাজ হোক, তবে জলসার

নিশ্চয় বিলোবেন।

মদন—একটা কুঁয়ো তৈরি করে দিলে চিরকালের জন্যে নাম থাকবে। এদিকে বিয়ের হোম হবে, ওদিকে আমি কুঁয়োর ভিত্তিস্থাপন করবো।

২৭

বর্ষাকাল, মেঘে ঢাকা আকাশ। পণ্ডিত উমানাথ চুনারগড়ের কাছে গঙ্গার ধারে নৌকোর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। কয়েকটা গাঁয়ে ঘুরেছেন, এখন চুনারের কাছে একটা গাঁয়ে যাবার ইচ্ছে। খোঁজ পেয়েছেন ঐ গাঁয়ে এক ভালো পাত্র আছে। উমানাথের আজই অমোলা ফিরে যাবার ইচ্ছে ছিল। গাঁয়ে একটা ছোট ফৌজদারী মামলা হয়েছে, দারোগা সাহেব কাল তদন্তে আসবেন। কিন্তু নৌকো এখনও ওপারে। মাঝিদের উপর উমানাথের রাগ হচ্ছিল। বেশী রাগ যাত্রীদের উপর যারা ধীরে সুস্থে নৌকোয় উঠছে। তাদের ছুটে আসা উচিত যাতে উমানাথ শীঘ্র নৌকো পায়। অনেক দেরি হচ্ছে দেখে উমানাথ চেঁচিয়ে মাঝিদের ডাকল। মাঝিদের কানে পেঁছোবার মতো জোর কণ্ঠস্বরে ছিল না। ঢেউয়ের সঙ্গে খেলতে খেলতে সে স্বর জলে মিশে গেল।

এই সময় উমানাথ দেখল এক সাধু তার দিকে আসছে। মাথায় জটা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, এক হাতে গাঁজার লম্বা কলকে, অন্যহাতে লোহার ছড়ি, পিঠে বাঁধা হরিণের ছাল। নদীর ধারে এসে দাঁড়াল। সেও ওপারে যাবে।

উমানাথের মনে হল যে সাধুকে আগে কোথাও দেখেছে। ঠিক কোথায় তা মনে পড়ছে না। স্মৃতি যেন পরদায় ঢাকা পড়ে গেছে।

সাধু হঠাৎ উমানাথকে দেখে কাছে এসে প্রণাম করে বলল—মহারাজ, বাড়ীর কুশল তো? এখানে কি মনে করে?

উমানাথের চোখের উপর থেকে পরদা সরে গেল। এবার মনে পড়ল, আমরা রূপ বদলাতে পারি, গলার আওয়াজ বদলাতে পারি না। এ হচ্ছে গজাধর পাণ্ডে।

সুমনের বিয়ের পর উমানাথ কখনো সেখানে যায় নি। তাকে মুখ দেখাবার সাহস হত না। এখন গজাধরকে এই বেশে দেখে সে অবাক হয়ে গেল। তার মনে হল যে তার হয়তো ভুল হচ্ছে। ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল—আপনার নাম?

সাধু—আগে ছিল গজাধর পাণ্ডে, এখন আমি গজানন্দ।

উমানাথ—ওহো! তাই চিনতে পারছিলাম না। আমারো মনে হচ্ছিল যে আগে কোথাও দেখেছি, কিন্তু এই বেশভূষা দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেছি। তা ছেলেপিলে সব কোথায়?

গজানন্দ—আমি এখন ওসব মায়াজাল থেকে মুক্ত।

উমানাথ—তা সুমন কোথায় ?

গজানন্দ—দালমণ্ডীর কোঠায়।

উমানাথ বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে লজ্জায় মাথা নিচু করল। একটু পরে বলল—কিছুই বুঝতে পারছি না কি করে এমন হলো।

গজানন্দ—যেমন করে সংসারে প্রায়ই হয়ে থাকে। আমার ইতরামি ও নিষ্ঠুরতা আর চঞ্চল সুমনের ভোগের বিলাস দুই মিলে দুজনেরই সর্বনাশ ঘটাল। সে সব দিনের কথা মনে হলে বুঝতে পারি যে বড় ঘরের মেয়েকে বিয়ে করাই আমার ভুল। আর এর চেয়েও বড় ভুল হল যে তাকে যথোচিত আদর যত্ন করি নি। টাকা পয়সার অভাব প্রেম ভালবাসা দিয়ে পুষিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। তা না করে নিষ্ঠুরের মত ব্যবহার করলাম, খাওয়া পরার কষ্ট দিলাম। ঘরকন্নার কাজ সে ভালো জানত না, জানা সম্ভব ছিল না, তবু সে সব কাজে একটু দেরি হলেই গালমন্দ করেছি। আজ বুঝতে পারছি আমিই তার গৃহত্যাগের কারণ। আমি তার মূল্য বুঝিনি আর সেও আমাকে ভালবাসে নি। তবে সে আমায় ভক্তি করত। কিন্তু তখন আমি অন্ধ। অমন সুন্দরী স্ত্রী পেয়ে যেন সাত রাজার ধন পেয়েছি ভেবে মনে সংশয় আর ভয় এল। তাকে অবিশ্বাস করে তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে লাগলাম। তার উপর যে অত্যাচার করেছি সে কথা স্মরণ করলে মনে হয় যেন বিষ খেয়ে মরি। এখন সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করছি। সুমন চলে গেলে ঘরে দুদিনও টিঁকতে পারলাম না। গায়ে যেন কাঁটা ফুটত। শেষে এক মন্দিরের পূজারী হলাম। ফলে রান্নার হাত থেকে বাঁচলাম। মন্দিরে দু চারজন সজ্জন রোজ আসতেন। রামায়ণ ইত্যাদি পড়ে শোনাতাম। কখনো সাধু সন্তেরা আসতেন। তাঁদের জ্ঞান-গর্ভ কথায় আমার অজ্ঞানতা কাটতে লাগল। পূজারী হয়েছিলাম শুধু আরাম আর ভালো খাওয়ার লোভে। কিন্তু সাধুসঙ্গে জ্ঞানের সঙ্গে বৈরাগ্য এল। এখন গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে যতটা পারি লোকের উপকার করি। তা আপনি কি কাশী থেকে আসছেন ?

উমানাথ—না, আমি একটা গ্রাম থেকে আসছি। সুমনের ছোট বোনের জন্যে পাত্রের খোঁজ করছি।

গজানন্দ—এবার কিন্তু সুযোগ্য পাত্রে দেবেন।

উমানাথ—সুযোগ্য পাত্রের তো অভাব নেই, কিন্তু সামর্থ্যে কুলোয় না যে। সুমনের জন্যেও কি কম ছুটোছুটি করেছিলাম ?

গজানন্দ—সুযোগ্য বরের জন্য আপনার কত টাকা দরকার ?

উমানাথ—যৌতুকেই তো হাজার টাকা লাগবে। তা ছাড়া অন্যান্য খরচ তো আছেই।

গজাধর—আপনি কথা পাকা করুন, ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি আপনাকে ১০০০ টাকা দেব। এই সাধুবেশে লোক ঠকানো সোজা। এতে আমি লোকের অনেক উপকার করতে পারব। দু চার দিনের মধ্যে আপনার বাড়ী গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করব।

নৌকো আসায় দুজনেই তাতে উঠল। গজানন্দ মাল্লাদের সঙ্গে গল্প জুড়ল। কিন্তু উমানাথের চিন্তার শেষ নেই। তার মন বলছিল আমিই সুমনের সর্বনাশের কারণ।

২৮

পণ্ডিত উমানাথ সদন সিংহের সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা করে এলেন। গজানন্দের কাছ থেকে সাহায্য পাবার কথা তিনি জাহ্নবীকে জানালেন না। শুনলে পরে নিজের মেয়ের জন্যে ঐ টাকা সরিয়ে রাখতে সে জেদ ধরবে। আর জাহ্নবী জেদ ধরলে কোন কথা কানে তুলত না, তার মতে সায় দিতেই হত উমানাথকে।

এক হাজার টাকা বরপণ দেবার চুক্তিতে তিনি বিয়ে ঠিক করেছিলেন। এখন চিন্তা হল বরযাত্রীর জন্যে খরচটা কিভাবে জোগাড় করা যায়। কমপক্ষে আরও এক হাজার টাকা দরকার। কিন্তু কি করে জোগাড় হবে তা তিনি ভেবে পেলেন না। আনন্দের কথা এইটুকুই যে শান্তার ভাল ঘরে বিয়ে হবে, সে সুখে থাকবে আর গঙ্গাজলীর আত্মা তৃপ্তি পাবে।

শেষে ভেবে দেখলেন যে বিয়ের এখনও তিন মাস বাকী। যদি এর মধ্যে টাকার জোগাড় হয়ে যায় তো ভালো, নইলে বরযাত্রীদের সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়ে দেব। কোনও ছুতো ধরে রাগারাগি করবো, বরযাত্রীর দল অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যাবে। না হয় একটু বদনাম হবে, কিন্তু বিয়ে তো হয়ে যাবে আর মেয়েটাতো সুখে থাকবে। ঝগড়াটা এমন ফন্দী করে লাগাতে হবে যেন সব দোষটা বরপক্ষের ঘাড়ে পড়ে।

এক সপ্তাহ হল কৃষ্ণচন্দ্র জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এসেছেন কিন্তু তাঁর সঙ্গে বিয়ের কথা নিয়ে আলোচনা করবার সুযোগ উমানাথের হয়নি। কৃষ্ণচন্দ্রের সামনে যেতে তিনি লজ্জা পেতেন। কৃষ্ণচন্দ্রের স্বভাব বদলে গিয়েছে। গাম্ভীর্য ঘুচে গিয়েছে, লজ্জা সংকোচের বালাই নেই। শরীর ক্ষীণ হয়ে গেলেও মনে হয় তাঁর ভিতরে এক অদ্ভুত শক্তি রয়েছে। রাতে বিছানায় শুয়ে তিনি প্রায়ই 'হায়! হায়!' বলতেন; নিস্তব্ধ রাতে কখনও কখনও তাঁর গলায় গান বের হত, যার মর্মার্থ হচ্ছে—'আগুন লেগে আমার সাজানো বাগান পুড়ে গেল'। কখনও গাইতেন, 'কাঠ পুড়ে যে কয়লা হয় তা পুড়ে ছাই হয়। কিন্তু আমার

মত পাপী পুড়ে এমন কয়লা হল যে তা পুড়ে ছাই হল না।

তাঁর চোখের চঞ্চল ভাব দেখে জাহ্নবী পর্যন্ত তাঁর সামনে যেতে ভয় পেত।

শীতের দিনে চাষী বৌয়া মাঠে কাজ করতে যেত, কৃষ্ণচন্দ্রও সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করতেন। শ্বশুরবাড়ীর সম্বন্ধে তাঁর হাসিঠাট্টা করবার অধিকার ছিল বটে কিন্তু তাঁর হাসিঠাট্টার ভাবভঙ্গী এতই কুরুচিপূর্ণ আর অশ্লীল যে মেয়েরা লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে নিত আর ফিরে এসে জাহ্নবীর কাছে নালিশ করত। আসলে কৃষ্ণচন্দ্র কামানলে দগ্ধ হচ্ছিলেন।

অমোলা গ্রামে অনেক শিক্ষিত সজ্জনের বাস। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁদের কাছে যেতেন না। রোজ সন্ধ্যায় তাঁকে দেখা যেত ছোটলোকদের আড্ডায় বসে গাঁজা চরস টানছেন। তাদের কাছে নিজের জেল খাটার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছেন। মুখ দিয়ে যেন অশ্লীল কথার ঝরণা বয়ে চলেছে।

উমানাথ গ্রামের মধ্যে একজন গণ্যমান্য লোক। ভগ্নীপতির ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে উমানাথ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন যাতে উনি শীঘ্র গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যান।

অন্যের কথা দূরে থাক, শান্তারও নিজের বাপের কাছে যেতে ভয় আর সংকোচ হত। গাঁয়ের মেয়েরা যখন জাহ্নবীর কাছে কৃষ্ণচন্দ্রের ব্যবহারের নিন্দা করত তখন শান্তার বড় কষ্ট হত। তার বাবার কি হয়েছে তা শান্তা বুঝতে পারত না। গম্ভীর, বিচারশীল, দয়ালু, সচ্চরিত্র বাবা কি করে এমন বদলে গেল? শরীর তো সেই, কিন্তু সে আত্মা কোথায়?

এইভাবে একমাস কেটে গেল। উমানাথ মনে মনে গজরাতে থাকে—যার মেয়ের বিয়ে সে নিশ্চিন্তে বসে আছে তো আমার কি দায় পড়েছে যে অনর্থক ছোটাছুটি করি। কোথায় অন্যত্র গিয়ে দু পয়সা রোজগারের চেষ্টা করবে তা না, উলটে আমারই সুনামের ক্ষতি করছে।

২৯

একদিন উমানাথ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গীদের ধমক দিয়ে বলল—যদি কোন দিন ওঁর সাথে বসে তোমাদের চরস খেতে দেখি তো ভাল হবে না, মজা টের পাইয়ে দেব।

গাঁয়ে উমানাথের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সকলেই ভয় পেয়ে গেল। পরদিন কৃষ্ণচন্দ্র তাদের কাছে এলে তারা বলল—মহারাজ, আপনি এখানে আসবেন না। পণ্ডিত উমানাথ আমাদের উপর রাগ করবেন। না জানি কোন মামলায় ফাঁসিয়ে দেবেন, আমরা অনর্থক মারা যাব।

রাগে ফুলতে ফুলতে কৃষ্ণচন্দ্র উমানাথের কাছে এসে বললেন—মনে হচ্ছে

আমার এখানে থাকা তোমার পছন্দ হচ্ছে না।

উমানাথ—এ তো আপনারই বাড়ী, যতদিন আপনার ইচ্ছে ততদিন থাকবেন কিন্তু ঐ ছোটলোকগুলোর সঙ্গে মিশে আপনার আর আমার মর্য্যাদা নষ্ট করবেন না।

কৃষ্ণচন্দ্র—তবে কার কাছে যাবো? এখানে কোন্ ভদ্রলোক আমার সঙ্গে মিশতে চান? সবাই তো আমায় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে, আমার সেটা অসহ্য লাগে। বলতে পারো এঁদের মধ্যে কে ধর্মের পূর্ণ অবতার? সবাই দাগাবাজ, গরীব চাষীর রক্ত চুষে খাওয়া অত্যাচারী। আমি নিজেকে ওদের চেয়ে হীন মনে করি না। আমি আমার কর্মফল ভোগ করেছি, ওঁদের এখনও বাকী আছে। ওঁদের আর আমার মধ্যে এইটুকুই তফাৎ। ওরা এক পাপ ঢাকতে শতেক পাপ করছে। এভাবে দেখলে ওরা আমার চেয়ে বেশী পাপী। এই বকধার্মিকদের সামনে মাথা নিচু করে যেতে চাই না। আমি তাদের কাছেই যাই যারা আমার এই অবস্থা দেখেও আদর করে, নিজেদের আমার চেয়ে বড় মনে করে না, কাক হয়ে হাঁসের দলে মিশতে ছোটে না। যাক আমার ব্যবহারে তোমার যদি সম্মান হানি হয়, তবে জোর করে তোমার বাড়ীতে থাকতে চাই না।

উমানাথ—ঈশ্বরের দিব্যি, আমি এ সব ভেবে আপনাকে ওদের সাথে মিশতে মানা করিনি। আপনি জানেন আমাকে সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে মিশতে হয়, আপনার ব্যবহারে তাঁদের সামনে আমার মাথা হেঁট হয়ে যায়।

কৃষ্ণ—তা তুমি ওঁদের বলো যে কৃষ্ণচন্দ্র যত খারাপই হোক, তবু ওদের চেয়ে ভাল। আমিও অফিসার ছিলাম, অফিসারদের আচার ব্যবহারের জ্ঞান আমারও কিছু আছে। সবাই চোর! ছোটলোক, চোর, পাপীদের উপদেশ কৃষ্ণচন্দ্রের দরকার নেই।

উমানাথ—আপনি না হয় তাদের গ্রাহ্য করেন না কিন্তু আমাকে জীবিকার জন্যে তো ওঁদের কৃপাদৃষ্টির ওপর নির্ভর করতে হয়। আমি কি করে ওঁদের উপেক্ষা করি? আপনি তো থানার দারোগা ছিলেন। আপনি কি জানেন না এখানকার দারোগা আপনার ওপর নজর রেখেছেন? দুর্জনদের সাথে আপনার মেলামেশার খবর তিনি নিশ্চয় ওপরে জানাবেন আর সেই সঙ্গে আমারও সর্বনাশ হবে।

কৃষ্ণ—এখানে থানার দারোগা কে?

উমানাথ—সৈয়দ মসুদ আলম।

কৃষ্ণ—আরে! সেই এক নম্বরের বেইমানটা! পাক্কা বদমান। আমার কাছে হেড কনেস্টেবল হয়ে ছিল। আমি একবার ওকে জেল থেকে বাঁচিয়েছি। এখানে এবার এলে হয়; এমন শিক্ষা দেব যে ভুলবে না।

উমানাথ—আপনি যদি এইসব করেন তো দয়া করে আমাকে জড়াবেন না।

আপনার তো কোন ক্ষতি হবে না, আমিই মারা পড়বো।

কৃষ্ণচন্দ্র—কারণ তুমি মানী লোক আর আমার কিছু নেই। বন্ধু, কেন মিথ্যে মুখ খোলাচ্ছ? ধর্মের মুখোস এঁটে কত চাল মারবে? করছ তো দারোগার দালালী, আবার সম্মানের অহংকার!

উমানাথ—যত পাপীই হই না কেন, আমি আপনার যা উপকার করেছি তাতে আপনার মুখে এমন কথা শোভা পায় না।

কৃষ্ণ—তুমি আমার যা করেছ তাতে আমার সংসার উচ্ছন্নে গেছে। উপকারের নাম নিতে তোমার লজ্জা হয় না? তোমার উপকারের বর্ণনা আমি এখানে শুনেছি। আমার বৌকে মেরে ফেলেছ। একটা মেয়েকে জেনে শুনে এক লম্পটের হাতে তুলে দিয়েছ, আর একটা মেয়েকে দিয়ে ঝিয়ের মতো কাজ করাচ্ছ। মূর্খ স্ত্রীকে ধাপ্পা দিয়ে মোকদ্দমার নাম করে সব টাকা নিয়ে নিলে আর নিজের বাড়ীতে এনে তাদের দুর্গতির এক শেষ করেছ। আজ উপকার করবার বাহাদুরি দেখাচ্ছ!

কৃতঘ্নতায় মানুষ যত কষ্ট পায় তার তুলনা হয় না। উপকার করে কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশী না হলেও উপকার করার কথা ভেবে লোকে আনন্দ পায়, গৌরব বোধ করে। উমানাথের মনে হল সংসার কতো কুটিল। আমি এঁর জন্য মাসের পর মাস কাছারি আর তদবিরের কাজে ছুটেছি, উকীলদের খোশামোদ করেছি, আমলাদের মুখনাড়া খেয়েছি, নিজের টাকাও শয়ে শয়ে খরচ করেছি, তার এই প্রতিদান! তিনটে প্রাণীকে বছরের পর বছর প্রতিপালন করলাম, সুমনের বিয়ের জন্যে মাসের পর মাস ছোটাছুটি করেছি আর শান্তার বিয়ের জন্যে দিন রাত ঘর বার করছি। ঘোরাঘুরিতে পায়ে কড়া পড়েছে, টাকার চিন্তায় অস্থির হচ্ছি আর এই তার ফল! সংসার কতই কুটিল! এখানে ভালো করলেও বদনাম হয়। এই ভেবে তার চোখে জল এসে গেল। বললে—ভাই সাহেব, যা করেছি ভালো হবে ভেবেই করেছি কিন্তু আমার কপালে যশ নেই। ঈশ্বরের যদি ইচ্ছাই এই যে আমার সব কাজ বিফল হবে তবে তাই সই। আমি আপনার সর্বস্ব লুটে নিয়েছি, এখন যে সাজা উচিত মনে হয় তাই দিন, আর কি বলবো?

উমানাথের মনোগত ভাব হচ্ছে যে যা হবার তা হয়ে গিয়েছে এবার আমায় রেহাই দাও। শান্তার বিয়ের জোগাড় করো। আবার ভয় হলো যে রাগ করে আবার শান্তাকে নিয়ে চলে না যায়। তাই চুপ করে থাকলেন। দুর্বলের রাগ দেখে উদার চরিত্রের লোকের মনে করুণা জাগে। ভিখারীর গাল খেয়ে সজ্জন ব্যক্তি চুপ করে থাকা ছাড়া আর কি করতে পারে?

উমানাথের নীরবতায় কৃষ্ণচন্দ্রও শান্ত হলেন, তবে আর কোন কথা হল না। দুজনেই চিন্তায় মগ্ন হলেন যেন দুটো কুকুর ঝগড়া করার পর মুখোমুখি

বসে আছে।

উমানাথ ভাবছিল যে চুপ করে থেকে ভালই করেছি, না হলে সংসারে আমার বদনাম হত। কৃষ্ণচন্দ্র ভাবছিলেন যে পুরোনো কথা তোলা অন্যায় হয়েছে। অন্যায় ক্রোধের ফলে ঘুমন্ত আত্মা জেগে ওঠে। কৃষ্ণচন্দ্রও নিজের কর্তব্য বুঝতে পারলেন। অনুচিত রাগের জন্যই অকর্মণ্যতার ভাব কেটে গেল। সন্ধ্যায় তিনি উমানাথকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি শান্তার বিয়ে ঠিক করেছ না?

উমানাথ—হ্যাঁ, চুনারে, পণ্ডিত মদনসিংহের ছেলের সঙ্গে।

কৃষ্ণ—বড়লোক মনে হচ্ছে। বরপণ কত দিতে হবে?

উমানাথ—এক হাজার।

কৃষ্ণ—আরও অতো টাকা লাগবে?

উমা—হ্যাঁ, তা তো বটেই।

কৃষ্ণচন্দ্র স্তব্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—এ টাকার জোগাড় কি করে হবে?

উমা—ভগবান কোনও উপায় করবেন। আমার কাছে এক হাজার আছে, বাকী এক হাজারের জন্যই চিন্তিত আছি।

কৃষ্ণচন্দ্র গ্লানিভরা স্বরে বললেন—আমার অবস্থাতো দেখতেই পাচ্ছো। বলতে বলতে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

উমা—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি সব যোগাড় করে নেব।

কৃষ্ণ—পরমাত্মা এজন্যে তোমার ভালো করবেন। ভাই, আমার কড়া কথায় কিছু মনে করো না। আমি আর আমাতে নেই। যন্ত্রণায় পাগল হয়ে গিয়েছি। ঐ নরকে দেবতাও রাক্ষস হয়ে গেলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এই ভারি বোঝা সামলাবার ক্ষমতা কই আমার? তুমি আমায় মুক্তি দিয়েছ, শেষরক্ষাটা তুমিই কর। অবশ্য তোমার ওপর সব ভার দিয়ে আমি কুঁড়ের মত বসে থাকব, সেটা ভাল দেখায় না। কোথাও গিয়ে দু পয়সা রোজগারের চেষ্টা করি। আমি কাল বেনারস যাব। জানাশোনা লোক সেখানে আছে বটে, তবে তাদের কাছে যাবো না। সুমনের ঘরটা কোন মহল্লায়?

উমানাথের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বললে—বিয়ে পর্যন্ত আপনি এখানেই থাকুন। পরে যেখানে ইচ্ছে হবে যাবেন।

কৃষ্ণচন্দ্র—না, আমি কালই যাই, বিয়ের এক সপ্তাহ আগে ফিরে আসব। দু চার দিন সুমনের বাসায় থেকে কোন চাকরী ঠিক করে নেব। কোন মহল্লায় থাকে?

রাতে খাওয়ার সময় কৃষ্ণচন্দ্র শান্তাকে সুমনের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলেন। শান্তা উমানাথের ইসারা বুঝতে না পেরে পুরো ঠিকানা বলে দিল।

৩০

শহরের মিউনিসিপ্যালিটির মোট সদস্য সংখ্যা ১৮। তার মধ্যে ৮ জন মুসলমান, বাকী ১০ জন হিন্দু। সুশিক্ষিত সদস্যের সংখ্যা বেশী ছিল বলে শর্মাজীর আশা ছিল যে শহর থেকে বেশ্যাদের সরিয়ে দেবার প্রস্তাব স্বীকৃত হবে। তিনি সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের ভয় দূর করেছিলেন কিন্তু এমন কয়েকজন সদস্য ছিলেন যাঁদের কাছ থেকে বিরোধের সম্ভাবনা ছিল। তাঁরা ধনী, প্রভাবশালী বড় ব্যবসায়ী। তাই শর্মাজীর ভয় ছিল যে অন্য সদস্যরাও তাঁদের প্রভাবে প্রভাবিত হতে পারেন।

বিরোধীদলের নেতা হিন্দুদের মধ্যে ছিলেন শেঠ বলভদ্র দাস আর মুসলমানদের মধ্যে হাজী হাসিম। যতদিন বলভদ্র দাস এই আন্দোলনের হর্তাকর্তা ছিলেন ততদিন এঁরা এ বিষয়ে মাথা ঘামান নি। কিন্তু যখন থেকে পদ্মসিংহ এবং অন্য সদস্যেরা এই আন্দোলনে ভাগ নিলেন তখন শেঠজীর আর হাজী সাহেবের টনক নড়ল তাঁরা বুঝলেন শীঘ্রই এ কথা সভায় উঠবে। তাই দুজনেই কোন দলে থাকবেন তা স্থির করতে তৎপর হয়ে উঠলেন। প্রথমে হাজী সাহেব মুসলমান সদস্যদের একত্র করলেন। জনতার উপর হাজী সাহেবের যথেষ্ট প্রভাব থাকায় তাঁকেই মুসলমান সদস্যদের নেতা বলে মনে করা হত। বাকী ৭ সদস্যের মধ্যে মৌলানা তেগ আলী এক ইমামবাড়ার দেখাশোনা করতেন। মুন্সী আবুল বক্কা ছিলেন আতর আর তেল কারখানার মালিক। বড় বড় শহরে তাঁর কয়েকটা দোকান ছিল। মুন্সী আব্দুল লতীফ এক বড় জমিদার, তবে প্রায়ই শহরে বাস করেন কবিতা ভালবাসেন, নিজেও একজন কবি। শাকির বেগ ও শরীফ হাসান উকীল। তাঁরা যথেষ্ট সমাজ সচেতন, সৈয়দ শফরৎ আলী ডেপুটি কালেক্টার ছিলেন, এখন পেনসন পান; আর খাঁ সাহেব শোহরৎ খাঁ একজন প্রসিদ্ধ হাকিম। এঁরা দুজন সভা সমিতিতে প্রায়ই যেতেন না তবে উদারতা আর বিচার বুদ্ধিতে তাঁরা কম ছিলেন না। দুজনেই ধার্মিক স্বভাবের, সমাজে তাঁদের বেশ সম্মান।

হাজী হাসিম বললেন—দেশোয়ালী ভাইদের নতুন চাল দেখলেন? এঁদের বুদ্ধি খেলেও বটে! চোরা গোপ্তা মার এঁদের কাছেই শিখতে হয়! এঁদের চালচলন দেখে আমার এমন ধারণা হয়েছে যে এঁদের সদিচ্ছা স্বীকার করলে যদি স্বর্গলাভও হয়, তো আমি তা স্বীকার করতে রাজী নই।

অবুল-বক্কা বললেন—কিন্তু খোদার দয়ায় আমরাও নিজেদের ভালোমন্দ বুঝতে শিখছি। এ সব শুধু আমাদের সংখ্যা কম করবার চেষ্টা। বাঈজীদের শতকরা ৯০ জন মুসলমান যারা রোজা রাখে, মুসলমানী আচার ব্যবহার মেনে

চলে। তাদের ভালোমন্দের বিচার খোদা করবেন। আমাদের তো তাদের সংখ্যাই দরকার।

তেগ আলী—কিন্তু ওদের সংখ্যা কি এত বেশী যে আমাদের মোট ভোটের উপর তার কোনও প্রভাব পড়তে পারে?

অবুল বফা—কম বেশী কিছু প্রভাব তো পড়বেই। দেশোয়ালী ভাইদের ব্যাপার দেখুন, ওঁরা ডোমদেরও দলে টানবার চেষ্টা করছেন। এদিকে তো ছায়া মাড়াতেও ঘৃণা, জানোয়ারেরও অধম মনে করেন কিন্তু পলিটিক্যাল সুবিধার জন্যে নিজেদের জাতের করে রেখেছেন। এই ডোম, ভাঙ্গী, পাশী প্রভৃতি জাতের লোকেরা অপরাধপ্রবণ জাত। চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি হচ্ছে এদের পেশা। কিন্তু যেই এদের হিন্দুদের থেকে আলাদা করবার চেষ্টা হয় অমনি তাঁরা জ্বলে ওঠেন আর বেদ পুরাণ ঝেড়ে এক জাতির প্রমাণ লেগে যান। এ বিষয়ে আমাদের উচিত হচ্ছে এঁদের দেখে শিক্ষা নেওয়া।

সৈয়দ শফকত আলী খাঁ ভেবে চিন্তে বললেন—এই দুর্বৃত্ত স্বভাব লোকেদের থাকার জন্য গভর্ণমেণ্ট শহরের একটা বিশেষ ভাগ আলাদা করে রেখেছেন। সেখানে পুলিশ সবসময় নজর রাখে। চাকরিসূত্রে আমি কাজে বেরিয়ে ওদের ভালো মন্দ কাজের রিপোর্ট লিখতাম। আমার মনে হয় কোন দায়িত্বশীল হিন্দু এদের বিরুদ্ধে কিছু বলেন নি। আমি কিন্তু চুরি ডাকাতির চেয়ে এদের দিয়ে ঘরের কাজ করানো বেশী বিপজ্জনক মনে করি। যে ডোমনী ঝিয়ের কাজ করে তাকে তাদের সমাজ একঘরে করে দেয়। এই ডোমদের যদি পয়সা থাকে তবে তারাও এই রূপের হাটে সওদা করে। এই বাঈজীদের করুণা করলে যদি খোদা স্বর্গ পাইয়ে দেন তবে আমি নরকে যাওয়াই পছন্দ করবো। ওদের ভোট নিয়ে দেশের বাদশা হতেও আমি রাজী নই। আমার তো মনে হয় যে শহরের কেন্দ্র থেকে নয়, একেবারে শহর থেকেই এদের তাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

হকিম শোহরত খাঁ বললেন—মশাই আমার ক্ষমতা থাকলে এদের সারা হিন্দুস্তান থেকে সরিয়ে একটা আলাদা দ্বীপে পাঠিয়ে দিতাম। এ বাজারের খদ্দেরদের সঙ্গে আমার প্রায়ই আলাপ আলোচনা হয়। আমার মনে হয় কলেরা, প্লেগের চেয়েও এরা ভয়াকহ; কলেরা দু ঘন্টায় শেষ করে, প্লেগ ভোগায় দু দিন আর এই নরকের কীটগুলো কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে মেরে ফেলে। মুন্সী অবুল বফা সাহেব এদের স্বর্গের পরী বলে মনে করেন কিন্তু এরা হচ্ছে কালনাগিনী যাদের চোখ থেকে বিষ ঝরছে। এরা হচ্ছে বিষাক্ত স্রোতের ঝরণা। ওদের জন্য নিরীহ ভদ্র ঘরের বৌরা কেঁদে কেঁদে মরে। এদের জন্যে কতো ভদ্রলোকের সর্বনাশ হয়েছে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে বেশীর ভাগ বাঈজীরা হচ্ছে মুসলমান।

শরীফ হসন বললেন—ওরা মুসলমান বলে দোষের কিছু নেই।

আফসোসের কথা হচ্ছে এই যে ইসলাম ধর্ম এদের সুপথে আনবার জন্য কোনও চেষ্টা করে না। হিন্দুদের দেখাদেখি সমাজ থেকে এদের দূর করে দিয়েছে। কোন মেয়ে কোন কারণে একবার বিপথে গেলেই ইসলাম তার দিকে আর তাকায় না। অবশ্য আমাদের মৌলানা সাহেব সবুজ পাগড়ী বেঁধে, চোখে সুর্মা লাগিয়ে ফিটনে চড়ে তাদের ধর্মীয় তৃপ্তির জন্য সেখানে হাজির হন, তাদের ঘরে খানা খান, তাদের পান দানি থেকে আতর দেওয়া পান খান আর তাদের গড়গড়ায় সুগন্ধি তামাকের ধোঁয়া ওড়ান। ধর্ম-সংস্কারের সব শক্তিটুকু এখানেই শেষ হয়ে যায়। নিজের খারাপ কাজের জন্যে লজ্জিত হওয়া মানবোচিত গুণ। প্রথমে না হলেও পরে নেশা কেটে গেলে নিজেদের অবস্থা বুঝে এই মেয়েদের আফসোসের অন্ত থাকে না, কিন্তু সে অনুতাপ নিষ্ফল হয়। পেট চালানোর অন্য উপায় না দেখে নিজেদের কচি মেয়েদের দিয়ে ধনী লোকদের প্রলুব্ধ করে, আর এই ভাবেই এই ধারা চলে আসছে। এই কচি মেয়েদের যদি ঠিক ভাবে বিয়ে দিয়ে এদের রক্ষা করবার চেষ্টা করা যায়, তবে শতকরা ৭৫ জন বাঈজী সানন্দে স্বীকৃতি দেবে। নিজে যত মন্দই হোক, তবু প্রত্যেকে চায় যে তার সন্তান ভালো হয়ে সৎপথে চলুক। বাঈজীদের শহর থেকে সরিয়ে দিলেই তারা শুধরে যবে না। খরচের প্রশ্ন তুলে প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে আমি রাজী আছি। কিন্তু রাজনৈতিক সুবিধার জন্যে এর বিরোধিতা করতে পারি না।

তেগ আলী—মশাই, একটু সামলে কথা বলুন। কাফের বলে বদনাম হতে পারে। আজকাল রাজনীতির যুগ চলছে; ন্যায়, সত্য এ সব নাম করবেন না। যদি আপনি মাস্টার হোন তো হিন্দু ছেলেদের ফেল করান। তহশীলদার হলে হিন্দুদের উপর ট্যাক্স বসান; বিচারক হোন তো হিন্দুদের সাজা দিন। পুলিসের দারোগা হলে হিন্দুদের নামে মিথ্যে মামলা দায়ের করুন। তদন্ত করতে গেলে হিন্দুদের বয়ান মিথ্যে করে লিখুন। যদি চোর হন তো হিন্দুর ঘরে চুরি ডাকাতি করুন; নিষিদ্ধ প্রেমের সখ থাকলে হিন্দুর সুন্দরী মেয়ে পাচার করুন—তবেই আপনি হবেন জাতির সেবক, জাতির দরদী, জাতির কাণ্ডারী—সব কিছু।

হাজি হাসিম বিড়বিড় করে কি সব বলতে লাগলেন। মুন্সী অবুল বফা ভুরু কুঁচকে বসে রইলেন। তেগ আলীর তলোয়ারের ঘায়ে তাঁরা ঘায়েল হলেন। অবুল বফা কিছু বলবার উপক্রম করছিলেন কিন্তু শাকির বেগ বলে ফেললেন—বন্ধুগণ, এখন ঝগড়া ঝাটির সময় নয়। ঘরোয়া পরিবেশে এক বিষয়ে পরামর্শ করবার জন্যে আমরা এখানে এসেছি। আমরা যদি কটূক্তি করতে থাকি তবে তার ফল ভাল হবে না। আমার মনে হয় প্রস্তাবটা উড়িয়ে দেবার মতো নয়। আপনারা বাড়ী তৈরি করাবার সময় ময়লা জলের নর্দমার কথা নিশ্চয় দরকারী মনে করেন। যদি এই নর্দমা না থাকে তো অল্পদিনেই দেওয়ালের ভিত নড়ে

থাকে। বাঈজীদেরও সমাজের ময়লা জলের নর্দমা মনে করা উচিত আর এই নর্দমা যেমন বাড়ীর প্রকাশ্য স্থানে থাকে না তেমনি এদেরও শহরের মাঝখান থেকে সরিয়ে দূরে কোথাও আস্তানা দেওয়া উচিত।

মুন্সী অবদুল বফা প্রথম বাক্য শুনে খুশি হলেও পরে নর্দমার উপমা শুনে হতাশ হলেন। অব্দুল লতীফ এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। হাজী হাশিম নিরাশ হয়ে তাঁকে বললেন—জনাব, আপনিও কিছু বলবেন কি? বন্ধুদের বক্তৃতার জোয়ারে আপনিও ভেসে যান নি তো?

অব্দুল লতীফ বললেন—জনাব, প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে হবার বালাই আমার নেই। আমি নিজের মতেই চলি, আমি তো এ সবের কিছুই বুঝছি না। যে কথার মাথামুণ্ড নেই তাই নিয়ে দেখছি জ্ঞানীরা আকাশ-পাতাল এক করে ফেলছেন বক্তৃতা দিয়ে। সাবান, চামড়া, কেরোসিন তেলের দোকান থাকতে দিতে আপনাদের আপত্তি নেই। কাপড়, বাসন এ সবের দোকান চকে থাকলে আপনাদের চোখে বেমানান ঠেকে না। সুন্দর জিনিষ কি কেউ ঘরের কোণে লুকিয়ে রাখে? বাগানের শোভা কেমন হবে যদি ঝাউয়ের সারি শেষপ্রান্তে থাকে আর গোলাপ গাছকে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়? বেড়াবার পথের দু'ধারে নিম আর কাঁঠাল গাছ থাকলে কেমন দেখায়? দু' ধারের গাছে বসে কাক চিল চ্যাঁচাবে আর বুলবুল ঝোপের আড়ালে বসে করুণ রাগিনী ভাঁজবে? আমি তো এ ব্যাপারের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। আমার তো মনে হয় বিষয়টা আলোচনারই যোগ্য নয়।

হাজী হাশিমের মুখে মুচকি হাসি, আবদুল বফার চোখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অন্য মহাশয়েরা দার্শনিক ভঙ্গীতে হাস্যকর বক্তৃতা শুনলেন, শুধু তেগ আলীর এত সহ্যগুণ ছিল না। তীব্রভাবে বললেন—তবে আর কি! এবার বোর্ডে এই প্রস্তাব করা হোক যে মিউনিসিপ্যালিটি চকের ঠিক মাঝখানে ধুমধাম করে মীনাবাজার বসাবে আর যাঁরা সে বাজারে বেড়াতে যাবেন গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে তাঁদের সৌন্দর্যপ্রেমিক উপাধি দেওয়া হবে। আমার তো মনে হয় অনেকেই এই প্রস্তাবের সমর্থন করবেন আর যিনি এই প্রস্তাব করবেন তাঁর নাম অমর হয়ে যাবে। তাঁর মৃত্যুর পর তার কবরে উর্স উৎসব হবে আর তিনি কবরে শুয়েই সৌন্দর্য উপভোগ করে সুমধুর গান শুনবেন।

মুন্সী অব্দুল লতিফের মুখ লাল হয়ে উঠল। হাজী হাশিম দেখলেন যে কথায় কথা বেড়ে যাচ্ছে, তাই বললেন—আমি তো এতদিন নীতি বলে একটা জিনিষ আছে জানতাম কিন্তু আজ দেখছি সেটা একটা মিথ্যা ধারণা। বেশি দিনের কথা নয় আপনারা সকলে ইসলাম ধর্মের এক ডেপুটেশন নিয়ে গিয়েছিলেন, মুসলমান কয়েদিদের ধর্মীয় সুযোগ সুবিধার বিষয় নিয়ে আলোচনার সময় আপনারাই অগ্রণী হয়েছিলেন, অবশ্য আমার স্মৃতি শক্তি

যদি ঠিক থাকে। কিন্তু আজ দেখছি আপনারা বদলে গেছেন। যাকগে আপনাদের বিচার যতই বদলে যাক না কেন আমার বিশ্বাস বদলায় না। আমি তো ঠিক করেছি যে দেশোয়ালি ভাইরা যে প্রস্তাবই করুক আমি সবসময় তার বিরোধিতা করব। এতে আমার কথার কখনও নড়চড় হবে না।

আবদুল বফা বললেন—আলি হাজী, আমি রাতে সূর্য উঠবে বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু হিন্দুদের সৎ উদ্দেশ্যে বিশ্বাস করতে পারি না।

সৈয়দ শফকত অলী বললেন—হাজী সাহেব, আমাদের সুবিধাবাদী ও নীতিহীন ভেবে আপনি সুবিচার করছেন না। আমাদের নীতি আগে যা ছিল এখনও তাই আছে আর চিরকাল তাই-ই থাকবে, তা হচ্ছে ইসলামের প্রতিষ্ঠা অক্ষুন্ন রাখা আর নিজেদের মধ্যে মিলে জুলে থাকা। আর আমাদের সুবিধের জন্যে যদি দেশোয়ালি ভাইদের ক্ষতি হয় তো আমার তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু যাতে ওদের সঙ্গে আমাদেরও সমান সুবিধে হয় তার বিরোধিতা করা আমার বুদ্ধির বাইরে। চোখ বুজে বিরোধিতা করতে আমি রাজি নই।

রাত অনেক হয়েছে দেখে সভাভঙ্গ হল। আলোচনায় বিশেষ কোন ফল হল না। কারুরই মত পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা গেল না। হাজী হাশিমের জয়লাভের নিশ্চিত বিশ্বাসে সন্দেহ দেখা দিল।

প্রস্তাবের বিরোধিতা করবার জন্য মুসলমানদের এক আলোচনা সভা হয়েছে শুনে হিন্দু মেম্বারদের কান খাড়া হল। মুসলমানদের কাছে যে প্রত্যাশা ছিল তা ভেঙে গেল। হিন্দু সভ্য মোট দশ জন। শেঠ বলভদ্রদাস ছিলেন চেয়ারম্যান। ডক্টর শ্যামাচরণ ভাইস চেয়ারম্যান। লালা চিমনলাল ও দীনানাথ তিওয়ারী ব্যাপারীদের নেতা ছিলেন। পদ্মসিংহ ও রুস্তমভাই উকিল, রমেশ দত্ত কলেজের অধ্যাপক, লালা ভগতরাম ঠিকেদার, প্রভাকর রাও 'জগৎ' নামে হিন্দী পত্রিকার সম্পাদক আর কুমার অনিরুদ্ধ বাহাদুর সিংহ জেলার সব চেয়ে বড় জমিদার ছিলেন। চকের অধিকাংশ দোকানের মালিক বলভদ্রদাস আর চিমনলাল। দালমণ্ডীতে দীনানাথের অনেক বাড়ী। এই তিনজন এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ছিলেন। লালা ভগতরামের ঠিকেদারি চলত চিমনলালের আর্থিক সহায়তায়। তাই তিনিও ছিলেন এঁদের দলে। প্রভাকর রাও, রমেশ দত্ত, রুস্তম ভাই ও পদ্মসিংহ প্রস্তাব সমর্থন করেন। ডক্টর শ্যামাচরণ ও কুমার সাহেবের মতামত সম্বন্ধে কেউ নিশ্চিত নন। দু পক্ষই তাঁদের স্বপক্ষে আনবার আশা রাখেন। তাঁদের উপরই দু পক্ষের হারজিত নির্ভর করছে। পদ্মসিংহ তখনও বিয়ে বাড়ী থেকে ফেরেন নি।

বলভদ্রদাস ভাবলেন নিজের দল ভারী করবার এই উপযুক্ত সময় আর সেই জন্য সব হিন্দু মেম্বারদের নিজের বৈঠকখানায় নিমন্ত্রণ করলেন। এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ডক্টর সাহেব আর কুমার বাহাদুরকে নিজের দলে টানা। প্রভাকর রাও ছিলেন গোঁড়া মুসলমান-বিদ্বেষী। তাঁরা প্রস্তাবটাকে হিন্দু-মুসলমানের বিবাদের রূপ দিয়ে প্রভাকর রাওকেও দলে টানতে চাইছিলেন।

দীনানাথ তিওয়ারী বললেন—আমাদের মুসলমান ভাইরা এ বিষয়ে খুব উদারতা দেখিয়েছেন কিন্তু এতে এক গূঢ় রহস্য আছে। ওঁদের চাল হচ্ছে 'এক ঢিলে দু পাখী মারা'। একদিকে সমাজ সংস্কার করবার সুনাম, অন্য দিকে হিন্দুদের ক্ষতি করবার ছুতো। এ রকম সুযোগ ওঁরা কখনও কি ছেড়েছেন ?

চিমনলাল—পলিটিক্সের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই, ওর ধারেও আমি যাই না; কিন্তু আমাদের মুসলিম ভাইরা যে এবার আমাদের টুঁটি চেপে ধরেছে তা বলতে আমার একটুও দ্বিধা নেই। দালমণ্ডী আর চকের বেশীর ভাগ দোকান হিন্দুদের। যদি বোর্ড এ প্রস্তাব মেনে নেয় তবে হিন্দুদের প্রায় সর্বস্বান্ত হতে হবে। চোরা গোপ্তামার মুসলমনেদের কাছ থেকেই শিখতে হয়। কিছুদিন আগেই তো সুদ নেওয়া নিয়ে হিন্দুদের উপর আক্রমণ চালিয়েছিল। সে চাল চলল না দেখে এই উপায় বের করেছে। দুঃখের কথা এই যে আমাদের কয়েকজন হিন্দুভাই ওদের হাতে কাঠপুতুল হয়ে পড়েছেন। তাঁরা বুঝছেন না যে তাঁদের জন্যে তাঁদের জাতের কি সর্বনাশ হচ্ছে।

স্থানীয় কাউন্সিলে যখন সুদের প্রস্তাব উঠেছিল তখন প্রভাকর রাও তার ঘোর বিরোধিতা করেছিলেন। চিমনলাল সে কথার উল্লেখ করে এবং বর্তমান বিষয়টি আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে প্রভাকর রাওকে দলে টানবার চেষ্টা করলেন। প্রভাকর রাও হতাশ হয়ে রুস্তম ভাইয়ের দিকে তাকালেন —যেন বলতে চাইছেন যে এঁরা আমার গলায় ব্রহ্মফাঁস লাগাচ্ছেন, আপনি কোন রকমে আমায় উদ্ধার করুন।

রুস্তমভাই ছিলেন স্পষ্টবাদী, নির্ভীক পুরুষ। চিমনলালের কথার উত্তরে তিনি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—বড়ই দুঃখের কথা যে এক সামাজিক প্রশ্নকে আপনারা হিন্দু মুসলমানের ঝগড়ার রূপ দিতে চাইছেন। সুদের প্রশ্নেও আপনারা এই রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। এই সব রাষ্ট্রীয় বিষয়ে বাধা দিয়ে কিছু হিন্দু ধনী ব্যবসায়ীর লাভ হয় বটে, কিন্তু সমগ্র রাষ্ট্রের বুকে যে কতটা আঘাত লাগে তা ধারণা করা শক্ত। সন্দেহ নেই যে এ প্রস্তাব স্বীকৃত হলে হিন্দু ব্যবসায়ীদের বেশী ক্ষতি হবে তবে মুসলমানদের উপরেও এর প্রভাব পড়বে। চক আর দালমন্ডীতে মুসলমানের দোকানও কম নেই। কাজেই এর বিরোধিতা করবার জন্যে মুসলমান ভাইদের সততায় সন্দেহ করা উচিত

নয়। তাঁরা সার্বজনিক উপকারের জন্যেই এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। যদি এতে হিন্দুদের বেশী ক্ষতি হয় তো সেটা অন্য ব্যাপার। আমার বিশ্বাস যে এতে যদি মুসলমানদের বেশী ক্ষতি হত তবুও তাঁরা এটা সমর্থন করতেন। আপনি যদি সরল মনে বিশ্বাস করেন যে প্রস্তাবটা এক সামাজিক কুপ্রথা দূর করবার জন্যে তোলা হয়েছে তাহলে সেটা মেনে নিতে কোন বাধা থাকা উচিত নয়—তাতে যতই আর্থিক ক্ষতি হোক না কেন। আচরণের তুলনায় অর্থের কোনও মহত্ব থাকা উচিত নয়।

প্রভাকর রাও জোর পেয়ে বললেন—আমিও এই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। যদি সামান্য আর্থিক ক্ষতি হলে একটা কুপ্রথা দূর হয় তবে সে ক্ষতি হাসিমুখে সহ্য করা উচিত। আপনারা জানেন আমাদের সরকার চীন দেশে আফিম চালান দিয়ে কতো লাভ করতেন। ১৮ কোটির চেয়ে বেশী হবে। কিন্তু চীন থেকে আফিম খাওয়ার কুপ্রথা দূর করতে সরকার এই ভীষণ ক্ষতি মেনে নিতে একটুও ইতস্তত: করেন নি।

কুমার অনিরুদ্ধ সিংহ প্রভাকর রাওকে জিজ্ঞাসা করলেন—মশাই, আপনি তো পত্রিকা সম্পাদনায় মগ্ন থাকেন। জীবনে আনন্দলাভের সময়ই কোথায় আপনার? কিন্তু আমাদের মতো উদ্দেশ্যহীন লোকেদেরও তো আনন্দের উপকরণ চাই। বিকেলটাতে পোলো খেলে কেটে যায়। দুপুরে ঘুমিয়ে আর সকালে অফিসারদের সঙ্গে ভেট মুলাকাতে না হয় ঘোড়ায় চড়ে কাটে, কিন্তু সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত বসে বসে কি করবো? আজ আপনারা প্রস্তাব করছেন বেশ্যাদের শহর থেকে বের করে দিতে হবে, কাল আপনারা বলবেন মিউনিসিপ্যালিটির ভিতরে বিনা অনুমতিতে নাচ, গান, মুজরা হবে না, তাহলে আমাদের তো এখানে থাকাই কঠিন হয়ে পড়বে।

প্রভাকর রাও মুচকি হেসে বললেন—পোলো খেলা আর নাচ গান ছাড়া কি সময় কাটাবার অন্য উপায় নেই? একটু পড়াশোনা করুন।

কুমার—আমাদের পড়া মানা। বইয়ের পোকা হওয়া আমাদের দরকার হয় না। জীবন সফল করতে আমাদের যা শেখা দরকার তা আমাদের শেখা হয়ে গিয়েছে। আমি ফ্রান্স বা স্পেনের যে নাচ জানি তার নামই হয়তো আপনি শোনেন নি। পিয়ানোতে বসিয়ে দেখুন, এমন বাজাবো যে মোজার্ট লজ্জা পাবেন। ইংরেজী আদব কায়দা ভালোভাবেই জানা, কোন সময়ে শোলার হ্যাট পরতে হয়, কখন পাগড়ী বাঁধতে হয় সে সব জ্ঞান আছে। বইও পড়ি। ঘরে কতো আলমারী বই সাজানো আছে কিন্তু তাতে আটকে থাকি না। আপনাদের এই প্রস্তাবে তো আমরা মরে ভূত হয়ে যাবো।

কুমার সাহেবের ব্যঙ্গ কৌতুক ভরা কথায় দু পক্ষেরই সমাধান হয়ে গেল।

ডক্টর শ্যামাচরণ কুমার সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন—আমি এ বিষয়ে

কাউন্সিলে একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছি। গভর্নমেন্টের কাছ থেকে উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত আমি নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারি না।

এই বলে ডক্টর সাহেব নিজের প্রশ্নটা পড়ে শোনালেন।

রমেশ দত্ত বললেন—গভর্নমেন্ট এ সব প্রশ্নের কোন উত্তর দেবেন না।

ডক্টর—উত্তর দিক না দিক, প্রশ্নটা তো করা হবে। এ ছাড়া আমরা আর কি করতে পারি?

শেঠ বলভদ্রদাসের বিশ্বাস হলো যে তাঁর দলই জিতবে, ডক্টর সাহেবকে ছেড়ে ১৭ জনের মধ্যে ৯ জন তাঁর পক্ষে হল। অতএব সভাপতির ধর্ম মেনে তিনি নিরপেক্ষ থাকতে পারবেন। তাই এক সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে প্রস্তাবের মীমাংসা করলেন। তিনি বললেন—সামাজিক বিপ্লবে আমার বিশ্বাস নেই। আমার মনে হয় সমাজের সংস্কারের প্রয়োজন হলে সে নিজেই সেটা করে নেয়। বিদেশ যাত্রা নিষেধ, জাতপাতের ভেদ, খাওয়া দাওয়ার নিরর্থক বন্ধন কালের গতিতে সব একে একে মাথা নুইয়ে বিদায় নিচ্ছে। এ বিষয়ে সমাজকে নিজের মতে চলতে দেওয়া চাই। যখন জনতা একসঙ্গে বলে উঠবে যে আমরা বেশ্যাদের চকে দেখতে চাই না তখন কোন শক্তি সে কথা না শুনে থাকতে পারবে?

ভাবাবেশে শেঠজী বলতে লাগলেন—আমাদের সঙ্গীত আমাদের গর্বের বিষয়। যাঁরা ইটালী বা ফ্রান্সের সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত তাঁরাও ভারতীয় গানে ভাব, রস ও আনন্দময় শান্তি অনুভব করেন। কিন্তু কালের কি গতি! যে সংস্থা এই স্বর্গীয় ঐশ্বর্যের অধিকারিণী সেই সংস্থাকে সমূলে উপড়ে ফেলতে কিছু সংস্কারপন্থী উঠে পড়ে লেগেছেন। আপনারা কি এই সংস্থার সর্বনাশ করে আমাদের পূর্বপুরুষদের অমূল্য ধনকে নিষ্ঠুরভাবে মাটিতে মিশিয়ে দিতে চান? আপনারা কি জানেন না যে আমাদের জাতীয় ও ধার্মিক ভাবের যেটুকু অবশিষ্ট রয়ে গেছে তা শুধু এই সঙ্গীতের জন্যই আছে—না হলে আজ রাম, কৃষ্ণ বা শিবের নামও কেউ মনে রাখতো না। আমাদের পরম শত্রুও আমাদের জাতীয়তা নষ্ট করতে এর চেয়ে বড় চাল বের করতে পারতো না। আমি বলছি না যে বেশ্যাদের জন্যে সমাজের ক্ষতি হয় না, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির এমন কথা বলার সাহস নেই। কিন্তু মেরে ফেললে তো রোগ সারে না, ওষুধ দিতে হয়। উপেক্ষা আর নিষ্ঠুরতা দিয়ে কোনও কুপ্রথা দূর করা যায় না। শিক্ষা, জ্ঞান আর দয়া দিয়েই তা দূর হয়। স্বর্গে যাবার তো কোনও সোজা পথ নেই, বৈতরণী অবশ্যই পার হতে হবে। যাঁরা মনে করেন কোন মহাত্মার আশীর্বাদে লাফিয়ে স্বর্গে পৌঁছে যাবেন তাঁদের চেয়ে বেশী হাস্যাস্পদ হচ্ছেন তাঁরাই যাঁরা মনে করেন চক থেকে বেশ্যাদের সরিয়ে দিলেই ভারতের সব দুঃখ-দারিদ্র দূর হয়ে যাবে আর চকে নবীন সূর্যের উদয় হবে।

৩২

কুঁড়ে মানুষ যেমন কারো ডাক শুনে উঠে বসে এদিক ওদিক চেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্রও ক্রোধ ও গ্লানির আবেশ কেটে গেলে তেমনি নিজের কর্ত্তব্য ভুলে গেলেন। তিনি ভাবলেন যে তাঁর থাকাতে উমানাথের খরচ এমন কি বাড়ছে। শুধু আধসের আটা তো খাই। তবে সেদিন থেকে ছোটলোকদের সঙ্গে বসে 'চরস খাওয়া ছেড়ে দিলেন। সামান্য একটু কড়া কথা বলেছে বলে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ানো অনুচিত মনে হল। আজকাল প্রায়ই বারান্দায় বসে থাকেন আর সামনে দিয়ে যাতায়াতকারী মেয়েদের সঙ্গে ইয়ার্কি মারেন। আজকাল উমানাথের প্রত্যেক কথায় সায় দেন। খাবার যা মেলে তাই খান, ইচ্ছে থাকলেও কিছু চেয়ে নেন না। উমানাথকে বেশ খোশামোদ করে চলেন। মনের জোর আর ছিল না।

উমানাথ শান্তার বিয়ের কথা নিয়ে তাঁকে কিছু বললে তাঁর সোজা উত্তর ছিল—ভাই, তোমার যা ইচ্ছে তাই করো, তুমিই ওর মালিক—তিনি ভাবতেন যে টাকা যখন ওর খরচ হচ্ছে তখন ওর ইচ্ছে মতোই সব কাজ হওয়া উচিত।

কিন্তু উমানাথ ভগ্নীপতির কড়া কথা ভোলে নি। পোড়া ঘায়ের উপর মাখন লাগালে কিছুক্ষণের জন্য কষ্ট কমে বটে তবে ক্ষতের বেদনা থেকেই যায়। কৃষ্ণচন্দ্রের আত্মগ্লানি ভরা কথা উমানাথ শীঘ্র ভুলে গেল, শুধু কৃতঘ্ন কথাটা কাঁটার মতো ফুটে রইল। শুতে গেলে জাহ্নবী জিজ্ঞাসা করল—আজ লালাজী (কৃষ্ণচন্দ্র) তোমার উপর রাগারাগি করছিলেন কেন?

উমানাথ ব্যথাভরা চোখে বলল—আমার গুণ গাইছিলেন। বলছিলেন, তুমি আমাকে সর্বস্বান্ত করেছ, আমার বৌকে মেরে ফেলেছ, এক মেয়েকে জলে ফেলে দিয়েছ, অন্যটাকে কষ্ট দিচ্ছ।

তা তোমার মুখে কি জিভ ছিল না? বললে না কেন যে আমি কি পায়ে ধরে সেধে এনেছি? থাকবার জায়গা নেই, এর তার দরজায় ঘোরাঘুরি করছিলেন। করেও মরব আর বদনামও হবে? এত করে মরি আর এই তার ফল! এতদিন যে দারোগাগিরি করলেন, তা গঙ্গাজলী ভুলেও কি এক ভিবে সিঁদুরও পরিয়েছে? আমার সামনে বললে এমন কথা শোনাতাম যে মাথা নিচু হয়ে যেত। পাহাড়ের মতো দু দুটো মেয়ে ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন, তার

উপর এই বাক্যবাণ, এঁদের জন্যে ফকির হয়ে গেলুম, তার জন্যে এই যশ? নিজের বোঝা নিয়ে এখন অন্য কোথাও যাচ্ছেন না কেন? পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছেন কেন?

'এখন তো যাবার কথা বলছেন, সুমনের ঠিকানা জিজ্ঞেস করছিলেন।'

'তা এখন কি মেয়ের ঘাড়ে ভর করবেন? বেহদ্দ বেহায়া!'

'না, তা করবেন না। হয়তো দু একদিন ওখানে থাকবেন।'

'কী যে বল? ওঁর দ্বারা আর কিছু হবে না। চক্ষুলজ্জার বালাই নেই, ওরই ঘাড়ে গিয়ে উঠবেন। কিন্তু দেখো ওখানে একদিনও টিকতে পারবেন না।'

সুমনের অধঃপতনের খবর উমানাথ এতদিন জাহ্নবীর কাছে লুকিয়েছিল। সে জানত যে মেয়েদের পেটে কথা থাকে না। অন্য কাউকে নিশ্চয় বলবে আর কথাটা ছড়িয়ে পড়বে। জাহ্নবীর কাছে আদর ভালবাসা পাবার সময় তার খুব ইচ্ছে হত যে তাকে সুমনের কথা বলে। আনন্দে উদ্বেল হয়েও পরিণতির কথা ভেবে উমানাথ চেপে যেত। আজ কৃষ্ণচন্দ্রের কৃতঘ্নতা আর জাহ্নবীর স্নেহভরা কথায় তার ভয় কেটে গেল। পেটে কথা থাকল না। নর্দমায় আটকে যাওয়া জিনিষ জলের তোড়ে বেরিয়ে পড়ার মতো সে জাহ্নবীকে সব কথা বলে ফেলল। রাত্তে ঘুম ভাঙলে নিজের ভুল বুঝতে পারল কিন্তু তখন তীর হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে।

জাহ্নবী স্বামীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে কথাটা কাউকে বলবে না কিন্তু কথাটা তার বুকে বোঝার মত মনে হচ্ছিল। কোন কাজে মন বসে না। এমন খবর দেবার জন্যে উমানাথের উপর তার রাগ হত। সুমনের উপর তার রাগ বা ঘৃণা ছিল না; ব্যাপারটা তার কাছে ছিল কৌতূহল জাগানো বলার মতো কথা আর মনব-হৃদয়ের সম্বন্ধে আলোচনা করবার মত জিনিষ। স্ত্রী শিক্ষার বিরুদ্ধে একটা ভালো প্রমাণ পাওয়া গেল। এ আনন্দ থেকে বেশি দিন বঞ্চিত হয়ে থাকা জাহ্নবীর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। পাড়ার কয়েকটি মেয়ে তাকে তাদের ঘরের খুঁটিনাটি খবর জানত। চুপ করে থাকাটা যেন তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছে বলে জাহ্নবীর মনে হচ্ছিল। তা ছাড়া এ বিষয়ে অন্য মেয়েরাও কেমন আলোচনা করে তা জানার কৌতূহলও কম ছিল না। জাহ্নবী কয়েকদিন কথাটা মনে চেপে রাখল। একদিন কুবের পণ্ডিতের স্ত্রী সুভাগী এসে জাহ্নবীকে বলল—দিদি, আজ একাদশী, গঙ্গা নাইতে যাবে?

সুভাগীর সঙ্গে জাহ্নবীর বেশ ভাব ছিল। জাহ্নবী বলল—যেতে তো চাই, কিন্তু দোর গোড়ায় তো যমদূত বসে। ওর জ্বালায় কি নড়বার উপায় আছে?

সুভাগী—বোন, এঁর কথা তোমায় কি বলবো, লজ্জা লাগে। আমার ঘরের লোক শুনলে মাথা কেটে ফেলতে ছুটবে। কাল আমার বড় মেয়েটাকে শুনিয়ে শুনিয়ে না জানি কোন কবিতা পড়ছিলেন। আজ সকালে দেখি কুয়োর কাছে

দুজনে হাসছে। বোন, তোমার কাছে লুকোবো কি? কিছু ঘটে গেলে জ্ঞাতি কুটুমের কাছে নাক কাটা যাবে না? বুড়ো হয়েছেন, ওঁর কি এমন করা উচিত? আমার মেয়ে তো সুমনের চেয়ে দু এক বছরের বড় হবে আর কি। হ্যাঁ, শালী হলেও না হয় কথা ছিল। ও তো ওঁর মেয়েই হয়। ওঁর এটুকু বিচারও নেই। পণ্ডিতের কানে এ সব গেলে খুন খারাপী হতে পারে। তোমায় বলছি, কোন রকমে আড়ালে ডেকে ওঁকে বুঝিয়ে দাও।

জাহ্নবী আর থাকতে পারল না। সুমনের চরিত্রের ব্যাপারটা বেশ ঝাল-মসলা দিয়ে সুভাগীর কাছে বলে ফেলল। যখন কেউ আমার কাছে তার গোপন কথা বলে তখন আমি তার কাছে কোন কথা লুকিয়ে রাখতে পারি না।

পরের দিন কুবের পণ্ডিত মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে মনে মনে স্থির করলেন যে এই অপমানের শোধ তুলতে হবে।

৩৩

সদনের বিয়ের দিন এসে গেল। বিয়ের শোভাযাত্রা চুনার থেকে অমোলা চলল। শোভাযাত্রার বর্ণনা দেওয়া নিরর্থক। অন্যান্য বিয়ের শোভা যাত্রার মতই। বৈভব আর দারিদ্র্যের এক করুণাত্মক দৃশ্য। পালকির উপর ঝালর দেওয়া পর্দা ঝুলছে কিন্তু বাহকদের পোষাক জীর্ণ, বেমানান। বাহারী আসা-সোটা আর বল্লম ছেঁড়া জামাকাপড় পরা মজুরদের হাতে মোটেই ভালো দেখাচ্ছিল না।

অমোলা এখান থেকে দশ ক্রোশ দূরে। পথে একটা নদী পড়ে। শোভা-যাত্রীরা নৌকায় উঠে বসল। মাল্লাদের সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা দর কষাকষির পর নৌকা চলল। মদন সিংহ রাগে ফেটে পড়ে বললেন—ব্যাটারা যদি আমাদের গাঁয়ের হতো তো এমন বেগার খাটাতাম যে কখনও ভুলত না।

পদ্মসিংহ কিন্তু মাল্লাদের একতা ও দৃঢ়তা দেখে খুশী হলেন।

সন্ধ্যার সময় শোভাযাত্রা অমোলা পৌঁছে গেল। পদ্মসিংহের মুহুরী সেখানে আগে থেকে শামিয়ানা টাঙিয়ে রেখেছিল, তাঁবুগুলোও খাটানো হয়েছে। শামিয়ানায় ঝাড়, ফানুস, হাঁড়ী সব সাজানো রয়েছে। ঝালর, মসনদ, তাকিয়া, আতরদান সব নির্দিষ্ট স্থানে সাজানো। নাচওয়ালীদের তাঁবুর জন্যে বেশ উত্তেজনা দেখা গেল।

দুয়ার-পুজো হয়ে গেলে উমানাথ গামছা কাঁধে নিয়ে বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা

করছিলেন। গাঁয়ের মেয়েরা দাঁড়িয়ে মংগলাচরণের গান গাইছিল। ওদের মধ্যে কে সব চাইতে সুন্দর তা যাচাই করতে বরযাত্রীরা ব্যস্ত হল। মেয়েরাও মুচকি হেসে নয়ন বাণ ছাড়তে লাগল। জাহ্নবী উদাস মনে ভাবছিল এই বর আমার চন্দ্রার জন্যে হলে কত ভাল হত। সুভোগী বরের বাপের পরিচয় জানতে উৎসুক হল। কৃষ্ণচন্দ্র সদনের চরণ পুজো করবার সময় ভাবছিলেন এ এক অদ্ভুত আচার। মদন সিংহের নজর ছিল টাকার দিকে।

বরযাত্রীর দল তাদের থাকবার জায়গায় এল। রান্নার জিনিষপত্র দেওয়া হল। চারদিকে চিৎকার। কেউ বলছে আমাকে কম ঘি দিয়েছে, কেউ চ্যাঁচাচ্ছে কাঠ মেলে নি। লালা বৈজনাথ মদের জন্যে জিদ করছিলেন।

জিনিষপত্র বিলি শেষ হলে লোকেরা উনুন ধরিয়ে রান্না চড়াল। ধোঁয়ায় গ্যাসের আলো পর্যন্ত ফিকে হয়ে গেল।

সদন মসনদ লাগিয়ে বসল। গানের আসর সাজানো হয়েছে। কাশীর সংগীত সমাজ শ্যাম কল্যাণ রাগে আপাল শুরু করলেন।

শামিয়ানা ঘিরে হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়ে। কিছু লোক মেরজাই পরে পাগড়ী বেঁধে ফরাশের উপর বসে। লোকে কানাকানি করতে লাগল নাচওয়ালী কই? সব তাঁবুতে উঁকি ঝুঁকি মেরে শেষে বলতে লাগল—কেমন বরযাত্রীর দল যে একটা বাঈজীও নেই, কোথাকার কাঙাল এসেছে। আবার শামিয়ানার বহর কত? এ সব শুনে মদনসিংহ মনে মনে পদ্মসিংহের উপর চটছিলেন; আর পদ্মসিংহ ভয়ে লজ্জায় তাঁর সামনে আসতে পারছিলেন না।

এরপর লোকে শামিয়ানার উপর ঢিল ফেলতে লাগল। লালা বৈজনাথ নিজের তাঁবুতে সরে পড়লেন। কিছু লোক উপদ্রবকারিদের গাল দিতে লাগল। হুলুস্থুল কাণ্ড। কেউ এদিকে ছুটছে, কেউ ওদিকে, কেউ গালাগাল করছে, কেউ বা মারামারি করবার জন্য তৈরী। অকস্মাৎ ন্যাড়ামাথা, ভস্মতিলক আঁকা এক দীর্ঘকায় ব্যক্তি ত্রিশূল হাতে আসরে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখে যেন আগুন ঝরছে, মুখমণ্ডলে প্রতিভার জ্যোতি ফুটে বের হচ্ছে। আসর স্তব্ধ হয়ে গেল। সব লোক চোখ বড় করে মহাত্মাকে দেখতে লাগল। সাধুটি কে? কোথা থেকে এল?

সাধু ত্রিশূল উঁচু করে তিরস্কার ভরা কণ্ঠে বললেন—হায়, হায়! এখানে নাচ হচ্ছে না, কোন বেশ্যা নেই, বাবারা সব উদাস হয়ে বসে আছে। শ্যাম কল্যাণ রাগের সুন্দর আলাপ কেউ শুনছে না। শোনবার কান নেই; শুধু বেশ্যার নাচ দেখতে চায়। হয় ওদের নাচ দেখাও নয়তো নিজের মাথা ফাটাও। এসো, আমি নাচ দেখাচ্ছি, দেবতাদের নাচ দেখতে চাও? দ্যাখো, গাছের পাতার উপর চাঁদের নির্মল কিরণ কেমন নাচছে! পুকুরে পদ্ম ফুলে জলের ফোঁটা কেমন নাচছে! বনে গিয়ে দেখ, পেখম মেলে ময়ূর কেমন নাচছে!

কী? এসব দেবতাদের নাচ পছন্দ নয়? বেশ তবে পিশাচের নাচ দেখাচ্ছি। তোমার পাশের বাড়ীর গরীব চাষী জমিদারের জুতো খেয়ে কেমন নাচছে। তোমার ভাইয়ের অনাথ ছেলেরা ক্ষিদের জ্বালায় কেমন নাচছে। নিজের ঘরে দেখ বিধবা ভাজের চোখে বেদনার অশ্রু কেমন নাচছে। এ নাচও কি পছন্দ হচ্ছে না? তবে নিজের মনের দিকে তাকাও। কুটিলতা আর ছলনা কেমন নাচছে! সারা সংসারই তো নৃত্যশালা। সেখানে সকলে নিজের নিজের নাচ নাচছে। এ দেখবার চোখ তোমাদের নেই? বেশ, তোমাদের শঙ্করের তাণ্ডব নৃত্য দেখাই। কিন্তু তোমরা সে নাচ দেখবার যোগ্য নও। এ নাচ দেখে তোমাদের কামতৃষ্ণা কি বা আনন্দ পাবে? অজ্ঞানের প্রতিমূর্ত্তি বিষয়ভোগীর দল! নাচের কথা বলতে তোমাদের লজ্জা হয় না? নিজেদের কল্যাণ চাও তো এই প্রথা উঠিয়ে দাও। কুবাসনা, বেশ্যাপ্রেম ত্যাগ করো।

সকলে স্তব্ধ হয়ে মহাত্মার মন-মাতানো বাণী শুনছে, এমন সময় তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন আর সামনের আমবাগানের ভিতর তাঁর মধুর গান শোনা যেতে লাগল। ধীরে ধীরে তাও অন্ধকারে মিলিয়ে গেল যেমন রাতের চিন্তা ঘুমের সাগরে বিলীন হয়। জুয়াড়ীরা পুলিসের কর্ত্তাকে দেখলে যেমন অস্থির হয়ে টাকা পয়সা সামলাতে থাকে, কেউ কড়ি লুকিয়ে ফেলে, তেমনি সাধুর আকস্মিক আগমন, তাঁর তেজোময় চেহারা আর অলৌকিক উপদেশ শুনে লোকে এক অজানা অনিষ্টের ভয়ে শংকিত হয়ে পড়ল। উপদ্রবকারী দুর্বৃত্তের দল নিঃশব্দে ঘরে ফিরে গেল, আর যাঁরা আসরে বসে এখানে আসার জন্যে মনে মনে পস্তাচ্ছিলেন তাঁরা মন দিয়ে গান শুনতে লাগলেন। কিছু সরল স্বভাবের লোক মহাত্মার উদ্দেশ্যে ছুটলেন কিন্তু তাঁর দেখা পেলেন না।

মদনসিংহ নিজের তাঁবুতে বসে শাড়ী-গয়না তদারক করছিলেন তখন মুন্সী বৈজনাথ ছুটে এসে বললেন—ভাই, সর্বনাশ হয়ে গেছে। আপনি এখানে বিয়ে ঠিক করে ভুল করেছেন।

মদনসিংহ চমকে গিয়ে বললেন—কেন, কি হয়েছে? কিছু গোলমাল আছে নাকি?

'হ্যাঁ, গাঁয়ের একজন আমার কাছে এসেছিল। সে এ'দের সম্বন্ধে যা বললে তা শুনে তো আমার আক্কেল গুড়ুম।'

'এরা কি জাতে ছোট?'

'না, জাতে ছোট নয় তবে ব্যাপারটা কিছু গোলমেলে। কনের বাপ জেল খেটে সম্প্রতি ফিরেছে আর কনের বোন বেশ্যা হয়ে গিয়েছে। দালমণ্ডীতে যে সুমনবাঈ থাকে সে কনের সহোদর বোন।'

মদনসিংহ যেন গাছ থেকে পড়ে গেলেন। বললেন—লোকটা এদের কোন শত্রু নয় তো? বিয়েতে ঝগড়া দিতে অনেক সময় মিথ্যে কলঙ্ক দেয়।

পদ্মসিংহ বললেন—হ্যাঁ, কথাটা সেই রকমই ঠেকছে।

বৈজনাথ—আজ্ঞে না, সে বলছিল যে ওদের সামনে কথাটা বলতে পারি।

মদন—তা কনে কি উমানাথের মেয়ে নয় ?

বৈজনাথ—আজ্ঞে না, ওর ভাগ্নী, সেই যে দারোগার নামে মামলা হয়েছিল সেই দারোগা হচ্ছে উমানাথের ভগ্নীপতি। মাস কয়েক আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এসেছে।

মদন সিংহ মাথায় হাত দিয়ে বললেন—হে ভগবান! কি ফ্যাসাদে পড়লাম!

পদ্ম—উমানাথকে ডেকে পাঠানো দরকার।

এই সময় এক নাপিতের সঙ্গে উমানাথকে আসতে দেখা গেল। কনের জন্য কাপড় গয়না চাই, উমানাথ তাঁবুর দরজার কাছে আসতেই মদন সিংহ ছুটে গিয়ে তার দু হাত ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললেন—ওহে তিলকধারী পণ্ডিত, তুমি কি সংসারে আর কোন লোক পেলে না যে নিজের মুখের কালি আমার মুখেই লাগালে ?

বেরালে ধরা ইঁদুরের মত দীনভাবে উমানাথ জিজ্ঞাসা করল—মহারাজ আমার অপরাধটা কি ?

মদনসিংহ—তুমি যে কাজ করেছ তাতে তোমার গলা কাটলেও পাপ হয় না। যে মেয়ের বোন পতিতা হয়ে গেছে তার জন্যে তুমি আমার ঘরই বাছলে ?

উমানাথ চাপা গলায় বলল—মহাশয়, শত্রু মিত্র সবারই থাকে। যদি কেউ কোন কলঙ্কের কথা বলে থাকে তো তা বিশ্বাস করা উচিত নয়। সে লোককে ডাকুন, আমার সামনে যা বলবার সে বলুক।

পদ্মসিংহ—হ্যাঁ, এ অসম্ভব নয়। সেই লোকটাকে ডেকে পাঠানো উচিত।

মদন সিংহ রোষভরা চোখে ভাইকে বললেন—তুমি কেন নাক গলাচ্ছ ? (উমানাথকে) হতে পারে তোমার শত্রু কথাটা বলেছে, কিন্তু কথাটা সত্যি কি না ?

'কোন কথা ?'

'সুমন কি কনের সহোদর বোন ?'

উমানাথের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। লজ্জায় মাথা নিচু, চোখ নিষ্প্রভ হয়ে পড়ল। মুখ দিয়ে 'মহারাজ' ছাড়া আর কোন শব্দ বের হল না।

মদন সিংহ গর্জে উঠে বললেন—স্পষ্ট করে বলছ না কেন ? কথাটা সত্যি না মিথ্যে ?

উমানাথ উত্তর দিতে গেল কিন্তু 'মহারাজ' ছাড়া আর কিছু বলতে পারল না।

মদনসিংহ নিঃসন্দেহ হলেন। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলতে লাগল। চোখ দিয়ে

যেন আগুনে ছুটছে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে উমানাথকে বললেন—ভালো চাও তো আমার সামনে থেকে দূরে হও, ধূর্ত, দাগাবাজ, পাষাণ্ড কোথাকার! তিলক কেটে পণ্ডিত সেজেছে! চণ্ডাল! তোর এখানে জলগ্রহণ করবো না। নিজের মেয়েকে তাবিজ করে গলায় ঝুলিয়ে রাখ্। —এই বলে মদন সিংহ উঠে সদনের তাঁবুতে গেলেন আর চেঁচিয়ে পালকী বইবার বেহারাদের ডাকলেন।

মদন সিংহ চলে গেলে উমানাথ পদ্মসিংহকে বললে—মহারাজ, কোন রকমে পণ্ডিতজীকে শান্ত করুণ। আমার মুখ পুড়ে যাবে। সুমনের ব্যাপার তো আপনি শুনেছেন। অভাগী আমার মুখে কালি মাখাল। ভগবানের ইচ্ছাতেই হল; কিন্তু এখন পুরোনো কাসুন্দী ঘেঁটে লাভ কি? আপনিই বিচার করুন। কথাটা না লুকিয়ে আর কি করা যেত। এ মেয়েটার বিয়ে তো দিতে হবে, আপনাকে সত্যি বলছি সম্বন্ধ ঠিক হয়ে যাবার পরে খবরটা জেনেছি।

পদ্মসিংহ চিন্তান্বিত হয়ে বললেন—ভাই সাহেবের কাণে কথাটা না উঠলে এ সব কিছুই হতো না। দেখুন, তাঁবু কাছে তো যাচ্ছি, কিন্তু তাঁকে রাজী করানো কঠিন মনে হচ্ছে।

মদন সিংহ কাহারদের বলছিলেন যে শীঘ্রই এখান থেকে যাবার জোগাড় করো। সদন নিজের জিনিষ গোছাচ্ছিল, বাপের কাছ থেকে সে সব শুনেছে।

এই সময় পদ্মসিংহ এসে আগ্রহভরে বললেন—দাদা, এত ব্যস্ত হবেন না। একটু ভেবে চিন্তে কাজ করুন। ধোঁকা খাওয়া তো হয়েই গেছে কিন্তু এমনি ফিরে গেলে আরও লোক হাসানো হবে।

সদন কাকার দিকে অবহেলার ভাব দেখিয়ে তাকাল। মদন সিংহ অবাক হলেন।

পদ্মসিংহ—দু চার জনকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন তাদের কি মত।

মদন—তোমার ইচ্ছে কি? জেনে শুনে জ্যান্ত মাছি গিলে ফেলি?

পদ্ম—তাতে অন্ততঃ লোক হাসাহাসি হবে না।

মদন—ছোট ছেলের মতো কথা বলছো; তুমি এ সবের কি জান? যাও, ফিরে যাবার জোগাড় করো, এখনকার লোক হাসাহাসি ভুলে চির-কলঙ্ক লাগালোর চেয়ে ভালো।

পদ্ম—কিন্তু ভেবে দেখুন মেটেটার কি গতি হবে! তার দোষ কোথায়?

মদন সিংহ রেগে বললেন—তুমি আকাট মুর্খ! জিনিষপত্র তোলাও গিয়ে, কালই কোন কথা উঠলে তুমিই গাল দিয়ে বলবে যে টাকা দেখে গলে গেছি। সংসারের ব্যবহারে ওকালতি দিয়ে কাজ হয় না।

পদ্মসিংহ করুণ চোখে বললেন—আমি তো আপনার আদেশ অমান্য করছি না, কিন্তু এ মেয়েটার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে।

মদন—তুমি অনর্থক রাগাচ্ছ। আমি কি মেয়েটার ঠিকে নিয়েছি? ওর কপালে যা আছে তাই হবে। তাতে আমার কি দরকার?

পদ্মসিংহ নিরাশ হয়ে বললেন—সুমনের আসা যাওয়া একেবারে বন্ধ। এ'রা তো তোকে ত্যাগ করে দিয়েছেন।

মদন—তোমাকে বলছি যে আমায় রাগিয়ো না। আমাকে এ সব কথা বলতে তোমার লজ্জা হয় না? কি সমাজ সংস্কারক হয়েছেন! এক বেশ্যার বোনের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিই! ছিঃ ছিঃ, তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে।

পদ্মসিংহ লজ্জায় মাথা নিচু করলেন। তাঁর মন বলছিল দাদা এ অবস্থায় যা করছেন অনুরূপ অবস্থায় তিনিও তাই করতেন। কিন্তু ভয়ংকর পরিণামের কথা ভেবে তিনি আর একবার বলবার সাহস পেলেন। বিফল পরীক্ষার্থী গেজেটে নিজের নাম দেখতে না পেয়ে যেমন সংশোধন পত্র দেখতে ছোটে পদ্মসিংহ তেমনি শেষ চেষ্টা করার মতো চাপা গলায় বললেন—সুমন বাঈও এখন বিধবাশ্রমে চলে গেছে।

পদ্ম সিংহ মাথা নুইয়ে কথা বলছিলেন। দাদার চোখে চোখ রেখে কথা বলার সাহস তাঁর ছিল না। মুখ থেকে কথাটা বের হতে না হতেই মদন সিংহের এক ধাক্কায় তিনি হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেলেন। চমকে মাথা তুলে দেখলেন মদন সিংহ রাগে কাঁপছেন। কড়া কথায় তিরস্কার করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু পদ্মসিংহকে মাটিতে পড়ে যেতে দেখে অনুতাপে সংকুচিত হলেন। মদনসিংহের অবস্থা এমন হলো যখন মানুষ রাগে নিজের মংস কেটে ফেলতে চায়।

জীবনে এই প্রথম পদ্মসিংহ দাদার হাতে মার খেল। সারা শৈশব কেটে গেছে, কত উপদ্রব না করেছে কিন্তু দাদা কোনও দিন গায়ে হাত তোলে নি। তিনি ছোট ছেলের মতন ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তার রাগ হল না। শুধু দুঃখ এই জন্যে যিনি সব সময় আদর করেছেন, কখনো কড়া কথা বলেন নি, আজ আমার জন্যে তাকে দুঃখ পেতে হলো। লজ্জায়, অপমানে, আত্মগ্লানিতে মন ভরে উঠল। ছুটে এসে পদ্মসিংহকে তুললো আর তার বাবাকে বলল—আপনি যেন পাগল হয়ে গিয়েছেন।

এই সময় কয়েকজন এসে জিজ্ঞাসা করল—মহারাজ, ব্যাপার কি? বর ফিরিয়ে নিয়ে যাবার হুকুম দিচ্ছেন কেন? এমন কিছু করুন যাতে দু পক্ষেরই মর্যাদা থাকে; এখন তো ওর আর আপনার সম্মান এক হয়ে পড়েছে। দেনা পাওনায় যদি কিছু ঘাটতি থাকে তো আপনি চেপে যান। ভগবান আপনাকে কি না দিয়েছেন? দু চার টাকা বেশী নিয়ে কি ধনী হয়ে যাবেন? মদন সিংহ কোন উত্তর দিলেন না।

গানের আসরেও গোলমাল। ব্যাপারটা কি তা জানতে একে অপরকে

জিজ্ঞাসা করতে লাগল। তাঁবুর দরজায় লোকের ভিড় বাড়তে লাগল।

আসরে কন্যাপক্ষের কিছু লোক ছিল। তারা উমানাথকে জিজ্ঞাসা করল যে বরপক্ষ ফিরে যেতে চাইছে কেন? উমানাথের কাছে সন্তোষ জনক উত্তর না পেয়ে তারা মদনসিংহের কাছে মিনতি করতে লাগল—মহারাজ, আমাদের এমন কি অপরাধ হল? অন্য যে কোন দণ্ড ইচ্ছে হয় দিন কিন্তু বর ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন না।

'উমানাথকেই জিজ্ঞাসা করুন, সেই কারণটা বলে দেবে।'

সদনকে দেখে পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র খুশী হয়েছিলেন। বিয়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে, তিনি বর আসবার প্রতীক্ষায় রয়েছেন এমন সময় কয়েক জন লোক এসে তাঁকে খবরটা দিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—ফিরে যাচ্ছে কেন? উমানাথের সঙ্গে কি কোন ঝগড়া হয়েছে?

লোকেরা বলল—আমরা জানি না, তবে উমানাথ তাদের ঠাণ্ডা করবার চেষ্টায় আছে।

কৃষ্ণচন্দ্র রাগে গরগর করতে করতে বরপক্ষের তাঁবুর দিকে চললেন। বর ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া কি ছেলে খেলা? এ কি পুতুলের বিয়ে? বিয়ে দেবার ইচ্ছে না থাকলে এখানে আসা কেন? দেখি, কি করে বর ফেরত যায়? রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবো। এই সব বলতে বলতে সাথীদের সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁবুর কাছে এসে চেঁচিয়ে বললেন—কোথায় আছেন পণ্ডিত মদনসিংহ? মহারাজ, একটু বেরিয়ে আসুন।

চিৎকার শুনে মদনসিংহ বেরিয়ে এসে দৃঢ়স্বরে বললেন—বলুন, কি বলবেন?

কৃষ্ণচন্দ্র—আপনি কেন বর ফেরত নিয়ে যাচ্ছেন?

মদন—আমার ইচ্ছে! আমি বিয়ে দিতে চাই না।

কৃষ্ণ—আপনাকে বিয়ে দিতেই হবে। এখানে এসে আপনি এভাবে ফিরতে পারেন না।

মদন—আপনার যা ইচ্ছে হয় করুন; আমি বিয়ে দেব না

কৃষ্ণ—কারণটা কি?

মদন—আপনি কি কারণটা জানেন না?

কৃষ্ণ—জানলে কেন আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি?

মদন—আপনি পণ্ডিত উমানাথকে জিজ্ঞাসা করুন।

কৃষ্ণ—আমি আপনাকেই জিজ্ঞাসা করছি।

মদন—কথাটা চাপা থাকাই ভালো। আমি আপনাকে লজ্জা দিতে চাই না।

কৃষ্ণ—বুঝেছি, আমি জেল খেটে ফিরেছি, এ তারই শাস্তি, ধন্য আপনার ন্যায়।

মদন—এর জন্যে আমি ফেরৎ নিয়ে যেতে পারি না।

কৃষ্ণ—তবে কি উমানাথ টাকা পয়সা কম দিয়েছে ?

মদন—আমি এত নীচ নই।

কৃষ্ণ—তবে এমন কি ঘটেছে ?

মদন—আমি বলছি যে আমায় জিজ্ঞাসা করবেন না।

কৃষ্ণ—আপনাকে বলতে হবে। বিয়ে দিতে এসে বর ফেরৎ নিয়ে যাওয়া ? আপনি কি ছেলেখেলা পেয়েছেন ? রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে। ফেরৎ যাবার আশা করবেন না।

মদন—আমার সে ভয় নেই। মরে যাবো তবু আপনার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব না। এখানে আমার মর্য্যাদা নষ্ট করতে আসি নি।

কৃষ্ণ—তবে কি আমি আপনার চেয়ে নীচ ?

মদন—হ্যাঁ, আপনি আমার চেয়ে নীচ।

কৃষ্ণ—এর প্রমাণ আছে ?

মদন—হ্যাঁ, আছে।

কৃষ্ণ—তবে তা বলতে আপনার সংকোচ হচ্ছে কেন ?

মদন—বেশ, তবে শুনুন, পরে আমায় দোষ দেবেন না। আপনার মেয়ে সুমন, যে কনের সহদর বোন, পতিতা হয়ে গিয়েছে। ইচ্ছে করলে আপনি নিজে দালমণ্ডিতে দেখে আসতে পারেন।

কৃষ্ণচন্দ্র অবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন—এ ডাহা মিথ্যে—কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে পড়ল যে তিনি যখন উমানাথের কাছে সুমনের ঠিকানা জানতে চেয়েছিলেন তখন সে এড়িয়ে গিয়েছিল। জাহ্নবী ঠারে ঠোরে যে সব কটাক্ষ করত তার অর্থ এখন স্পষ্ট হয়ে গেল, কথাটা বিশ্বাস হওয়াতে মাথা নিচু হয়ে গেল। অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। দু তরফের শতাধিক লোক সেখানে দাঁড়িয়ে, কিন্তু সবাই নিস্তব্ধ। এ বিষয়ে কিছু বলবার সাহস কারুরই হল না।

মাঝরাত নাগাদ তাঁবু টাবু সব খোলা হয়ে গেল। বাগানে আবার অন্ধকার ছেয়ে গেল আর শুরু হয়ে গেল শিয়ালদের সভা ও পেঁচাদের চিৎকার।

৩৪

বিঠলদাস সুমনকে বিধবাশ্রমে তার পরিচয় লুকিয়ে রেখেছিলেন। ব্যবস্থাপক সভার কোন সদস্যকেও জানান নি। আশ্রমের বিধবাদের কাছে ওকে বিধবা বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু অবুল বফার মতো গুপ্তচরের কাছে এ খবর বেশী দিন লুকোনো রইল না। হিরিয়া ঝির খোঁজ করে তার কাছ থেকে সুমনের ঠিকানা জেনে নিলেন আর রসিক বন্ধুদের কাছে পোঁছে দিলেন খবরটা! ফলে সেই সজ্জনদের বিশেষ কৃপা দৃষ্টি আশ্রমের উপর গিয়ে পড়ল। কখনো শেঠ চিমনলাল আসেন, কখনো শেঠ বলভদ্রদাস, কখনো পণ্ডিত দীনানাথ দেখা দিতে লাগলেন। আশ্রমের পরিচ্ছন্নতা, সাজসজ্জা, আর্থিক প্রভৃতি বিষয়ে মহানুভাবদের এক অদ্ভুত সহানুভূতি দেখা গেল। আশ্রমের শুভকামনায় তারা দিন রাতে মগ্ন হয়ে পড়লেন।

বিঠলদাস মহাসংকটে পড়লেন। একবার ভাবলেন এ পদটা ছেড়ে দিই। আমিই কি আশ্রমের ভার নিয়েছি? কমিটিতে তো আরো লোক রয়েছে যারা এই কাজ সামলাতে পারে। তারা যা ভালো বুঝবে তাই করবে, আমাকে তো নিজের চোখে এ অত্যাচার দেখতে হবে না। আবার ভাবলেন এই দুর্বৃত্তদের গালমন্দ করি, যা হবে তা দেখা যাবে। কিন্তু যখন শান্ত মনে ভাবেন তখন মনে হয় এ বিষয়ে ধীরে সুস্থে এগোনো ছাড়া উপায় নেই। তবে তিনি ওঁদের সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করতে লাগলেন, তাঁদের প্রস্তাব উপেক্ষা করে দেখাতে চাইলেন যে আশ্রমে তাঁদের আসা তাঁর পছন্দ নয়। কিন্তু গরজ পড়লে লোকে দেখেও না দেখার ভান করে। শেঠ দুজন তো বিনয়ের অবতার হয়ে পড়লেন। আর তিওয়ারীজী তো সরলতার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি, তাঁর শরীরে কোন রাগ নেই। এই কূটনীতির সামনে বিঠলদাস কি করবেন ভেবে পেলেন না।

একদিন সকালে বিঠলদাস এই সব ভাবছেন এমন সময় আশ্রমের দরজায় একটা ফিটন এসে থামল। গাড়ী থেকে কারা নামলেন? অবুল বফা ও আব্দুল লতীফ।

বিঠলদাস মনে মনে গজরাতে লাগলেন। শেঠদের কাঁদুনি থামলো তো এক নতুন আপদ এসে গেল। দূর করে দেবার ইচ্ছা হলেও বাইরে শান্ত রইলেন।

অবুল বফা বললেন—আদাব ভাই সাহেব। আজ শরীর খারাপ না কি? আপনার দৌলত দেখেও আনন্দ হয়। সেই জাতের কি সৌভাগ্য যাদের মধ্যে আপনার মত সেবক বর্তমান। আমাদের স্বার্থপর সমাজে এ সব গুণই নেই। যাঁরা বিখ্যাত তাঁরাও নিষ্পাপ নন। কি বলেন আব্দুল লতীফ সাহেব?

অব্দুল লতীফ—জনাব, ওদের কথা বলবেন না। স্বার্থপর স্বেচ্ছাচারী যাই বলুন কম করে বলা হয়। বড়দের দিকে চেয়ে দেখুন সব নীল বর্ণের শিয়াল। বনেদিয়ানার জামা পরে বসে আছে। আপনাদের জাত খুব উদার। মনে হচ্ছে খোদা উপযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে খুঁজে পেতে আপনাকে এই সমাজে এনে দিয়েছেন।

অবুল বফা—আপনার মত ভালো মানুষের কাছে এ সব কথা বলা ঠিক নয়, আচ্ছা, আপনাদের এখানে সূচীশিল্পের নকশার কাজ তো নিশ্চয়ই হয়? আমার এক বন্ধু কয়েক ডজন নক্সাতোলা চাদরের ফরমাস করেছেন। শহরের কয়েক জায়গায় যদিও এই কাজ হয়, তবু আমার মনে হল সে আশ্রমে যারা ব্যক্তিগত ভাবে এ কাজ করে তাদের সুযোগ দেওয়া উচিত। আপনাদের এখানে কাজের কিছু নমুনা যদি থাকে তবে তা দেখালে বাধিত হবো।

বিঠলদাস—এখানে ওসব কাজ হয় না।

অবুল বফা—কিন্তু হওয়া তো উচিত। আপনি খোঁজ করে দেখুন ওদের মধ্যে কেউ এ কাজ নিশ্চয় জানে। আমার তাড়া নেই, আবার না হয় আসবো। দু চার দশ বারো আনা করে হলেও আমার আপত্তি নেই। আপনি নিজের সব কিছু ত্যাগ করেছেন, আমি কি এটুকুও পারবো না? এ ব্যাপারে আমি হিন্দু মুসলমানকে আলাদা ভাবে দেখা উচিত মনে করি না।

বিঠল—আপনার করুণার জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু কমিটি স্থির করেছে যে এখানে যেন এ রকম কাজ করানো না হয়। তাই আমি নিরুপায়।

এই বলে বিঠলদাস উঠে দাঁড়ালেন। ফিরে যাওয়া ছাড়া মহানুভব দুজনের আর কোন উপায় রইল না। মনে মনে বিঠলদাসকে গাল দিয়ে তাঁরা ফিটনে সওয়ার হলেন।

কিন্তু ফিটনের আওয়াজ মিলিয়ে যাবার আগেই চিমনলালের মোটর গাড়ি এসে গেল। গাড়ি থেকে নেমে এসে বিঠলদাসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চিমনলাল বললেন—বাবু সাহেব নাটকের বিষয়ে কি স্থির হলো? শকুন্তলা নাটক তো ভর্তৃহরির সব চেয়ে ভালো বই। ইংরেজরা এটা খুব পছন্দ করে। নিশ্চয় এটা করুন। কিছু পার্ট যদি মুখস্থ করিয়ে থাকেন তো আমাকেও একটু শোনান।

কখনো কখনো কঠিন পরিস্থিতিতে এমন চাল মগজে খেলে যা অনেক ভাবনা চিন্তাতেও মনে আসে না। বিঠলদাস ভাবছিলেন কি করে শেঠজীর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় কিন্তু কোন উপায় দেখা যাচ্ছিল না। এই

সময় হঠাৎ একটা কথা মনে এল। বললেন—আজ্ঞে না, এ নাটক করা স্থির হয়নি। এ বিষয়ে আমি বড় সাহেবের মত নিয়েছি। উনি মানা করেছেন। বুঝি না পলিটিক্স বলতে ওঁরা কি বোঝেন। আজ কথায় কথায় বড় সাহেবের কাছে আশ্রমের জন্যে কিছু বার্ষিক সাহায্যের কথা তুলেছিলাম, তাতে তিনি বললেন যে পলিটিক্যাল কাজে কোন সাহায্য দিতে পারবেন না। আমি তো তাঁর কথা শুনে অবাক। জিজ্ঞাসা করলাম আপনি আশ্রমকে রাজনৈতিক সংস্থা মনে করছেন কেন। তাতে বললেন যে এর উত্তর দিতে চাই না।

চিমনলালের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, বললেন—সাহেব তাহলে আশ্রমকে পলিটিক্যাল ভেবেছেন?

বিঠল—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই তো স্পষ্টই বললেন।

চিমন—তবে তো এখানে যারা আসে তাদের উপর নিশ্চয় নজর রাখা হয়।

বিঠল—সে নিশ্চয়ই। কিন্তু তাতে আপনার কি? জাতের উপর যাঁদের টান আছে তাঁরা কি এসবে ভয় পান?

চিমন—আজ্ঞে না, আমি সে দলে নেই। ওঁরা রামলীলাকে পলিটিক্যাল ভাবছেন জানতে পারলে আমি সেটাও বন্ধ করে দেব। পলিটিক্যাল কথাটা শুনলেই আমার হাত পা কাঁপতে থাকে। আমার ঘরে গিয়ে দেখুন একখণ্ড ভগবদ্‌গীতাও পাবেন না। আমি ঘরে বিশেষ করে বলে দিয়েছি যে বাজারের জিনিষ যেন শালপাতায় আনে। পুরোনো খবরের কাগজের ঠোঙা আমার বাড়ীতে ঢুকতে দিই না। মহারাণা প্রতাপের এক পুরোনো ছবি ছিল, সেটাকে সরিয়ে সিন্দুকে পুরে রেখেছি। আচ্ছা তবে আসি বলে ভুঁড়ি সামলিয়ে মোটরের দিকে ছুটলেন।

বিঠলদাস মনে মনে খুব হাসলেন। তাঁর খেয়াল হলো না যে কতো মিথ্যা কথা বলতে হল আর সেইসঙ্গে আত্মার কতটা অবনতি হল। সেবাধর্মের এই অবতার ব্যক্তিগত জীবনে মিথ্যা ও ভণ্ডামি থেকে বিরত থাকতেন কিন্তু জাতীয় কাজে দরকার হলে এ সবের সাহায্য নিতে তাঁর সংকোচ ছিল না।

চিমনলাল বিদায় হলে বিঠলদাস চাঁদার খাতা নিয়ে চাঁদা আদায়ের জন্য তৈরী হলেন, কিন্তু ঘর থেকে বের হবার আগেই দেখলেন শেঠ বলভদ্রদাস সাইকেলে করে আসছেন। রাগে শরীর জ্বলে উঠল। খাতা ছুঁড়ে ফেলে লড়াই করবার জন্য তৈরি হলেন।

বলভদ্রদাস এগিয়ে এসে বললেন—মশাই, কাল আমি যে সব গাছ পাঠিয়েছি সেগুলো ঠিক করে বসানো হয়েছে কি না? আমি একটু দেখতে চাই, বলেন তো আমার মালী পাঠিয়ে দেব।

বিঠলদাস উদাসীনভাবে উত্তর দিলেন—আজ্ঞে না, মালী পাঠাবার দরকার নেই আর ও সব এখানে লাগানো যাবে না।

বলভদ্র—কেন ? লাগানো যাবে না কেন ? আমার মালী এসে সব ঠিক করে দেবে। আজই লাগিয়ে দিন, নইলে শুকিয়ে যাবে।

বিঠল—শুকিয়ে যাক বা না যাক, ও গাছ এখানে লাগানো হবে না।

বলভদ্র—লাগাবার ইচ্ছে নেই তো আগে বললেই হতো, আমি তো এগুলো সাহারানপুর থেকে আনালাম।

বিঠল—বারান্দায় পড়ে আছে তুলিয়ে নিয়ে যান।

শেঠ বলভদ্রদাসের মান মর্য্যাদা বোধ প্রবল। এমনি তিনি শীল ও বিনয়ের অবতার। কিন্তু কেউ উদ্ধতভাবে কথা বললে, তাঁকে ছোট করবার চেষ্ট করলে রেগে আগুন হয়ে যেতেন। এদিকে নির্ভীক, দক্ষ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। এ জন্যে জনতা তাঁর কথায় প্রাণ দিতে তৈরী। তাঁর উপর তাদের অটুট বিশ্বাস। তারা বিশ্বাস করত যে ন্যায় আর সত্যের পথ থেকে তিনি কখনো সরে আসবেন না, নিজের স্বার্থে কখনই জনতার অনিষ্ট চিন্তা করবেন না। ডক্টর শ্যামাচরণের উপর তাদের এ বিশ্বাস ছিল না। জনতার কাছে বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রতিভার চেয়েও চরিত্র বলের মুল্য বেশী।

বিঠলদাসের রুক্ষ কথা শুনে বলভদ্রদাসের সুর পালটে গেল, জোর গলায় বললেন—আজ তিরিক্ষি মেজাজ দেখাচ্ছেন কেন ?

'মিষ্টি করে কথা বলার ঢঙ আমি জানি না।'

'মিষ্টি কথা নাই বললেন, কিন্তু লাঠি তো মারবেন না।'

'আপনার কাছে শিষ্টাচার শিখতে চাই না।'

'আপনি তো জানেন, আমিও এই কমিটির একজন মেম্বার।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, জানি বৈকি।'

'চাইলে এর সভাপতিও হতে পারতাম।'

'জানি।'

'আমার দানও কারোর চেয়ে কম নয়।'

'এ সব পুরোনো কথা তুলে কি হবে ?'

'চাই তো আশ্রম উঠিয়ে দিতে পারি।'

'অসম্ভব।'

'সভার সব মেম্বার আমার কথায় ওঠে বসে।'

'হতে পারে।'

'এক দিনে একে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারি।'

'অসম্ভব।'

'আপনার এত স্পর্ধা হলো কি করে ?'

'ঈশ্বরের ভরসায়।'

আশ্রমের দিকে রক্তচক্ষু হেনে শেঠজী সাইকেলে সওয়ার একেন। কিন্তু

তাঁর ধমক ধামকে বিঠলদাসকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হতে দেখা গেল না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে শেঠজী মেম্বারদের আশ্রম সম্বন্ধে কিছুই বলবেন না। তাঁর অহঙ্কার তাঁকে নিচু হতে দেবে না। লজ্জাটা দূর করতে আশ্রমের প্রশংসা করে ফেলাও সম্ভব; তবে এ আগুন যে একদিন ফুটে বের হবে তাতে সন্দেহ নেই। অহঙ্কার যে অপমানকে ভুলতে দেয় না এ আশঙ্কা থাকলেও বিঠলদাসের মনে কোন ক্ষোভ ছিল না যেটা প্রায়ই ঝগড়ার পরে হৃদয়াকাশে মেঘের মতো ছেয়ে যায়। বরং কর্তব্য করতে পেরে সন্তোষ পেলেন; এইজন্যে অনুতাপ হলো যে এ বুদ্ধি আগে মাথায় আসেনি কেন? মনের আনন্দে তিনি গান ধরলেন—

প্রভুজী মোহে কাহে কী লাজ!
জন্ম-জন্ম য়ীঁ হী ভরমায়ো অভিমানী বেকাজ!
প্রভুজী মোহে কাহে কী লাজ!

(প্রভু আমার আর কিসে লজ্জা? অভিমানে অকাজ করে জন্ম-জন্ম ঘুরে মরছি। আমার আবার লজ্জা কেন?)

এই সময় পদ্মসিংহকে আসতে দেখা গেল। তাঁর মুখ চিন্তায় নৈরাশ্যে ভরা, যেন এখনই চোখের জল মুছে এলেন। বিঠলদাস এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—অসুখ হয়েছে না কি? একেবারে চেনা যায় না।

পদ্ম—আজ্ঞে, অসুখ হয় নি, তবে বড় ঝঞ্ঝাটে পড়েছি।

বিঠল—বিয়ে ভালোভাবে চুকে গেছে তো?

পদ্মসিংহ ছাদের দিকে চেয়ে বললেন—বিয়ের কথা জিজ্ঞাসা করবেন না। বিয়ের কি হবে, এক অবলা নারীর জীবন নষ্ট করে এলাম। পাত্রী ছিল সুমন বাঈ-এর বোন, দাদা তো এ কথা শুনেই বর ফেরৎ নিয়ে এলেন।

বিঠলদাস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—তবে তো বড়ই অন্যায় হলো। আপনি ভাই সাহেবকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন না?

পদ্ম—যথাসাধ্য করে আমি হার মেনেছি।

বিঠল—মেয়েটার কি যে গতি হবে। সুমন শুনলে কান্নাকাটি করবে।

পদ্ম—এখানকার কি খবর? সুমন আসাতে বিধবাদের মধ্যে কোন গণ্ডগোল হয়নি তো? তারা নিশ্চয় ওকে ঘৃণা করছে?

বিঠল—কথাটা প্রকাশ হলে আশ্রম খালি হয়ে যাবে।

পদ্ম—আর সুমন কেমন আছে?

বিঠল—তাকে দেখে মনে হয় যেন সে চিরকাল আশ্রমেই আছে। মনে হয় সদ্ব্যবহার করে সে নিজের কলঙ্ক মুছে ফেলতে চায়। হাসিমুখে সব কাজ করতে তৈরি। অন্য মেয়েরা শুয়ে থাকে আর সে তাদের ঘরদোর পরিষ্কার করে দেয়। কয়েকজন তার কাছে সেলাই শেখে; আমার কেউ কেউ গরম

শেখে। সব কথায় তার পরামর্শ চাই। চার দেওয়ালের ভিতর যেন তারই রাজত্ব চলছে। আমি তো মোটেই এ রকম আশা করি নি। সে নিজেও পড়াশোনা আরম্ভ করেছে। মনের কথা, ভাই, ঈশ্বর জানেন, দেখে কিন্তু মনে হয় যেন একেবারে বদলে গেছে।

পদ্ম—না মশাই, ও বদ স্বভাবের মেয়ে নয়। আমাদের বাড়ীতে কয়েকমাস আসা যাওয়া করত। বাড়ীর লোকে ওর প্রশংসা করত, বলতে গিয়ে লজ্জা পেলেন। আমাদের এমন কয়েকটি কুসংস্কার আছে যা তাকে এই অভিনয় করতে বাধ্য করেছিল। সত্যি বলতে কি আমাদের পাপের শাস্তি ওকে ভুগতে হচ্ছে। আচ্ছা, ওদিকের খবর কি? শেঠ বলভদ্রদাস কি নতুন কোন প্যাঁচ কষছেন?

বিঠল—তিনি কি চুপ করে থাকবার লোক? কাজকাল খুব দৌড়ঝাঁপ করছেন। দু তিন দিন আগে হিন্দু মেম্বারদের এক সভাও হয়েছিল। আমি যেতে পারিনি। তবে জয় ও পক্ষেরই। সভাপতির দুটো ভোট নিয়ে ওঁদের ছ'টা ভোট হবে আর আমাদের পক্ষে চার। তবে মুসলমানদের ভোট মিলিয়ে সমান সমান হয়ে যাবে।

পদ্ম—তা হলে আমাদের অন্ততঃ আর একটা ভোট দরকার। কোন আশা আছে কি?

বিঠল—আমি তো কোন আশা দেখছি না।

পদ্ম—অবসর থাকে তো চলুন একবার ডাক্তার সাহেব আর লালা ভগতরামের কাছে যাওয়া যাক।

বিঠল—বেশ তো চলুন। আমি তৈরি।

৩৫

ডাক্তার সাহেবের বাংলো কাছেই, তবু এ'রা ঘোড়ার গাড়ী করে চললেন। ডাক্তার সাহেবের বাড়ী পায়ে হেঁটে যাওয়া ফ্যাশান-বিরুদ্ধ কাজ হতো। পথে বিঠলদাস আজকের সব ঘটনা রঙ চড়িয়ে সবিস্তারে শোনালেন, নিজের চাতুর্যের পরিচয় বেশ ভালো করেই দিলেন।

সব শুনে চিন্তিতভাবে পদ্মসিংহ বললেন—এবার আমাদের আরো বেশী সতর্ক হতে হবে। শেষ পর্যন্ত আশ্রমের ভার আমাদের ঘাড়েই এসে পড়বে। বলভদ্র এখন চুপ করে থাকলেও একদিন এর শোধ তুলবে নিশ্চয়।

বিঠল—কি করবো? আমি এ সব অত্যাচার দেখে চুপ থাকতে পারি না। শরীরে যেন আগুন জ্বলে। লোকে জানে এঁরা বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ন্যায়পরায়ণ আর ওঁদেরই এই সব কাজ? আমি যদি বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করতে পারতাম তো অন্ততঃ বলভদ্রদাসের বিরোধিতা করতে হতো না।

পদ্ম—একদিন তো এটা করতেই হতো, এও আমার কাজের ফল, দেখি কপালে কি কি আছে। বিয়ে ভেঙে বর ফেরৎ আনার পর থেকেই আমার এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে ক্ষিদে-তেষ্টা নেই, ঘুম নেই। শুধু এই চিন্তা যে অভাগী মেয়েটার কি উপায় হবে। এর উপর যদি আশ্রমের ভার ঘাড়ে চাপে তো প্রাণ যাবে। এমন পাঁকে পড়েছি যে যত উঠতে চাই ততই ডুবে যাচ্ছি।

এই সব কথা হতে হতে ডাক্তার সাহেবের বাংলো এসে গেল, দশটা বাজে, সুসজ্জিত কামরায় বসে ডাক্তার সাহেব নিজের বড় মেয়ে কান্তির সঙ্গে দাবা খেলছেন। টেবিলে দুটো টেরিয়ার কুকুর বসে মন দিয়ে দাবার চাল দেখছে আর তাদের বিচারে খেলুড়েদের ভুল চাল দেখলে থাবা মেরে গুটি উলটে দিচ্ছে। তাদের নষ্টামি দেখে কান্তি হাসিমুখে ইংরাজীতে বলছেন, 'ইউ নটী'!

টেবিলের বাঁ দিকে এক আরাম কেদারায় সৈয়দ তেগ আলী সাহেব সমাসীন। তিনি মাঝে মাঝে কান্তিকে চাল বলে দিচ্ছিলেন।

এই সময় দু বন্ধু উপস্থিত হলেন। ডাক্তার সাহেব দাঁড়িয়ে তাঁদের সঙ্গে হাত মেলালেন। আড়চোখে তাঁদের দেখে কান্তি টেবিল থেকে একটা বই নিয়ে পড়তে লাগলেন।

ডাক্তার সাহেব ইংরাজীতে বললেন—আপনাদের দেখা পেয়ে খুশি হলাম। আসুন, মিস কান্তির সঙ্গে আপনাদের ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিই।

পরিচয় করানো হলে কান্তি দুজনের সাথে করমর্দন করে হেসে বললেন—বাবা আপনাদের কথাই এতক্ষণ বলছিলেন। আপনাদের পরিচয় জেনে আনন্দ পেলাম।

ডাক্তার শ্যামাচরণ—কান্তি ডালহাউসী পাহাড় থেকে এল। ওদের স্কুল শীতকালে বন্ধ থাকে। ওখানে শিক্ষার ব্যবস্থা ভালো, ইংরেজ মেয়েদের সঙ্গে ও বোর্ডিঙে থাকে। লেডী প্রিন্সিপাল তো ওর প্রশংসা করে চিঠি দিয়েছেন। কান্তি চিঠিটা ওঁদের দেখাও তো। মিস্টার শর্মা, কান্তির ইংরিজি কথা শুনে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। (হেসে) ও আমাকে এখন ইংরিজি শেখাতে পারে।

কান্তি লজ্জা পেয়ে প্রশংসাপত্রটা পদ্মসিংহকে দেখাল। তিনি পড়ে বললেন—আপনি ল্যাটিনও পড়েন?

ডাক্তার সাহেব বললেন—এবার পরীক্ষায় তো ল্যাটিনে একটা মেডেল পেয়েছে। কাল ক্লাবে এমন ভালো খেলল যে ইংরেজ লেডীরাও অবাক। ভালো কথা, এবার হিন্দু মেম্বারদের সভায় তো আপনি ছিলেন না?

পদ্ম—আজ্ঞে না, একটু দেশে গিয়েছিলাম।

ডাক্তার—আপনার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হল। আমার মনে হয় যে এখন তাড়াহুড়ো করে প্রস্তাবটা বোর্ডে না তোলাই ভালো। এখন সফল হবার আশা কম মনে হয়।

তেগ আলী বললেন—জনাব, মুসলমান মেম্বারদের কাছ থেকে পুরো সহায়তা পাবেন।

ডাক্তার—হ্যাঁ, কিন্তু হিন্দু মেম্বারদের মধ্যে মতভেদ আছে।

পদ্ম—আপনার সহায়তা পেলে সাফল্যে কোন সন্দেহ থাকে না।

ডাক্তার—আপনাদের প্রস্তাবে আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে। কিন্তু জানেন তো, আমি গভর্ণমেণ্টের মনোনীত সদস্য। এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের মতামত যতক্ষণ না জানতে পারছি, ততক্ষণ এই সামাজিক প্রশ্নে আমি কোন রায় দিতে পারি না।

বিঠল দাস তীব্রস্বরে বললেন—মেম্বার হলে যদি আপনার স্বাধীন বিচারে বাধা পড়ে তো আপনার পদটা ছেড়ে দেওয়াই উচিত।

তিনজনই বিঠলদাসের দিকে উপেক্ষা ভরা চোখে তাকালেন। তার উক্তি অসঙ্গত। তেগ আলী ব্যঙ্গ করে বললেন—ইস্তফা দিলে সম্মান কি করে হবে? লাটসাহেবের সামনে কি করে চেয়ারে বসাবেন? কে আর 'অনারেবল্' বলবে? বড় বড় ইংরেজদের সঙ্গে হাত মেলাবার সৌভাগ্য কি মিলবে? সরকারী ডিনারে কি ডাক পড়বে? নৈনিতাল বেড়ানো কি করে হবে? নিজের চমৎকার বক্তৃতা কি করে শোনাবেন? ও সব তো ভেবে দেখা উচিত।

বিঠলদাস লজ্জিত হলেন। বিঠলদাসের সঙ্গে আসার জন্য পদ্মসিংহের অনুশোচনা হল।

ডাক্তার সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন—সাধারণ লোকে ভাবে যে এই লোভেই লোকে মেম্বার হবার জন্যে ছোটে। তারা বোঝে না যে কাজটায় দায়িত্ব কতটা, বেচারা মেম্বারদের কতো সময়, কতো বিচার, কতো অর্থ, কতো পরিশ্রম এইজন্যে দিতে হয়। এর বদলে সে শুধু এই তৃপ্তিটুকু পায় যে সে দেশ আর জাতির সেবা করছে। এ না হলে কেউ মেম্বার হতে যেত না।

তেগ আলী—আজ্ঞে, এতে আর সন্দেহ কোথায়? আপনি ঠিক বলেছেন, যার ঘাড়ে এই পাহাড় প্রমাণ দায়িত্ব পড়ে সেই হাড়ে হাড়ে বোঝে।

এগারোটা বেজে যেতে শ্যামাচরণ পদ্মসিংহকে বললেন—আমার খাওয়ার সময় হয়েছে, এখন উঠছি। আপনি সন্ধ্যার সময় আমার সঙ্গে দেখা করুন।

পদ্মসিংহ—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি নিশ্চিন্তে যান।

তিনি ভাবলেন, খেতে একটু দেরী হবে বলে যারা ব্যস্ত হয়ে পড়েন, তাঁদের কাছে অপরে কি আশা করতে পারে। লোকে জাতির দেশের সেবক হতে চান কিন্তু তার জন্যে একটুও কষ্ট করতে চান না।

লালা ভগতরাম রোদে চৌকীতে বসে তামাক খাচ্ছেন, তাঁর ছোট মেয়ে

কোলে বসে ধোঁয়া ধরবার জন্যে বারবার হাত বাড়াচ্ছে। সামনে মাটিতে কয়েকজন রাজমিস্ত্রী, মজুর বসে। ভগতরাম পদ্মসিংহকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললেন—সন্ধেবেলাতেই শুনেছি আপনি এসে গেছেন। আজ সকালেই যাবো ভাবছিলাম, কিন্তু এমন ঝামেলায় পড়লাম যে অবসর পেলাম না। এই ঠিকেদারি বড় ফ্যাসাদ, কাজ করাও, নিজের টাকা ঢালো, উপরন্তু অপরের খোশামোদ করো। আজকাল ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কোন ব্যাপারে আমার উপর এমন নারাজ হয়ে গেছেন যে আমার কোন কাজই তাঁর পছন্দ হয় না। একটা সাঁকো তৈরি করবার ঠিকে নিয়েছিলাম। সেটা তিনবার ভাঙ্গিয়েছেন, কখনো বলেন এটা হয়নি, কখনো বলেন ওটা হয়নি। লাভ দূরে থাক লোকসান হবে মনে হচ্ছে, কেউ শোনে না। আপনি হয়তো শুনেছেন যে হিন্দু মেম্বারদের এক মিটিঙ হয়ে গেল।

পদ্ম—শুনেছি আর শুনে হতাশ হয়েছি। আপনার কাছে আমার খুব আশা ছিল। আপনি কি এই সংস্কারের কাজটা দরকারী মনে করেন না?

ভগতরাম—আমি একে শুধু দরকারী ভাবি না, বরং মনে প্রাণে এতে সাহায্য করতে চাই, কিন্তু আমি তো আমার ভোটের মালিক নই, স্বার্থের জন্যে আমি নিজেকে বেচে দিয়েছি। আমাকে গ্রামোফোন রেকর্ড ভাবুন: যা কিছু বলতে বলবে তাই বলতে পারি, অন্য কিছু নয়।

পদ্ম—কিন্তু আপনি তো মানেন যে জাতির কল্যাণ ও স্বার্থের মধ্যে পার্থক্য থাকা উচিত।

ভগতরাম—আজ্ঞে হ্যাঁ, নীতিগত ভাবে এটা মানি কিন্তু কাজে লাগাবার ক্ষমতা নেই। আপনি তো জানেন আমার সব কাজকর্ম শেঠ চিমনলালের সাহায্যে চলে। তাঁকে বিমুখ করলে আমার ঠাট ভেঙে পড়বে। সমাজে আমার যেটুকু মান-মর্যাদা তা এই ঠাটবাটের জন্যে। বিদ্যে বুদ্ধি তো নেই শুধু এর জোরেই টিকে আছি। আজ যদি লোকে এটা জানতে পারে তো লোকে আমার দিকে তাকাবে না। দুধের মাছির মতই সমাজ ছুঁড়ে ফেলে দেবে। আপনিই বলুন, শহরে এমন কে আছে যে শুধু আমায় বিশ্বাস করে হাজার হাজার টাকা বিনা সুদে ধার দেবে। আর শুধু আমার কথাই তো নয়, সংসার চালাতে মাসে অন্ততঃ তিনশো টাকা খরচ হয়। জাতির জন্যে নিজে কষ্ট সইতে রাজি আছি কিন্তু ছেলেপুলেদের নিঃসহায় করি কেমন করে?

আমরা যখন কর্ত্তব্য এড়িয়ে যেতে চাই, তখন দোষ খণ্ডনের জন্য এমন প্রবল যুক্তি দাঁড় করাই যারবিরুদ্ধে কারো কিছু বলবার থাকে না। সে সময়ে নিজেদের এমন সব কথা বলে ফেলি যা গুপ্ত থাকাই কল্যাণকর। লালা ভগতরামের মানসিক অবস্থা তখন এই রকম ছিল। পদ্ম সিংহ তাঁর আশা ছাড়লেন, বললেন—এ অবস্থায় কি করে আপনার উপর জোর দিই? আমার তো শুধু একটা ভোট দরকার; পাবার কোন উপায় বলতে পারেন?

ভগত—কুমার সাহেবের কাছে যান। ঈশ্বরের দয়া হলে তাঁর ভোট আপনি পাবেন। শেঠ বলভদ্রদাস তাঁর নামে ৩০০০ টাকার নালিশ করেছেন। কাল ডিগ্রি হয়ে গেছে। কুমার সাহেব এখন বলভদ্রদাসের উপর মহা খাপ্পা, পারলে গুলি করে মারেন। তাঁকে দলে টানবার আর এক উপায় আপনাকে বলি, তাঁকে কোনও সভাসমিতির সভাপতি করে দেন। তাহলে তার নাকে দাঁড় বেধে ঘোরাতে পারবেন।

পদ্মসিংহ হেসে বললেন—ভালো কথা। তাঁর কাজেই যাচ্ছি।

বেলা দুপুর, তবু পদ্মসিংহের ক্ষিদে-তেষ্টা নেই, গাড়ী করে চললেন। কুমার সাহেব থাকেন বরুণার ধারে এক বাংলোতে। পৌঁছতে আধ ঘণ্টা লাগল।

বাংলোর হাতা সুসজ্জিত নয়, অপরিচ্ছন্ন, ফুল পাতার বালাই নেই। বারান্দায় কয়েকটা কুকুর শিকলে বাঁধা। একাধারে কয়েকটা ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। কুমার সাহেবের শিকারের প্রচণ্ড সখ। কখনো কখনো কাশ্মীর পর্যন্ত ছোটেন। এ সময় সামনের ঘরে বসে তিনি সেতার বাজাচ্ছিলেন। ঘরের এক কোণে কয়েকটা বন্দুক আর বল্লম দাঁড় করানো, অন্যদিকে এক টেবিলের উপর এক কুমারী বসে। পদ্মসিংহ ঘরে ঢুকে ওটা দেখে চমকে উঠলেন। চামড়াটার ভিতরে এমন ভাবে ভুষি ভরা যে জীবন্ত বলে মনে হয়।

কুমার সাহেব শর্মাজীকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন—আসুন মশাই, আপনার দর্শন তো দুর্লভ হয়ে পড়েছে। কবে বাড়ী থেকে এলেন?

পদ্মসিংহ—কাল এসেছি।

কুমার—চেহারা খারাপ দেখাচ্ছে। অসুখে পড়েছিলেন বুঝি?

পদ্ম—না, না: আমি ভালোই আছি।

কুমার—তা একটু জলযোগ হোক।

পদ্ম—না, না, মাফ করবেন। সেতার বাজাচ্ছিলেন নাকি?

কুমার—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি তো সেতারই পছন্দ করি। হারমোনিয়ম আর পিয়ানো শুনলে আমার যেন বমি আসে। এই ইংরিজী বাজনাগুলো আমাদের সঙ্গীতের সর্বনাশ করছে, চর্চা ক্রমে ক্রমে উঠে যাচ্ছে। যেটুকু ছিল তা থিয়েটার শেষ করেছে। যাকেই দেখুন, সবাই গজল আর কাওয়ালী আওড়াচ্ছে। আমাদের ধনুর্বিদ্যার মতো অল্পদিনের মধ্যে এও লোপ পেয়ে যাবে। সঙ্গীত হৃদয়ে পবিত্র ভাব আনে। সঙ্গীতের প্রচার কম হওয়ার ফলে আমরা ভাবশূন্য হয়ে পড়েছি, আর এর কু-প্রভাব পড়েছে সাহিত্যের উপরে। যে দেশে রামায়ণের মতো অমূল্য গ্রন্থ রচনা হয়েছে, সুর সাগরের মতো আনন্দময় কাব্য লেখা হয়েছে সেদেশে আজ সাধারণ উপন্যাস লিখতে অনুবাদের আশ্রয় নিতে হয়। বাঙলায় ও মহারাষ্ট্রে এখনও সঙ্গীতের কিছু প্রচার আছে, তাই সেখানে ভাবের শৈথিল্য নেই, রচনা ও কল্পনাশক্তির এমন অভাব দেখা যায় না। আমি তো হিন্দী সাহিত্য পড়াই ছেড়ে দিয়েছি। অনুবাদগুলো বাদ দিলে আধুনিক হিন্দী

হরিশ্চন্দ্রের দু চারটে নাটক আর চন্দ্রকান্তা সন্ততি ছাড়া আর কিছুই নেই। সংসারে কোন সাহিত্য এত দরিদ্র নয়। এর উপর আবার মহানুভবেরা দু একটা ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ মারাঠা বা বাংলা অনুবাদের সাহায্যে করেছেন, তাঁরা তো নিজেদের ধুরন্ধর সাহিত্যিক ভাবতে লেগেছেন। এক ভদ্রলোক তো কালিদাসের কয়েকটি নাটক পদ্যে অনুবাদ করে নিজেকে হিন্দী ভাষার কালিদাস মনে করছেন। আর এম জন 'মিল' এর দু খানা বই অনুবাদ করেছেন; সেও মূল গ্রন্থ থেকে নয় বরং গুজরাটি, মারাঠি ইত্যাদি অনুবাদের সাহায্য নিয়ে, এতে তিনি এমন সন্তুষ্ট যেন হিন্দী সাহিত্যকে উদ্ধার করেছেন। আমার তো দৃঢ় ধারণা অনুবাদে হিন্দীর অপকার হচ্ছে। এতে মৌলিকতার বিকাশের সুযোগ মেলে না।

সাহিত্যের সঙ্গে কুমার সাহেবের পরিচিতি দেখে পদ্মসিংহ অবাক হলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে ওঁর পোলো খেলা আর শিকার করা ছাড়া অন্য কিছুতে টান নেই। সাহিত্যের সঙ্গে শর্মাজীর পরিচয় নেই কিন্তু কুমার সাহেবের কাছে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করতে সঙ্কোচ হল। তাই সব-জান্তার ভাব দেখানো হাসিমুখে বললেন—আপনি যে প্রশ্ন তুলেছেন তাতে দু পক্ষেই অনেক কিছু বলা যায়। যাক আমি আপনার কাছে অন্য একটা কাজে এসেছি। শুনলাম হিন্দু মেম্বারদের মিটিঙে আপনি নাকি শেঠদের পক্ষে যোগ দিয়েছেন।

কুমার সাহেব হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসিতে ঘরটা ভরে গেল। দেয়ালে টাঙানো পেতলের ঢালটা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। বললেন—সত্যি বলুন তো, কার কাছে শুনলেন?

পদ্মসিংহ এই অকারণ হাসির তাৎপর্য বুঝতে না পেরে একটু হকচকিয়ে গেলেন। তাঁর মনে হল কুমার সাহেব তাঁকে অপদস্থ করতে চাইছেন। বিরক্ত হয়ে বললেন—সকলেই বলছেন, কার কার নাম করবো?

কুমার সাহেব আবার জোরে হেসে বললেন—আর আপনার বিশ্বাস হলো?

পদ্মসিংহের কোন সন্দেহ রইল না যে এসব তাঁকে লজ্জা দেবার ফন্দি; তাই জোর গলায় বললেন—অবিশ্বাস করার কোন কারণ তো দেখছি না।

কুমার—কারণ এই যে তাহলে আমার উপর ঘোর অন্যায় করা হবে। আমার বিবেচনায় আমি আমার সম্পূর্ণ শক্তি আপনার প্রস্তাবের জন্যে খরচ করেছি। এমন কি আমি এটাকে গম্ভীর হয়ে আলোচনার বিষয় বলে মনেও করি নি। ব্যঙ্গোক্তি করেই কাজ সেরেছি। (একটু ভেবে) হ্যাঁ, একটা কথা হতে পারে। বুঝেছি। (আবার হো হো করে হেসে) যদি তাই হয় তো আমি বলবো যে মিউনিসিপ্যালিটির সবাই গণ্ডমূর্খ। ব্যঙ্গোক্তি তো আপনি বোঝেন। সব দোষ ঐ ব্যঙ্গোক্তির। কেউ ও কথার আসল মানে বুঝল না। কাশীর সুশিক্ষিত, সম্মানিত মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের মধ্যে কেউই এই সাধারণ কথাটা বুঝতে পারল না, কি আপশোষের কথা! মশাই, আপনি বড় কষ্ট পেলেন। ক্ষমা

করবেন ; আমি প্রস্তাবটা মনেপ্রাণে সমর্থন করছি।

কুমার সাহেবের কথায় বিশ্বাস হওয়াতে পদ্মসিংহ হাসিমুখে বললেন—যদি এঁরা এমন ধোঁকা খেয়ে থাকেন তবে সত্যিই বুদ্ধি বেশ মোটা বলতে হয়। কিন্তু প্রভাকর রাও ধোঁকা খেয়েছেন বলে মনে হয় না। তবে হয়তো প্রতিদিন অনুবাদ করে করে তাঁর বুদ্ধিও মোটা হয়ে গিয়েছে।

ফিরে যাবার সময় পদ্মসিংহের খুব আনন্দ হল—ঠিক যেন এক রমণীয় স্থান দেখে ফিরছেন। কুমার সাহেবের প্রেম আর ভদ্র ব্যবহার তাঁকে বশীভূত করে ফেলেছিল।

৩৬

অনেক দিনের উপার্জন বাক্সে পুরে হাজার কল্পনার জাল বুনে হাসিমুখে ঘরে ফিরে বাক্স খুলে সব ফাঁকা দেখলে মানুষের মনের অবস্থা যেমন হয়, বাড়ীতে ফিরে সদনের অবস্থা সেই রকম হল।

স্বাধীন বিচার বুদ্ধি বিদ্যা, সঙ্গীত আর অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। এ সব গুণ সদনের ছিল না। তার মত বয়সে আমরা আমাদের ধর্ম আর সামাজিক রীতির জন্য গর্ব বোধ করি ; তাতে কোন দোষ ত্রুটি দেখতে পাই না। যখন আমরা আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনতেও চাই না তখন আমাদের 'কি ও কেন' অর্থাৎ অনুসন্ধিৎসার বিকাশ হয় না। মেয়েদের গঙ্গাস্নান করাতে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে গৃহত্যাগ করা সদনের কাছে সহজ ঠেকে। মেয়েদের হাসির শব্দ বারবাড়ী থেকে শোনা গেলে অন্দরে এসে সে মাকে বেশ কথা শোনায়। সুভদ্রার মনে হয় যে নিজের শ্বাশুড়ীর শাসনও এত কড়া ছিল না। পদস্খলনকে সে দার্শনিক উদার দৃষ্টি দিয়ে দেখতে জানে না, তার ছিল শুষ্ক সাধুর দৃষ্টি।

তার দেখা ঘটনা—তাদের গ্রামের এক ঠাকুর সাহেব এক নাচওয়ালীকে নিজের বাড়ীতে এনে রাখায় গাঁয়ের লোকে তাঁকে এক ঘরে করে এমন পর্যুদস্ত করল যে তিনি নাচওয়ালীকে বাড়ী থেকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। এটা ঠিক যে সে সুমনবাঈ-এর প্রেমে পাগল। তার শাস্ত্রমতে এটা খুব দোষের নয়। কিন্তু সুমনের ছায়া পর্যন্ত যদি বাড়ীতে আসে তবে সেটা হবে অমার্জনীয় অপরাধ। সে সুমনের ঘরে পান পর্যন্ত ছোঁয় নি। নিজের কুলমর্যাদা আর সামাজিক প্রথার মহত্ব তার কাছে প্রাণের চেয়েও বেশী। কুলটা মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ হলে কুলে যে কলঙ্ক হবে, যে অপমান, নিন্দা হবে তার কল্পনাও সদনের অসহ্য মনে হয়।

বিয়ের সভায় বসে সে পদ্মসিংহের কথা শুনে অধীর হয়ে পড়েছিল। ভয়

হচ্ছিল যে তার বাবা তাঁর কথায় সায় না দিয়ে দেন। কাকা যে কেন এসব বলছে তা সে বুঝতে পারল না। অন্য লোকে এ কথা বললে তার জিভ ছিঁড়ে ফেলত। কিন্তু আপন কাকাকে সে সমীহ করে। কাকাকে প্রতিবাদ করার ইচ্ছাই প্রবল কিন্তু তর্ক করার শক্তি নেই। তাই তর্ক করলেও তা ঝগড়া কিম্বা হাতাহাতিতে শেষ হত। কিন্তু মদন সিংহের উদ্দণ্ডতার ফলে তার প্রতিবাদের প্রবৃত্তি সহানুভূতিতে বদলে গেল।

এ পথে হতাশ হওয়ার ফলে সদনের মন আবার সুমনের দিকে গেল। বিষয়-বাসনায় অভ্যস্ত মন নিরাকার প্রেম-কল্পনা নিয়ে থাকতে চায় না। তার হৃদয় একবার প্রেমের আলো দেখেছিল, তাই আর অন্ধকারে থাকতে পারল না। সে পদ্মসিংহের সঙ্গেই কাশী চলে গেল।

কিন্তু এখানে এসে দ্বিধায় পড়ল। সংশয় হল, হয়তো সুমনের কাছে এ সব খবর পেঁছে গেছে, সে হয়তো বিয়ে বাড়ীতে যায় নি, সমাজ অবশ্য তাকে ত্যাগ করেছে কিন্তু তাকে বিয়ের খবরটা নিশ্চয় জানিয়েছে। তা হলে তো সে মুখ তুলে আমার সঙ্গে কথাই বলবে না। হয়তো গালমন্দও করতে পারে। তবু সন্ধ্যা হতেই বেশভূষা করে ঘোড়ায় চড়ে দালমণ্ডীর দিকে রওনা হল। প্রেম-মিলনের আনন্দময় কল্পনার সামনে সব আশংকা দূর হয়ে গেল। সে ভাবছে সুমন কি কথা বলবে আর আমি কি উত্তর দেব। যদি ব্যাপারটার কিছু না জেনে সে আমাকে দেখেই গলা জড়িয়ে ধরে বলে, তুমি কি নিষ্ঠুর গো!

এই কল্পনায় তার কামাগ্নি দ্বিগুণ হয়ে উঠলে ঘোড়া ছুটিয়ে সে দালমণ্ডীর কাছে পেঁছে গেল। খেলুড়ে ছেলে যেমন পাঠশালার দরজায় এসে ভেতরে ঢুকতে ভয় পায়, দালমণ্ডীর কাছে এসে তার সেই অবস্থা। প্রেমের তুফানে ভাটা পড়ল। সে ধীরে ধীরে এমন জায়গায় এল যেখান থেকে সুমনের ঘরটা স্পষ্ট দেখা যায়। এখান থেকেই করুণ নেত্রে সে ঘরের দরজার দিকে তাকাল। দরজা বন্ধ, তালা লাগানো। সদনের বুক থেকে একটা বোঝা নেমে গেল। মন খুশিতে ভরে গেল যেন নিঃসম্বল লোক ছেলের জেদে খেলনার দোকানে এসে দেখছে দোকান বন্ধ।

ঘরে ফিরে সদনের মন আবার ভেঙে পড়ল। বিয়োগ-ব্যথা ব্যগ্রতা বাড়িয়ে তোলে। মন আর মানে না। রাতে সকলে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লে সে নিঃশব্দে উঠে দালমণ্ডীর পথে পা বাড়াল। শীতের রাত, কনকনে হাওয়া, কুয়াশার ফাঁকে ফাঁকে চাঁদ উঁকি মারছে আর ক্ষ্যাপার মতো সে দালমণ্ডীর পথে সমানে ছুটে চলেছে। দালমণ্ডীতে এসে তার পা যেন আটকে গেল। হাত পায়ের সঙ্গে উৎসাহেও ভাটা পড়ল। খেয়াল হল এমন অসময়ে তার আসা হাসির খোরাক হবে। সুমনই বা আমাকে কি ভাববে? তার চাকর তো এখন শুয়ে পড়েছে। নিজেই অবাক হয়ে ভাবল এখানে আসবার দুর্বুদ্ধি কেন হল। তাই ফিরে চলল।

পরদিন সন্ধ্যায় আবার সেখানে হাজির। মনে ভেবে এসেছিল যে সুমন আমায় দেখতে পেয়ে যদি ডাকে তবেই যাবো না হলে সোজা পথ ধরে চলে যাব। আমাকে ডাকলেই বুঝবো ও এখনও আমায় ভালো চোখে দেখে। না হলে এ ঘটনার পরেও আমায় ডাকবে কেন? একটু এগিয়ে যেতে আবার খেয়াল হল। ও কি আমায় ডাকবার জন্যে জানালায় বসে থাকবে? ও কি করে জানবে যে আমি এখানে এসেছি। নাঃ—আমারই তার কাছে যাওয়া উচিত। সুমন কখনো আমার উপর রাগ করতে পারে না। আর রাগ করলেও আমি কি সে রাগ ভাঙাতে পারবো না? হাত জোড় করবো, পায়ে ধরবো, চোখের জলে ওর মনের কালি ধুয়ে দেব, আমার উপর যতই রাগ করুক, আমার প্রেমের স্মৃতি তার মন থেকে মুছে যেতেই পারে না।

ওঃ! সে যদি সজল চোখে আমার দিকে চায় তো আমি তার জন্যে কি না করতে পারি। তার কোনও দুশ্চিন্তা দূর করতে প্রাণ দিতেও আমি রাজী, তবু কি আমার অপরাধ ক্ষমা করবে না? কিন্তু দালমণ্ডী এসে গেলেই তার প্রেম কামনা লোপ পেত। গাঁয়ে সন্ধ্যে বেলায় নিমগাছের নিচে দেবী মূর্তি দেখেও তার বিচার বুদ্ধি এমনি করেই উপে যায়। একবার মনে হল, যদি ও আমায় দেখে মনে মনে বলে—ওই যাচ্ছেন কুমার সাহেব, যেন সত্যিই কোন রাজ্যের মালিক! ধূর্ত, জোচ্চোর কোথাকার! মনে হতেই তার পা আটকে গেল। এগোতে পারল না।

এই ভাবেই কয়েকদিন কেটে গেল। দিনে রাতে বালির দেওয়ালের উপর প্রেম-কল্পনার যে প্রাসাদ গড়ে, সন্ধ্যায় দালমণ্ডীর সামনে অবিশ্বাসের দমকা হাওয়ায় তা ভেঙে পড়ে।।

বেড়াতে বেড়াতে একদিন সে কুইন্স পার্কে হাজির। সেখানে শামিয়ানা টাঙানো। লোকে সেখানে বসে প্রফেসর রমেন দত্ত'র প্রভাবশালী বক্তৃতা শুনছে। ঘোড়া থেকে নেমে সদন বক্তৃতা শুনতে লাগল। শুনে তার নিশ্চিত ধারণা হলো যে বেশ্যাদের জন্যেই আমাদের ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে। তারা হচ্ছে বিষের মতন। আমি খুব বেঁচে গেছি, নইলে ডুবে যেতাম। এদের নিশ্চয়ই শহর থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত। ওরা যদি বাজারে না থাকতো তবে আমি সুমন বাঈ-এর ফাঁদে পা দিতাম না।

পরদিন আবার সে কুইন্স পার্কে গেল, আজ সেখানে মুন্সী আবুল বফা ভাবপূর্ণ সুললিত বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। এটাও মন দিয়ে শুনে সদনের নিশ্চিত ধারণা হল যে বেশ্যা থাকায় আমাদের উপকার। সত্যিই তো, এরা না থাকলে তো দেবতাদের স্তুতি করবার কেউ থাকত না। আর এও ঠিক যে বেশ্যাগৃহেই হিন্দু-মুসলমান মন খুলে মেলামেশা করে, হিংসা দ্বেষের গন্ধ থাকে না। জীবন সংগ্রামে বিশ্রাম পেতে, হৃদয়ের দুঃখ শোক ভুলতে সেখানে আশ্রয় নেয়। ওদের শহর থেকে সরিয়ে দিলে, শুধু ওদের উপর নয়, বরং সারা সমাজের উপর

নিশ্চয়ই অত্যাচার করা হবে।

কয়েকদিন পরে তার এ সিদ্ধান্ত বদলে গেল। এইভাবে ক্রমাগত তার মত বদলাতে লাগল কারণ সদনের স্বতন্ত্র বিচার শক্তি ছিল না। কোন বিষয়ের দোষ গুণ তুলনামূলক ভাবে বিচার করতে পারত না। ফলে প্রত্যেক সবল যুক্তির সামনে তার সিদ্ধান্ত বদলে যেত।

সে একদিন পদ্মসিংহের বক্তৃতার নোটিস দেখল। তিনটের সময় সে যাবার জন্যে তৈরী হল আর চারটের সময় বেণীবাগে পৌঁছে গেল। তখনও কেউ আসে নি। কয়েকজন সতরঞ্চি পাতছে। ঘোড়া থেকে নেমে সদন সতরঞ্চি পাতার কাজে লেগে গেল। পাঁচটার সময় লোক আসতে লাগল আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই হাজার হাজার লোক জড়ো হল। এমন সময় ফিটনে চড়ে পদ্মসিংহকে আসতে দেখা গেল। তার বুক কাঁপতে লাগল। প্রথমে রুস্তম ভাই একটি ছোট কবিতা পড়লেন, সৈয়দ তেগ আলী এই উপলক্ষে সেটা লেখেন। তিনি বসলে লালা বিঠ্‌লদাস দাঁড়ালেন। যদিও তাঁর ভাষণ রুক্ষ, ভাষার লালিত্য নেই, কটাক্ষ নেই তবু লোকে তাঁর কথা মন দিয়ে শোনে। তাঁর নিঃস্বার্থ সার্বজনিক কাজের জন্যে লোকে তাঁকে শ্রদ্ধা করে। সকলে আগ্রহ ভরে তাঁর বক্তৃতা শুনছে যেন তৃষ্ণার্তের মুখের সামনে জল ধরেছে। এ জলের কাছে অপরের দেওয়া সরবৎ পানসে লাগে। শেষে পদ্মসিংহ উঠলেন।

সদনের বুক কেঁপে উঠল, না জানি কি অসাধারণ বক্তৃতা হবে। ভাষণ ছিল রুচিকর ও করুণা ভরা। ভাষায় সরলতা ও সরসতা মনকে মাতায়। ভাষণ এমন আবেগ ভরা যে গায়ে কাঁটা দেয়। তিনি বলছিলেন, আমরা বেশ্যাদের ঘৃণা করি বলে তাদের শহর থেকে দূরে রাখতে চাইছি না। ওঁদের ঘৃণা করবার কোন অধিকার আমাদের নেই। তাহলে ওঁদের প্রতি ভীষণ অন্যায় করা হবে। আমাদেরই কুবাসনা, আমাদেরই সামাজিক অত্যাচার, আমাদেরই কুপ্রথাগুলো বেশ্যার রূপ ধরে আছে। এই দালমণ্ডী আমাদের জীবনের কলুষিত প্রতিবিম্ব, আমাদের পৈশাচিক অধর্মের প্রতিমূর্ত্তি। কোন মুখে আমরা ওঁদের ঘৃণা করবো? ওঁদের অবস্থা হচ্ছে অত্যন্ত শোচনীয়; আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে ওঁদের সুপথে আনা, ওঁদের জীবন শুধরে দেওয়া। আর এটা তখনই সম্ভব হবে যদি তাঁরা শহরের বাইরে গিয়ে দুর্ব্যসন থেকে দূরে থাকেন। আমাদের সামাজিক দুরাচার হচ্ছে আগুন আর এই অভাগী রমণীরা খড়ের মতো। যদি আগুনে নিভিয়ে দিতে হয়, তবে খড় সরিয়ে দাও, আগুন আপনিই নিভে যাবে।

সদন তন্ময় হয়ে ভাষণ শুনছিল। যখন তার চারপাশে লোকে প্রশংসায় হাত তালি দিচ্ছিল তখন সদনের বুক আনন্দে ভরে উঠছিল। কিন্তু লোকদের একে একে উঠে যেতে দেখে সে অবাক হয়ে গেল। তাদের অধিকাংশই শুধু বেশ্যাদের নিন্দা আর বেশ্যাগামীদের প্রতি কটূক্তি শুনতে এসেছিল। তাদের কাছে পদ্মসিংহের এই উদার ভাব অসঙ্গত ঠেকছিল।

৩৭

বক্তৃতা শোনার নেশা সদনকে এমন পেয়ে বসল যে কোথাও বক্তৃতা হবে শুনলেই সে সেখানে হাজির হত। মাসের পর মাস উভয় পক্ষের কথা শুনে বিচার করে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার ক্ষমতা বাড়তে লাগল। এমন কোন যুক্তি নতুন দেখলেই মোহিত না হয়ে সে প্রমাণের সাহায্যে সত্যাসত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত সে বুঝে গেল যে বক্তৃতাগুলোর অধিকাংশই হচ্ছে শুধু বাগাড়ম্বর, তাতে নতুন তত্ত্ব তো থাকেই না, শুধু পুরোনো যুক্তিগুলো নতুন ভাবে বলা হয়। সমালোচকের দৃষ্টি লাভ করল সে। তারপর কাকার পক্ষ সমর্থন করতে লাগল।

কিন্তু তার সমালোচনা পক্ষপাত দুষ্ট আর তীব্র হত। বিপক্ষের ভালোটা স্বীকার করবার মতো উদারতা তার ছিল না। তার ধারণা হল যারা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছে তারা সকলেই বিষয় বাসনার দাস! এই সব চিন্তার ফলে সে দালমণ্ডীর দিকে যাওয়াই ছেড়ে দিল। কোন বেশ্যাকে পার্কে বসতে দেখলে বা ফিটনে বেড়াতে দেখলে তাড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করত। তার ক্ষমতা থাকলে সে বোধ হয় গোটা দালমণ্ডী মাটিতে মিশিয়ে দেয়। তার বিবেচনায় সংসারে সবচেয়ে পতিত তারাই যারা নাচ করায় আর যারা তা দেখে। পথে ঘাটে এদের কাউকে একলা পেলে সে হয়তো দু চার ঘা বসিয়ে দিতে পারে। মনে একটু ভয় থাকলেও প্রস্তাবটা যে উপকারী তাতে আর সন্দেহ ছিল না। পাছে তার পক্ষ দুর্বল হয়ে পড়ে এই ভয়ে সে ভয়টাকে চেপে রাখত।

সুমনের ছবি এখনও তার হৃদয়ে আঁকা। তাকে নিয়ে প্রেম কল্পনায় তার মন এখনও ভরে ওঠে। এ সব চিন্তার হাত এড়াতে একলা চুপ করে বসে থাকাই ছেড়ে দিল। সকালে উঠে গঙ্গাস্নান করতে চলে যেত। রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত বই পড়ে কাটিয়ে দিত। এত করেও কিন্তু সুমনের স্মৃতি মুছে গেল না। সে নানা বেশে তার মনশ্চক্ষে ভাসে, কখনো রাগ করে, কখনো বা অনুনয়; কখনো প্রেমে গলা জড়িয়ে ধরে, মধুর ভাবে হাসে। পরে হঠাৎ সচেতন হয়ে এ সব বিঘ্নকারী চিন্তা ছেড়ে ভাবতে বসত—আজকাল কাকা কেন এত বিষণ্ণ হয়ে পড়েছেন, কখনো হাসতে দেখা যায় না। ওঁর জন্যে জিতন রোজ ওষুধ আনে কেন? তাঁর কি হয়েছে?

এর মধ্যে সুমন আবার মনে জেগে উঠে জলভরা চোখে বলে—সদন, তোমার কাছে তো এ আশা করি নি। তুমি আমায় নীচ বেশ্যা বলে ভাবছ, কিন্তু তোমার সঙ্গে তো আমি বেশ্যার মতো ব্যবহার করিনি; আমার সমস্ত প্রেম উজাড় করে

দিয়েছি। তোমার কাছে কি তার কোনও দাম নেই ?

সদন আবার মন থেকে সুমনের চিন্তা দূর করবার চেষ্টা করে। সে এক বক্তৃতায় শুনেছিল যে মানুষের জীবন তার নিজের হাতে। যেমনভাবে চায় সেই ভাবেই সে নিজেকে গড়তে পারে। এর মূলমন্ত্র হচ্ছে নীচ, অশ্লীল, মন্দ চিন্তা মনে আসতে না দেওয়া। জোর করে তাদের দূর করে সৎ চিন্তায় আর সৎ ভাবে মনকে পবিত্র রাখতে হবে। কথাটা সদন কখনো ভোলে নি। সেখানে সে এও শুনেছিল যে জীবনকে মহৎ করতে হলে উচ্চ শিক্ষার দরকার নেই, শুধু পবিত্র চিন্তা দরকার। কথাটা সদনের খুব ভালো লেগেছিল। তাই সে নিজের চিন্তা নির্মল রাখতে সচেষ্ট হল।

'প্রত্যেকটি কুচিন্তা আমাদের শুধু বর্তমান জীবনের নয়, ভবিষ্যৎ জীবনেরও অধঃপতন ঘটায়', কতো লোকেই না বক্তৃতায় কথাটা শুনেছিল। অন্যেরা, যার মধ্যে কিছু বিজ্ঞ লোকও আছেন, কথাটা শুনলেন আর ভুলে গেলেন, কিন্তু সরল স্বভাব সদনের মনে কথাটা গেঁথে রইল, যেন এক দরিদ্র সোনার জিনিষ কুড়িয়ে পেয়ে ভাবছে কি অমূল্য নিধিই পেয়েছি। সদন এখন সব সময় আত্মোন্নতির চেষ্টায় লেগে থাকে। পথে কোন যুবতীর উপর নজর গেলে সে নিজেকে ধিক্কার দেয় আর মনকে বোঝায় যে ক্ষণিকের সুখের জন্যে তুই নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের সর্বনাশ করছিস। এই তিরস্কারে তার মনে শান্তি ফিরে আসে।

একদিন গঙ্গাস্নানে যাবার সময় সে চকে বেশ্যাদের এক মিছিল দেখতে পেল। শহরের নামী দামী বেশ্যারা এক উরস (ধার্মিক সম্মেলন) উৎসব করেছিল। সেখান থেকে তারা ফিরছে। এ দৃশ্য দেখে সদন অভিভূত হল। সৌন্দর্য, স্বর্ণ আর সৌরভের এমন আশ্চর্য সমাবেশ সে আগে কখনো দেখেনি। রেশম, রঙ আর রমণীয়তার অনুপম দৃশ্য, পরিপাটি প্রসাধনের ঔজ্জ্বল্য—এসব তার কাছে একেবারে নতুন। মনকে সংযত করবার সমস্ত প্রচেষ্টাই বিফল হল। অলৌকিক সৌন্দর্য মূর্তিদের সে চোখ ভরে দেখতে লাগল, ঠিক যেমন করে এক ছাত্র মাসের পর মাস কঠিন পরিশ্রম করে পরীক্ষা দেবার পর আমোদ প্রমোদে মত্ত হয়ে ওঠে।

একবার দেখে মনে তৃপ্তি হল না, আবার দেখল, শেষে চোখ এমন আটকে গেল যে সে হাঁটতে ভুলে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, মিছিল চলে গেলে তার হুঁশ হল। নিজের মনকে তিরস্কার করল—এত মাসের উপার্জন ক্ষণিকের মোহে নষ্ট করলি ? বাঃ! আমার কি অধঃপতন! আমি কতো দুর্বল। পরে মনকে বোঝাল এদের শুধু দেখলেই কি পাপের ভাগী হতে হবে ? আমি তো পাপ দৃষ্টি দিয়ে দেখিনি; মনে তো কোনও কুবাসনা নেই। ভগবানের সৃষ্টি এই সৌন্দর্য দেখে আনন্দলাভ করা আমার কর্তব্য।

এই ভাবতে ভাবতে সে হাঁটতে লাগল কিন্তু মনে সন্তোষ পেল না। আমি নিজেকেই ঠকাচ্ছি। আমার অন্যায় হয়েছে এটা স্বীকার করে নিলে ক্ষতি কি ?

হ্যাঁ, হয়েছে, অন্যায় নিশ্চয় হয়েছে। তবে মনের বর্তমান অবস্থায় সেটা ক্ষমার যোগ্য। আমি যোগী নই, সন্ন্যাসীও নই, একজন বুদ্ধিহীন মানুষ। এত উঁচু আদর্শ সামনে রেখে চলা আমার সাধ্য নয়। সৌন্দর্য কি অদ্ভুত জিনিষ! লোকে বলে অধর্মের ফলে মুখের শোভা নষ্ট হয়। কিন্তু অধর্মের ফলে এই মেয়েদের সৌন্দর্য্য বেড়েই যায়। শোনা যায় মুখ হচ্ছে হৃদয়ের দর্পণ, কিন্তু কথাটা মিথ্যে বলে মনে হচ্ছে।

সদন মনকে আবার সংযত করল আর মন থেকে ঐ চিন্তা দূর করার জন্য অন্য ভাবে বিচার করতে বসল। হ্যাঁ, ঐ মেয়েরা কোমল, সুন্দর তো নিশ্চয়, কিন্তু এই সব স্বর্গীয় গুণের কি রকম দুরুপযোগ করছে! নিজেদের কতো নিচে নামিয়ে আনছে! রেশমী শাড়ী আর চকমকে গয়নার লোভে নিজের আত্মাকে বিক্রি করে দিয়েছে। যে চোখে প্রেমের জ্যোতি থাকার কথা, সেখানে দেখা যায় কটাক্ষ, কাপট্য আর কুচেষ্টার সমাবেশ, হৃদয়ে নির্মল প্রেমের স্রোতের বদলে রয়েছে বিষাক্ত দুর্গন্ধময় মলিনতা। কি অধঃপতন!

এই সিদ্ধান্তে সদন যেন শান্তি পেল। হেঁটে গঙ্গার ধারে গেল। এই সব চিন্তায় তার দেরি হয়ে গেছে। তাই যে ঘাটে সে রোজ স্নান করে সেখানে গেল না। সে ঘাটে এখন বেশ ভিড় হবে। তাই সে বিধবাশ্রমের ঘাটে গেল। ঘাটটা নির্জন। দূর বলে কম লোক এখানে আসে।

ঘাটের কাছে সদন দেখল ঘাট থেকে একজন স্ত্রীলোক আসছে। দেখা মাত্রই চিনল। সুমন, কিন্তু কত্রো বদলে গেছে। সেই লম্বা চুল নেই, গতিতে নেই কোমলতা, গোলাপী ঠোঁটে নেই হাসি, চোখে নেই চঞ্চলতার চমক; সযত্ন-প্রসাধন, অলঙ্কারের জ্যোতি কিছু নেই—পরনে শুধু সাদা শাড়ী। চলনে গাম্ভীর্য আর মুখে নৈরাশ্যের ভাব ফুটে আছে। যেন কাব্য সেই একই, শুধু অলঙ্কার বর্জিত-তাই সরল আর মর্মভেদী। তাকে দেখেই সদন বিহ্বল হয়ে ছুটেছিল কিন্তু তার রূপান্তর দেখে থমকে দাঁড়াল—যেন চিনতে ভুল হয়েছে, যেন সুমন নয় অন্য কোন স্ত্রীলোক। তার উৎসাহে ভাটা পড়ল, বুঝতে পারল না সে এত বদলে গেল কেন? আবার সুমনের দিকে তাকাল, সেও তাকে দেখছে কিন্তু সে দৃষ্টিতে প্রেমের বদলে চিন্তার আভাস, যেন সে পুরোনো কথা ভুলে গেছে বা ভুলতে চাইছে, যেন হৃদয়ের চাপা আগুন বেরিয়ে না পড়ে। সদনের মনে হল সে আমাকে নীচ, স্বার্থপর ভাবছে, অনুমান সত্যি কিনা জানবার জন্যে একটু পরে সদন আবার তার দিকে চাইল। চোখে চোখ মিলল, পরক্ষণেই সরে গেল।

তার অনুমান সত্যি বলে মনে হল। নিশ্চিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অভিমান। নিজেকেই ধিক্কার দিল। একটু আগেই তো মনকে বোঝালাম আর এর মধ্যেই কু বাসনা জেগে উঠল। সে সুমনের দিকে আর তাকাল না। সুমন মাথা নিচু করে ওর সামনে দিয়ে চলে গেল। সদন দেখল তার পা কাঁপছে। সে নড়ল না বা কোন ইসারা করল না। যেন দেখাতে চাইল, তুমি যদি আমার কাছ থেকে

এক ক্রোশ দূরে যেতে চাও তো আমিও শতক্রোশ দূরে যেতে রাজী আছি। কিন্তু খেয়াল হল না যে সে এক জায়গাতেই মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। মনের যে ভাবকে সে লুকিয়ে রাখতে চায় সেই ভাবই তাকে গ্রাস করল।

সুমন কিছু দূর এগিয়ে গেলে সে ঘুরে লুকিয়ে তার পিছনে চলল। দেখতে চায় সুমন কোথায় যায়, বাসনার কাছে বিবেক হার মানল।

৩৮

যেদিন বিয়ে না দিয়ে বরপক্ষ ফিরে গেল সেদিন থেকে কৃষ্ণচন্দ্র আর ঘর থেকে বের হননি। মন মরা হয়ে ঘরেই বসে থাকে। লোক সমাজে মুখ দেখাতে লজ্জা হত। দুশ্চরিত্রা সুমন সমাজের চোখে যতখানি নামিয়েছে, নিজের চোখে নিজেকে আরো বেশী অপরাধী মনে হয়। তিনি যেন আর অপমান সইতে পারছিলেন না। তিন চার বছর জেল খেটেও তাঁর নিজেকে এত ছোট মনে হয়নি। নিজের কুকর্মের জন্যেই দণ্ডভোগ করেছি ভেবে সান্ত্বনা পেয়েছিলেন। কিন্তু এ কলঙ্কে তাঁর আত্মগৌরব মাটিতে মিশে গেল। যে সব ছোটলোকদের সঙ্গে বসে গাঁজা খেতেন তাদের কাছেও যেতে পারতেন না। নিজেকে তাদের চেয়েও ছোট ভাবতেন। মনে হত সারা সংসার তাঁর নিন্দা করছে, লোকে বলাবলি করছে এর মেয়ে… কথাটা মনে আসতেই লজ্জায় দুঃখে ভেঙে পড়তেন।

ওঃ! আগে যদি জানতাম ওর জন্যে মর্যাদা যাবে তবে তখনই গলা টিপে মেরে ফেলতাম। বুঝছি ওর কপাল খারাপ; বড় ঘরে পড়বার মতো মেয়ে, ভোগ-বিলাস অন্ত প্রাণ। কিন্তু জানতাম না যে তার মন এত দুর্বল। সংসারে কার দিন একভাবে কাটে? বিপত্তি সকলেরই হয়। অনেক বড় ঘরের বৌ অন্ন-বস্ত্রের জন্য লালায়িত, কিন্তু তাদের মুখে এ সব চিন্তার চিহ্নও দেখা যাবে না। কেঁদে কেঁদে তাদের দিন কাটে কিন্তু চোখের জল কারো চোখে পড়ে না। তারা মরে যাবে তবু কারো করুণার প্রত্যাশী হয় না; তারা দেবী। কুল মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকে আর সেটা বজায় রেখেই মরে। কিন্তু এই দুষ্ট, অভাগী…

আর তার স্বামীটাও এমন কাপুরুষ যে তাকে কেটে ফেলল না! ঘরের বাইরে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই তার গলা টিপে মারল না কেন? মনে হচ্ছে সেও নীচ, দুরাচারী, পুরুষত্বহীন। তার কুল-মর্য্যাদার জ্ঞান থাকলে এ ব্যাপার ঘটত না। তার অপমান বোধ না থাকুক, আমার আছে, আমিই সুমনকে এর শাস্তি দেব। যে হাতে তাকে পালন করেছি, খাইয়েছি সেই হাতেই তার গলায় চোপ দেব। তাকে খেলতে দেখে যে চোখ আনন্দ পেত, তাকে রক্তে ভাসতে দেখে

এবার সে তৃপ্তি পাবে। নষ্ট মর্যাদা উদ্ধারের অন্য কোন উপায় নেই। সংসার জানবে মর্যাদা রক্ষার জন্য পাপাচারীকে কেমন দন্ড দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে স্থির সংকল্প হয়ে কৃষ্ণচন্দ্র উদ্দেশ্য সাধনের উপায় ভাবতে লাগলেন। জেলে থাকতে তিনি আসামীদের কাছে হত্যার নানা উপায় শিখেছিলেন। রাতদিন এই সবই আলোচনা হত। তিনি ভেবে দেখলেন যে সব চেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে তাকে তলোয়াল দিয়ে কেটে ফেলা আর থানায় গিয়ে এর খবর দেওয়া। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে যা বয়ান দেব তা শুনে লোকের চোখ খুলবে।

বেশ খুশি মনে এবার তিনি বয়ানের কল্পনা করতে বসলেন। প্রথমে সমাজের বিলাসিতার একটু উল্লেখ করে পুলিসের সব কুকীর্তি প্রকাশ করব, তারপর বৈবাহিক অত্যাচারের বর্ণনা। পণপ্রথার উপর এমন আঘাত করবো যে লোকে থ হয়ে যাবে। আমরা কি করে আমাদের কুল মর্যাদা নষ্ট করি সেইটে হবে বয়ানের প্রধান কথা। আমরা ভীরু বলে, প্রাণভয়ে, লোক নিন্দার ভয়ে, অন্যায় সন্তান প্রেমে, আত্মগরিমাহীন বলেই এইসব পাপাচরণ লুকোই, প্রকাশ করতে চাই না। এর ফলেই দুর্বলের সাহস এত বেড়ে গিয়েছে।

কৃষ্ণচন্দ্রের এই পরিকল্পনা তৈরী হয়ে গেলেও তিনি ভেবে দেখলেন না শান্তার কি গতি হবে। এই অপমানের চিন্তায় তাঁর অন্য কথা ভাববার অবসর ছিল না। তিনি যেন সন্তানকে মৃত্যুশয্যায় ফেলে রেখে শত্রু নিধনে উদ্যত হয়েছেন। ডিঙিতে বসে জলে সাপ দেখে তাকে মারতে গিয়ে এমন দাপাদাপি করলেন যে ডিঙি ডুবে যাবার কথা তাঁর মনে পড়ল না।

সন্ধ্যা নেমেছে। সুমনকে হত্যার জন্য আজই রওনা হবেন স্থির করেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র, এ সময়ে তাঁর মন একটু বিষণ্ণ হয়ে পড়েছে। ভয়ঙ্কর কাজ করতে যাবার আগে মনে এমনই উদাস ভাব আসে। এ ক'দিন রাগে মন উত্তেজিত আর উন্মত্ত হয়েছিল, এখন সেটা স্তিমিত হয়েছে। হাওয়া যেমন কিছুক্ষণ জোরে বইবার পর মন্দগতি হয়ে পড়ে। মনের এই অবস্থায় উদাসীনতা খুবই উপযোগী।

উদাসীনতা হচ্ছে বৈরাগ্যের এক সূক্ষ্ম স্বরূপ যা দিয়ে মানুষ অল্প সময়ের জন্য নিজের জীবন নিয়ে বিচার করবার শক্তি পায়, সে সময় পূর্বস্মৃতি মনে জেগে ওঠে। কৃষ্ণচন্দ্রের বিগত আনন্দময় জীবনের কথা মনে পড়ছিল যখন রোজ সন্ধ্যায় মেয়ে দুটোকে নিয়ে বেড়াতে যেতেন। কখনো সুমনকে কোলে নিতেন, কখনো শান্তাকে, ঘরে ফিরে এলে গঙ্গাজলী ছুটে এসে মেয়েদের কত আদর করত।

সুখের স্মৃতি সবচেয়ে বেশি আনন্দ দেয়। যে জঙ্গল ও পাহাড় একদিন নির্জন আর বন্ধুর মনে হত, যে নদী আর ঝিলের ধার দিয়ে যাবার সময় তাদের দিকে চোখ পড়ত না, কিছুদিন পরে তারাই মনোরম রূপ নিয়ে স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে, আবার তাদের দেখবার আকাঙ্খা জাগে। কৃষ্ণচন্দ্রও সেই বিগত দিনের স্মরণে অভিভূত হয়ে গেলেন। চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরতে লাগল।

হায়! সেই আনন্দময় জীবনের এই বিষাদময় পরিণতি! যে মেয়েকে কোলে পিঠে করে খেলিয়েছি তাকেই আজ হত্যা করতে যাচ্ছি? সুমনের জন্য করুণা হল। আমি কি এত নিষ্ঠুর হয়ে গেছি যে, যে মেয়ে এতদিন নয়নের মণি ছিল সে আজ কুঁয়োয় পড়ে গেছে বলে তাকে পাথর ছুঁড়ে মারব? কিন্তু এ ভাব কৃষ্ণচন্দ্রের মনে বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। সুমনের অপরাধের সব চেয়ে ঘৃণ্য অংশ হচ্ছে এই যে তার দরজা আজ সকলের জন্যে খোলা। হিন্দু, মুসলমান সবারই সেখানে অবাধ প্রবেশ। কথাটা মনে আসতেই কৃষ্ণচন্দ্রের হৃদয় লজ্জা আর গ্লানিতে ভরে গেল।

এই সময় পণ্ডিত উমানাথ তাঁর কাছে এসে বলল—আমি উকিলের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি মামলা রুজু করবার পরামর্শ দিয়েছেন।

কৃষ্ণচন্দ্র চমকে উঠে বললেন—কিসের মামলা? কার ওপর?

উমা—ওই যারা বিয়ে দিতে এসে বর ফিরিয়ে নিয়ে গেছে।

কৃষ্ণ—এতে কি হবে?

উমা—হয় তিনি আবার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবেন, নয়তো তাঁকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

কৃষ্ণ—এতে কি বদনাম আরও ছড়াবে না?

উমা—বদনাম যা হবার তাতো হয়েছেই, আর ভয় কিসের? আমি এক হাজার টাকা তিলকে দিয়েছি, খাওয়া দাওয়ায় চার পাঁচশো খরচ হয়েছে। এসব ছাড়ব কেন? এই টাকা গরীব কুলীনকে দিলে সে খুশি হয়ে বিয়ে করতে রাজী হবে। হাটে হাঁড়ি ভাঙবে এই শিক্ষিত মহাত্মাদের।

কৃষ্ণচন্দ্র দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—আগে আমায় বিষ এনে দাও, তারপর তুমি মামলা দায়ের কর।

উমানাথ রাগ করে বলল—আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন?

কৃষ্ণচন্দ্র—মামলা করার কথা কি স্থির করে ফেলেছ?

উমা—হ্যাঁ, আমি ঠিক করে ফেলেছি, কাল শহরের বড় বড় উকিল-ব্যারিস্টার হাজির ছিলেন। এ ধরনের মামলা এই প্রথম। তাঁরা অনেক দেখে শুনে এই পরামর্শ দিলেন। দুজন উকিলকে বায়না পর্যন্ত দিয়ে এসেছি।

হতাশ হয়ে কৃষ্ণচন্দ্র বললেন—ভালো কথা। মামলা দায়ের করে দাও।

উমা—আপনি এ জন্যে অসন্তুষ্ট হচ্ছেন কেন?

কৃষ্ণ—তুমিই যখন বুঝতে পারনি তখন আমি আর কি বলব? যে কথা এখন দু চার গাঁয়ে ছড়িয়েছে সেটা এবার সারা শহরে ছড়িয়ে পড়বে। সুমনকেও এজলাসে ডাকা হবে। আমার নাম অলিতে গলিতে ছড়িয়ে পড়বে।

উমা—এসবে ভয় করলে চলবে কেন? আমাকেও তো দুটো মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। এ কলঙ্ক মাথায় নিয়ে তাদের বিয়েতে কেন বাধা সৃষ্টি করি?

কৃষ্ণ—তা'হলে তোমার মামলা লড়ার কারণ হচ্ছে তোমার নামের কলঙ্ক

এড়ানো।

উমানাথ গর্বের সঙ্গে বলল—আপনি যদি এই মানে করেন তবে তাই। বর-পক্ষ আমার বাড়ীর দরজা থেকে ফিরে গেছে। লোকে ভুল করে ভাবছে সুমন আমার মেয়ে। গোটা শহরে আমার নামই ছড়াচ্ছে। আমার দাবী হবে দশ হাজার। যদি পাঁচ হাজারের ডিগ্রীও হয় তো শান্তার বিয়ে ভালো বংশে হতে পারবে। আপনি তো জানেন মিষ্টির লোভে লোকে এঁটো কুড়িয়ে খায়। টাকার লোভ না দেখালে শান্তার বিয়ে কি হবে? যে ভাবেই হোক কুলে কালি তো পড়েছে। আগে যারা আমার সঙ্গে সম্বন্ধ করতে পারলে কৃতার্থ বোধ করত, তারাই এখন ভারি থলি না পেলে আমার সঙ্গে কথাই বলবে না। সমস্যা এই খানেই।

কৃষ্ণচন্দ্র বললেন—ভালো কথা, তুমি মামলা দায়ের করে দাও।

উমানাথ চলে গেলে কৃষ্ণচন্দ্র আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন—প্রভু, এবার আমায় টেনে নাও, এ দুর্দশা আর সইতে পারছি না—আজ তিনি অপমানটা বাস্তবিক অনুভব করলেন। বুঝলেন যে সুমনকে দণ্ড দিলে এ কলঙ্ক দূর হবে না। কামড়াবার পরে সাপকে মারলে তার বিষ নামে না। তাকে হত্যা করলে উপহাস ছাড়া আর কিছুই মিলবে না। পুলিস ধরবে, মাসের পর মাস দুর্গতি ভোগ করবো, তারপর ফাঁসি কাঠে চড়ানো হবে। এর চেয়ে তো ডুবে মরা ভাল। যে প্রদীপের আলোয় এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখা যাচ্ছে সেইটে নিভিয়ে দি। হায়! হতভাগী সুমন শান্তাকেও সঙ্গে নিয়ে ডুবল। তারও সর্বনাশ করল। ভগবান! এখন তুমিই তার রক্ষক। অসহায় মেয়েটার তুমি ছাড়া আর কোন আশ্রয় নেই। শুধু আমায় এখান থেকে টেনে নাও যেন নিজের চোখে ওর দুর্দশা না দেখতে হয়।

একটু পরে শান্তা কৃষ্ণচন্দ্রকে খাওয়ার জন্য ডাকতে এল। বিয়ের দিন থেকে আজ পর্যন্ত কৃষ্ণচন্দ্র তার দেখা পান নি। এখন মেয়ের দিকে করুণ চোখে তাকালেন। প্রদীপের আবছা আলোয় দেখলেন তার মুখে এক অলৌকিক শোভা, চোখে নির্মল জ্যোতি, শোক বা মালিন্যের আভাসটুকুও নেই। সদনকে দেখা অবধি তার হৃদয়ে এক স্বর্গীয় বিকাশ অনুভব হতে থাকে। মনে হয় হৃদয়ে এক নির্মল ভাবের স্রোত বইছে। তার মনে এক অদ্ভুত ভাব জেগেছে। যে মাসীর সঙ্গে সরল মনে কথা বলত না, আজকাল ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার পা টেপে। বোনদের উপর আর ঈর্ষার লেশমাত্র নেই। হাসিমুখে কুঁয়ো থেকে জল তোলে। যাঁতা ঘোরাতে আনন্দ পায়। তার জীবনে প্রেম এসেছে। সদনকে না পেলেও সদনের চেয়ে ভালো জিনিষ পেয়েছে। সে হচ্ছে সদনের প্রতি প্রেম।

শান্তাকে প্রফুল্ল দেখে কৃষ্ণচন্দ্র বিস্মিত হলেন, ভয় পেলেন। মনে হল শোকের বিষম বেদনায় উন্মাদের রূপ নিচ্ছে। তাঁর ধারণা হল যে সে তার দুঃখের

জন্য তাঁকেই দোষী ভাবছে, কাতর নয়নে তার দিকে চেয়ে ডাকলেন—শান্তা!

শান্তা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাল।

কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ঠিত হয়ে বললেন—এই চার বছর ধরে আমার জীবনটা যেন ঘূর্ণিপাকে পড়েছে। সর্বস্বান্ত হয়েছি কিন্তু সন্তানের দুর্গতি চোখে দেখতে পারছি না। জানি এসব আমার কুকর্মের ফল। গোড়াতেই যদি সাবধান হতাম তো তোমাদের এ দুর্গতি হত না। আমি আর বেশি দিন বাঁচবো না। যদি কখনো অভাগী সুমনের সঙ্গে দেখা হয় তবে বোলো যে আমি তাকে ক্ষমা করেছি। সে যা করেছে তার জন্যে আমিই দায়ী। দু দিন আগে পর্যন্ত তাকে মেরে ফেলবার সংকল্প ছিল কিন্তু ঈশ্বর আমায় সে পাপ থেকে বাঁচিয়েছেন। তাকে বোলো সে যেন তার অভাগা বাপ আর অভাগী মায়ের আত্মাকে ক্ষমা করে।

বলতে বলতে কৃষ্ণচন্দ্র থেমে গেলেন। শান্তা চুপ করে দাঁড়িয়ে। বাবার জন্য তার মায়া হল। পরে কৃষ্ণচন্দ্র বললেন—তোমার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে।

শান্তা—বলুন, কি আদেশ?

কৃষ্ণচন্দ্র—আর কিছু নয়, শুধু দেখো মনে যেন শান্তি থাকে। তাহলে অতি দুর্দিনেও তোমার মন বিচলিত হবে না।

শান্তা বুঝল যে বাবা আরো কিছু বলতে চান কিন্তু সঙ্কোচবশে তা না বলে কথা পালটে দিলেন। তাঁর মনের কথা তার কাছে লুকোনো রইল না। সে সগর্বে মাথা উঁচু করে তাকাল। তার আত্মমগ্ন চোখ দুটি সব কিছু স্পষ্ট করে যা জানিয়েছিল তা মুখের কথার চেয়েও বেশী। সে মনে মনে বলল, যার পাতিব্রত্য আছে তার ভাবনা কি? এতেই সুখ, শান্তি, সন্তোষ সব কিছু আছে।

মাঝ রাত পেরিয়ে গেছে। কৃষ্ণচন্দ্র ঘর থেকে বের হলেন, প্রকৃতি সুন্দরী কুয়াশার গাঢ় চাদর ঢেকে ঘুমে যাচ্ছেন। আকাশে চাঁদ মুখ লুকিয়ে ছুটে চলেছে, কোথায় কে জানে?

কৃষ্ণচন্দ্রের মনে গঙ্গাজলীকে দেখবার তীব্র আকাংখা হল, তার জীবনের একটা সুখস্মৃতি হল গঙ্গাজলী। নৈরাশ্যের ঘন অন্ধকারে এই জ্যোতি যেন তার মনকে টানছে। কিছুক্ষণ দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এগিয়ে গেলেন। মনে হল গঙ্গাজলী যেন আকাশে বসে তাঁকে ডাকছে।

এ সময় কৃষ্ণচন্দ্রের মনে কোন অভিলাষ বা চিন্তা ছিল না। সংসারের উপর মন বিরক্ত হয়ে আছে। তাঁর একমাত্র ইচ্ছে, শীঘ্র গঙ্গাতীরে পৌঁছে অগাধ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ি। ভয় ছিল, সাহস না উবে যায়। সঙ্কল্প জিইয়ে রাখতে তিনি ছুটতে লাগলেন।

কিন্তু একটু ছুটেই আবার থমকে দাঁড়িয়ে ভাবলেন, জলে ঝাঁপিয়ে পড়া কি এমন শক্ত কাজ, মাটি থেকে পা খসালেই কাজ শেষ। কথাটা মনে হতেই তিনি কেঁপে উঠলেন। হঠাৎ মনে হল, অন্য কোথাও চলে গেলে কেমন হয়? এখানে

না থাকলে মান অপমান শ্নবো কি করে ? কিন্তু এ চিন্তাকে আর প্রশ্রয় দিলেন না। মোহের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর ধার্মিক স্বভাব ছিল না, অধিকন্তু অজানার ভয়ে ব্ক কাঁপছিল বলে সঙ্কল্প অটুট রাখতে মনকে বোঝালেন ঈশ্বর কর্ণাময়। আত্মা নিজেকেই ভুলে গেছে। যেন কোন শিশ্ তার বন্ধ্র খেলনা ভেঙ্গে ফেলে নিজের বাড়ী ফিরতে ভয় পাচ্ছে।

কৃষ্ণচন্দ্র এগিয়ে যেতে যেতে চার মাইল হে'টে এলেন। যতই গঙ্গার কাছে আসেন ব্কের কাঁপ্নি ততই বাড়ে। ভয়ে অস্থির হয়ে ওঠেন। এই মানসিক দ্র্বলতা দ্র করতে তিনি কখনো জোরে হে'টেছেন, কখনো নিজেকে তিরস্কার করেছেন। আমি কতো নির্লজ্জ, এতো দ্র্দশাতেও মরতে ভয় পাচ্ছি ? এমন সময় গানের আওয়াজ কানে এল। যতই এগিয়ে যান আওয়াজ ততই কাছে আসে। গায়ক তাঁর দিকেই আসছে। নিস্তব্ধ রাতে গানটা শ্নতে ভাল লাগছিল। মন দিয়ে শ্নতে লাগলেন :

'হরি সোঁ ঠাকুর ঔর ন জন কো।
জেহি জেহি বিধি সেবক সুখ পাওয়ে তেহি বিধি রাখত তিন কো ॥
হরি সোঁ ঠাকুর ঔর ন জন কো।
ভুখে কো ভোজন জ্ উদর কো তৃষ্ণা তোয় পট তন কো ॥
লাগ্যো ফিরত সুরভি জ্যোঁ সুত সংগ উচিত গমন গৃহ বন কো ॥
হরি সোঁ ঠাকুর ঔর ন জন কো ॥'

[হরির মতো কেউ আপন নয়। সেবক যে ভাবে সুখ চায় তাকে সেই ভাবেই রাখেন। ক্ষ্ধায় আহার, তৃষ্ণার জল তিনি জোগান। ঘরে বাইরে সর্বত্র তিনি সন্তানের সঙ্গেই থাকেন।]

গানে মাধ্র্য-রসের অভাব থাকলেও শাস্ত্রীয় গান। এ শাস্ত্রে তাঁর ভাল জ্ঞান ছিল। শ্নে কৃষ্ণচন্দ্র খ্ব আনন্দ পেলেন মনে শান্তি ফিরে এল।

গান বন্ধ হবার পর কৃষ্ণচন্দ্র দেখলেন এক দীর্ঘকায় জটাধারী সন্ন্যাসী তাঁর দিকে আসছেন। সাধ্ তাঁর নাম ধাম জিজ্ঞাসা করলেন; কথায় কথায় মনে হল সাধ্ তাঁকে চেনে, কৃষ্ণচন্দ্র এগিয়ে যাবার উদ্যোগ করতেই প্রশ্ন হল—এ সময় আপনি এদিকে কোথায় যাচ্ছেন ?

কৃষ্ণচন্দ্র—কিছ্ কাজ আছে।

সাধ্—মাঝরাতে গঙ্গাতীরে আপনার কি কাজ থাকতে পারে ?

র্ষ্ট হয়ে কৃষ্ণচন্দ্র বললেন—আপনি তো আত্মজ্ঞানী। আপনার জানা উচিত।

সাধ্—আমি তো আত্মজ্ঞানী নই, ভিখারী। এ সময়ে আপনাকে ওদিকে যেতে দেব না।

কৃষ্ণ—আপনি নিজের পথ দেখ্ন। কোন অধিকারে আমার কাজে বাধা

দিচ্ছেন ?

সাধু—অধিকার না থাকলে বাধা দিতাম না, আপনি আমায় চেনেন না, কিন্তু আমি আপনার ধর্মপুত্র। আমার নাম গজাধর পাণ্ডে।

কৃষ্ণচন্দ্র—আচ্ছা ! আপনিই গজাধর পাণ্ডে ? এ বেশ কবে থেকে ধরেছেন ? আপনার সঙ্গে দেখা করবার খুব ইচ্ছে ছিল। আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।

গজাধর—গঙ্গাতীরে এক গাছের তলায় আমার আস্তানা, সেখানে একটু বিশ্রাম করুন, সারা বৃত্তান্ত আপনাকে শোনাবো।

পথে দুজনের আর কোন কথা হল না। একটু পরে গাছের নিচে পৌছোলেন। সেখানে ধুনীতে একটা গুঁড়ি জ্বলছিল। মাটিতে খড় বিছানো, তার উপরে রয়েছে একটা হরিণের চামড়া, একটা কমণ্ডলু আর পুঁটলি বাঁধা খান কয়েক বই।

কৃষ্ণচন্দ্র আগুনের পাশে বসে বললেন—আপনি সাধু হয়েছেন ; সত্যি করে বলুন সুমনের এ প্রবৃত্তি কি করে হল ?

গজাধর আগুনের আলোয় মর্মভেদী দৃষ্টি দিয়ে কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখছিল। সে মুখে হৃদয়ের সব ভাব আঁকা দেখা যাচ্ছে। এখন আর সে গজাধর নেই, সৎসঙ্গ ও অনাসক্তি তার জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে দিয়েছে। সুমনের ব্যাপার যতই মনে বিচার করত ততই তার অনুতাপ হত। অনুতাপের ফলে তার মন সুমনের প্রতি উদার হয়ে পড়েছিল, কখনো কখনো মনে হত তার কাছে গিয়ে তার পায়ে মাথা রাখি।

গজাধর বলল—এর জন্যে আমিই দায়ী। এসব আমার নির্দয় অমানুষিক ব্যবহারের ফল। সে ছিল সর্বগুণসম্পনা, বড় ঘরের গৃহিনী হবার যোগ্য। আমার মতো দুষ্ট, দুরাত্মা, দুরাচারী ব্যক্তি তার যোগ্য নয়। আমার স্থূল দৃষ্টিতে তখন তার গুণ চোখে পড়েনি। সে আমার কাছে কত কষ্ট ভোগ করেছে কিন্তু কখনো মুখভার করেনি। আমাকে কত আদর যত্ন করত। তার এ রকম ব্যবহারে আমার সন্দেহ হত সে বোধহয় কোন ফন্দী আঁটছে। তার সন্তোষ, ভক্তি, গাম্ভীর্য সব আমার দুর্বোধ্য ঠেকত। মনে হত এ সব তার কোন নতুন চাল। যদি সে ছোট খাটো জিনিষের জন্য ঝগড়া করত, কাঁদত, রাগত, অভিমান করত তাহলে আমি তাকে বিশ্বাস করতে পারতাম। তার উঁচু আদর্শই আমার অবিশ্বাসের কারণ, আমি তার সতীত্বে সন্দেহ করতে লাগলাম, শেষে আমার এমন অবস্থা হল যে একদিন রাতে এক সইয়ের বাড়ী থেকে ফিরতে একটু দেরী হওয়ায় আমি তাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলাম।

কৃষ্ণচন্দ্র মাঝপথে বলে উঠলেন—তোমার বুদ্ধি তখন কোথায় ছিল ? একটুও ভাবলে না যে তোমার নির্দয়তার ফলে কতো বড় কুলে কালি মাখাচ্ছ ?

গজাধর—মহাশয়, আমার যে কী হয়েছিল তা আজ কি করে বলি ? আমি আর তার খোঁজ করি নি। কিন্তু তার মন বড় পবিত্র ছিল। পাপ আচরণকে

ঘৃণা করত। এখন সে বিধবাশ্রমে থাকে, সবাই তার উপর সন্তুষ্ট। তার ধর্মনিষ্ঠা দেখে লোকে অবাক হয়ে গিয়েছে।

গঙ্গাধরের কথা শুনে সুমনের প্রতি কৃষ্ণচন্দ্রের মনোভাব একটু নরম হল। কিন্তু এদিকে তিনি যতটা নরম হলেন, অন্যদিকে ততটা কঠোর হয়ে পড়লেন। সাধারণ গতিতে প্রবাহিত জলধারা সামনে বাধা পেলে অন্যপথে আরো জোরে প্রবাহিত হয়। রোষ কষায়িত চোখে তিনি গঙ্গাধরকে দেখলেন যেন ক্ষুধার্ত সিংহ তার শিকার দেখছে। তিনি নিশ্চিত হলেন যে এর জন্যেই তাঁর কুল কলঙ্কিত হয়েছে, শুধু তাই নয়, সে সুমনের সঙ্গে অন্যায় ব্যবহারও করেছে। তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। নিজের দুষ্কৃতির জন্যে আজ সে লজ্জিত বলেই কি তাকে ছেড়ে দেওয়া যায়? কিন্তু ও আমাকে এসব কথা বলল কেন? হয়তো ভেবেছে আমি ওর কিছুই করতে পারব না। তাই হবে, নইলে কি নিজের অপরাধ এত নির্ভয়ে আমার কাছে স্বীকার করে?

কৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গাধরের মনোভাব বুঝতে পারেন নি। আগুনের দিকে তাকিয়ে কঠোর স্বরে বললেন—তুমি আমার কুলমর্যাদা ডুবিয়েছ, কোথাও আমার মুখ দেখাবার উপায় নেই। মেয়েটাকে প্রাণে মেরেছে, তার সর্বনাশ করেছ, তারপরেও আমার সামনে এমনভাবে বসে আছে যেন কোন মহাত্মা বসে আছেন, লজ্জায় তোমার ডুবে মরা উচিত।

গঙ্গাধর মাটি খুঁটছিল। মাথা তুলল না।

কৃষ্ণচন্দ্র আবার বললেন—তুমি দরিদ্র তাতে তোমার দোষ নেই। তুমি যদি স্ত্রীকে উচিত ভাবে ভরণ পোষণ করতে না পারো তাতেও তোমার দোষ দেওয়া যায় না, তুমি তার মনোভাব জানতে পার নি, তার সদ্গুণের মর্ম বোঝ নি এ জন্যেও তোমায় দোষী বলা যায় না। তোমার অপরাধ হচ্ছে তুমি তাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ। তুমি তাকে মেরে ফেললে না কেন? তার সতীত্বে যদি সন্দেহ ছিল তবে তার মাথা কেটে ফেললে না কেন? আর যদি এ সাহস ছিল না তবে নিজেই মরলে না কেন? বিষ খেলে না কেন? যদি ওর জীবন শেষ করে দিতে তবে তার এ দুর্দশা হত না, আমার কুলেও কলঙ্ক পড়ত না। তুমি কি নিজেকে পুরুষ ভাবো? তোমার এই ভীরুতা, এই নির্লজ্জতার জন্যে ধিক্কার দিতে হয়। যে পুরুষ এত নীচ যে নিজের স্ত্রীকে অপরের সঙ্গে প্রেমালাপ করতে দেখেও তার রক্ত টগবগ করে ফোটে না, সে তো পশুরও অধম।

গঙ্গাধর এখন বুঝল যে সুমনকে ঘর থেকে তাড়াবার কথা বলে সে নিজেই নিজের ফাঁদে পড়েছে। অনুশোচনা হল উদারতা দেখাতে গিয়ে এত বাড়াবাড়ি করলাম কেন? তিরস্কারের মাত্রা আশাতীত হয়ে গেল, সে বুঝতে পারে নি যে তিরস্কার এমন ভয়াবহ হবে যাতে সে নিজে কষ্ট পাবে। অনুতপ্ত হৃদয় চায় যেন তিরস্কারে সহানুভূতি আর সহৃদয়তা থাকে; অপমানসূচক কঠোর তিরস্কার শুনতে চায় না, পাকা ফোড়ায় নরুণের খোঁচা দরকার, পাথরের আঘাত নয়।

গজাধর নিজের অনুতাপ প্রকাশ করবার জন্যে আপসোস করছিল, সে এবার নিজের পক্ষ সমর্থন করবার জন্য তৈরি হল।

কৃষ্ণচন্দ্র গর্জন করে বললেন—তুমি ওকে মেরে ফেললে না কেন?

গজাধর গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল—আমার হৃদয় এত কঠোর নয়।

কৃষ্ণ—তবে ঘর থেকে তাড়ালে কেন?

গজাধর—কারণ তার হাত থেকে ছাড়া পাবার অন্য কোন উপায় ছিল না।

কৃষ্ণচন্দ্র মুখ বেঁকিয়ে বললেন—কেন, বিষ খেতে তো পারতে।

গজাধর রেগে বলল—অনর্থক প্রাণ দেব?

কৃষ্ণ—অনর্থক বেঁচে থাকার চেয়ে অনর্থক মরা ভালো।

গজাধর—আমার বেঁচে থাকা আপনি নিরর্থক বলতে পারেন না। আপনাকে পণ্ডিত উমানাথ বলেন নি যে আমি ভিক্ষাবৃত্তি করেই শান্তার বিয়ের জন্যে ১৫০০ টাকা দিয়েছি আর এখন তাঁকে আরো ১০০০ টাকা দিতে যাচ্ছি যাতে তিনি তার বিয়ে দিতে পারেন।

কথাটা বলেই গজাধর থেমে গেল! তার মনে হল, এ কথাটা বলে আমি নীচ মনের পরিচয় দিলাম। সঙ্কোচবশে সে মাথা নিচু করল।

কৃষ্ণচন্দ্র সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললেন—সে তো এ বিষয়ে আমায় কিছু বলে নি।

গজাধর—কথাটা এমন কিছু নয় যে আপনাকে বলতে হবে। প্রসঙ্গ বসেই কথাটা বলে ফেলেছি, সেজন্যে মাপ করবেন। আমি বলতে চাই যে আত্মঘাতী হলে সংসারের কোন উপকার করতে পারতাম না। এই কলঙ্কের ফলেই নিজের জীবনকে উজ্জ্বল করতে বাধ্য হয়েছি। সুপ্ত আত্মাকে জাগাবার জন্য দৈবের প্রভাবে আমরা ভুল করে কষ্ট পাই আর চিরকালের জন্য সতর্ক হই। শিক্ষায়, উপদেশে, সৎসঙ্গে আমাদের উপর যত সুপ্রভাব পড়ে আমাদের ভুলের পরিণাম দেখে তার বেশী প্রভাবিত হই। হয়তো আপনি একে আমার ভীরুতা মনে করছেন কিন্তু এই ভীরুতাই আমাকে শান্তি দিয়েছে, সৎকাজে প্রেরণা যুগিয়েছে। একজনের সর্বনাশ করে আমি আজ শত শত অভাগিনীকে উদ্ধার করবার যোগ্য হয়েছি। আমার এই সৎ প্রেরণা সুমনকেও প্রভাবিত করেছে দেখে আমি আনন্দ পাই। নিজের কুটিরে বসে আমি কয়েকদিন তাকে গঙ্গাস্নান করতে যেতে দেখেছি। তার শ্রদ্ধা আর ধর্মনিষ্ঠা দেখে বিস্মিত হয়েছি। তার মুখে শুদ্ধ অন্তঃকরণের বিমল আভা ফুটছে। আগে ছিল সুপটু গৃহিনী, এখন হয়েছে পরম বিদুষী। আমার বিশ্বাস একদিন সে রমণী সমাজে রত্ন বলে গণ্য হবে।

কৃষ্ণচন্দ্র প্রথমে কথাগুলো শুনছিলেন যেন একজন চতুর গ্রাহক দোকানী অনুনয় ভরা কথা শুনছে। গ্রাহক কখনও ভোলে না যে দোকানী নিজে স্বার্থেই কথা বলে যাচ্ছে। কিন্তু কথাগুলোর প্রভাব ধীরে ধীরে পড়তে লাগল। কৃষ্ণকান্ত বুঝলেন আমি এমন লোককে কটু বাক্য বলে দুঃখ দিয়েছি যে নিজের

ভুলের জন্য আন্তরিকভাবে লজ্জিত আর আমার জন্যেই এত সব করছে, উঃ! আমি কতো কৃতঘ্ন! এই চিন্তায় তাঁর চোখে জল এসে গেল। সরল মানুষ হচ্ছে মোমের মতো, যত শীঘ্র শক্ত হয় তত শীঘ্রই নরম হয়ে পড়ে।

গঙ্গাধর তাঁর মুখের দিকে করুণ চোখে চেয়ে বলল—এখন আপনি সাধুর অতিথি হোন, সকালে আপনার সঙ্গে আমিও যাবো। এই কম্বলটায় আপনার শীত কাটবে।

কৃষ্ণচন্দ্র নম্রভাবে বললেন—কম্বলের দরকার নেই। এমনিই শুয়ে থাকবো।

গঙ্গাধর—আপনি ভাবছেন যে আমার কম্বল গায়ে দিলে আপনার দোষ লাগবে : কিন্তু এটা আমার কম্বল নয় এটা অতিথিদের জন্য আলাদা করে রাখা।

কৃষ্ণচন্দ্র আর আপত্তি করলেন না, ঠাণ্ডা লাগছিল, কম্বল মুড়ে শুয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু ঘুম শান্তি দিল না, স্বপ্ন বেদনা ফুটিয়ে তুলল। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, তিনি জেলখানাতে মৃত্যুশয্যায় পড়ে আছেন আর জেলের দারোগা তাঁর দিকে ঘৃণার চোখে তাকিয়ে বলছে, এখন তোমার রেহাই হবে না, এর মধ্যেই গঙ্গাজলী আর তাঁর বাবা খাটের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁদের মুখ বিকৃত, কালিমাখা, গঙ্গাজলী কেঁদে ফেলে বলল তোমার জন্যেই আমার এই দুর্দশা হয়েছে। বাবা রোষভরা চোখে তাকিয়ে বললেন—তুই বেঁচে থেকে আমার মুখে কালি মাখাবি এই আশা করেই কি তোর জন্ম দিয়েছিলাম? এ কলঙ্ক কোনদিন মিটবে না। অনন্ত কাল এ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, নিজে দু চারদিন বেঁচে থাকার জন্যে আমায় এই কষ্ট দিলি? এখনই তোকে মেরে ফেলব, বলে একটা কুড়ুল নিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের ঘুম ভেঙে গেল, বুক ধড়ফড় করছে, শোবার সময় ভুলে গিয়েছিলেন কি জন্য ঘর ছেড়ে এসেছেন। স্বপ্ন তাঁকে মনে পড়িয়ে দিল। নিজেকেই ধিক্কার দিলেন। আমার একটুও কর্তব্যজ্ঞান নেই। তিনি নিশ্চিত হলেন যে এটা স্বপ্ন নয়, দৈববাণী।

গঙ্গাধরের কথাগুলোর প্রভাব ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছিল। সুমন এখন সতী হোক কি সাধ্বী হোক, তাতে আমার মুখে যে কালি লেগেছে তা তো মুছবে না। মহাত্মা বলছেন, পাপের একটা সংশোধনের শক্তি আছে, আমি তো তা কোথাও দেখতে পাই না। আমিও তো পাপ করেছি কিন্তু এ শক্তি তো অনুভব করিনি। না:, এসব ওঁর শব্দজাল, নিজের কাপুরুষতাকে শব্দের আড়ম্বর দিয়ে ঢেকেছেন। এ সব মিথ্যে; পাপ থেকে পাপই উৎপন্ন হবে, পাপ থেকে পুণ্য হলে আজ সংসারে কোন পাপীই থাকত না।

ভাবতে ভাবতে তিনি উঠে বসলেন। গঙ্গাধর আগুনের পাশে শুয়ে আছে। কৃষ্ণচন্দ্র নিঃশব্দে উঠে গঙ্গার দিকে চললেন। স্থির সংকল্প করলেন এবার সব কষ্টের শেষ করে ছাড়ব।

চাঁদ ডুবে গেছে। কুয়াশা আরো ঘন হয়েছে। অন্ধকারে গাছ, পাহাড় সব এক হয়ে গিয়েছে। কৃষ্ণচন্দ্র এক মেঠো পথ ধরে এগোলেন। নজরের চেয়ে অনুমানের উপর ভর করে এগোতে হচ্ছিল। পাথরের টুকরো, ঝোপঝাড় এড়াবার কাজে এত ব্যস্ত ছিলেন যে নিজের অবস্থার কথা মনে ছিল না।

নদীর উঁচু পাড়ের কাছে পেঁছে আলোর আভাস পাওয়া গেল। তিনি নিচে নামলেন। মোটা কুয়াশার চাদর গায়ে গঙ্গার কাতর ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। চার পাশের অন্ধকার আর গঙ্গার মধ্যে পার্থক্য শুধু প্রবাহ। গঙ্গা যেন প্রবাহিত অন্ধকার। চারপাশে উদাস ভাব, কেউ মারা গেলে বাড়ী যেমন উদাস হয়ে পড়ে।

কৃষ্ণচন্দ্র নদীর ধারে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর মনে হল, হায়! আমার অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে। পলকের মধ্যে এ প্রাণ না জানি কোথায় চলে যাবে। জানিনা এর কি গতি হবে। সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ শেষ হচ্ছে আজ। হে ভগবান, এখন তোমার শরণ নিলাম, আমায় দয়া করো : হে ঈশ্বর তুমি আমায় দেখো।

এরপর তিনি একবার মনে জোর আনলেন। তাঁর মনে হল তিনি নির্ভয়। তিনি জলে নামলেন। জল ভীষণ ঠাণ্ডা। কৃষ্ণচন্দ্রের সারা শরীর কেঁপে উঠল, এগিয়ে চললেন। গলা জলে পৌঁছে একবার চারদিকের বিরাট অন্ধকার দেখলেন, সংসার-প্রেমের অন্তিম মুহূর্ত এসেছে। মনোবল, আত্মাভিমানের অন্তিম পরীক্ষা। এ পর্যন্ত যা কিছু করা হয়েছে তা হচ্ছে শুধু এই পরীক্ষার প্রস্তুতি। এখন ইচ্ছা ও মায়ার অন্তিম সংগ্রাম। মায়াপূর্ণ শক্তি দিয়ে তাঁকে নিজের দিকে টানল। সুমনকে বিদুষী বেশে দেখা গেল, শান্তা শোকের মূর্তি ধরে সামনে এল! এমন কি ক্ষতি হয়েছে? সাধু হয়ে যাই না কেন? আমি এমন কি বড়লোক যে সারা সংসার আমার নাম আর মর্যাদা নিয়ে আলোচনা করবে? এমনি কতো মেয়েই তো পাপের ফাঁদে পড়ে। সংসার কার খোঁজ রাখে? আমি মূর্খ, তাই ভাবছি সংসার আমাকে ছি ছি করবে। ইচ্ছাশক্তি প্রাণপণে এ তর্কের প্রতিবাদ করতে চাইল, কিন্তু বিফল হল—শুধু এক পা এগোনো বাকী। জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে শুধু এক পায়ের পার্থক্য। একপা পেছিয়ে আসা কত সহজ, কত সরল! এক পা এগিয়ে যাওয়া কত কঠিন, কত ভয়ঙ্কর!

কৃষ্ণচন্দ্র ফিরে আসার জন্যে পা তুললেন। মায়া নিজের অসাধারণ শক্তির কেরামতি দেখিয়ে দিল। বাস্তবে এটা সংসারের টান নয়, এটা অজানার ভয়।

এই সময়ে কৃষ্ণচন্দ্র বুঝতে পারলেন যে তিনি পিছনে ফিরে যেতে পারছেন না। আপনা থেকেই ধীরে ধীরে জলের দিকের দিকে পা পিছলে যাচ্ছে। জোরে চিৎকার করলেন, শীত শিথিল পা দুটো পিছনে সরাবার প্রাণপন চেষ্টা করলেন, কিন্তু কর্মের গতিতে তারা এগিয়ে গেল।

তিনি হঠাৎ গজাধরের ডাক শুনতে পেলেন, কৃষ্ণচন্দ্র চেঁচিয়ে উত্তর দিতে গেলেন। কিন্তু মুখ থেকে সব কথা বের হবার আগেই জলের স্রোতে কথা ডুবে

গেল যেন হঠাৎ হাওয়া লেগে প্রদীপ নিভে অন্ধকারে মিশে গেল। শোক, লজ্জা, চিন্তাকুল হৃদয়ের দাহ সব কিছু শীতল জলে শান্ত হয়ে গেল। গজাধর শুধু শুনতে পেয়েছিল 'আমি এখানে ডুবে যাচ্ছি' আর তারপর তরঙ্গের পৈশাচিক খেলার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেল না।

শোকাকুল গজাধর নদীর ধারে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, শব্দগুলো চারদিক থেকে তার কানে ভেসে আসছে। তার প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে পাশের পাহাড়ে, সামনের তরঙ্গে আর চারপাশের দুর্ভেদ্য অন্ধকারে।

৩৯

শোক সমাচার সকালেই অমৌলা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। সমবেদনা জানাতে গোণাগুনতি কয়েকজন ছাড়া উমানাথের বাড়ীতে আর কেউ এল না। স্বাভাবিক মৃত্যু হলে হয়তো শত্রুও এসে দুফোটা চোখের জল ফেলে যেত, কিন্তু আত্মহত্যা একটা সংঘাতিক সমস্যা। ব্যাপারটায় পুলিসের অধিকার, এ সময় মিত্রও শত্রুর মত ব্যবহার করল।

গজাধর যখন উমানাথকে খবরটা দিল তখন সে স্নান করছিল। খবরটা শুনে তার লেশমাত্র দুঃখ বা ঔৎসুক্য হল না। উলটে কৃষ্ণচন্দ্রের উপর রাগ হল। পুলিশের হাতকড়ার ভয়ে শোক চাপা পড়ে গেল। সেদিন স্নান পুজোয় তার অনেক সময় লাগল। সন্দিগ্ধ চিত্ত লোকের পরিস্থিতির বিচার শেষ হতে চায় না, তার সময় জ্ঞান চলে যায়।

জাহ্নবী খুব কান্নাকাটি করল। তার কান্না দেখে তার দু মেয়েও কাঁদতে লাগল। আশপাশের মেয়েরা সান্ত্বনা দিতে এসে গেল। তাদের পুলিসের ভয় নেই, তবে কান্নাকাটি শীঘ্রই শেষ হল। কৃষ্ণচন্দ্রের দোষের চেয়ে তাঁর গুণ বেশী ছিল। দুপুরে সরবৎ খেতে এসে উমানাথ কৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু কটূক্তি করলে জাহ্নবী আড়চোখে চেয়ে বলল—ছিঃ এ সব কথা কি এখন বলতে আছে!

উমানাথ লজ্জিত হল! জাহ্নবী মনের আনন্দ একলা ভোগ করছিল। আনন্দটা এত নীচ মনের পরিচয় দেয় যে সে উমানাথের কাছেও সেটা লুকিয়ে রাখতে চায়। প্রকৃত শোক এক শান্তা ছাড়া আর কারুর হয় নি। বাবাকে সামর্থহীন বুঝলেও বাবাই ছিল তার জীবনের একমাত্র অবলম্ব। আজ তাও গেল। কিন্তু এই নৈরাশ্য তার জীবনকে উদ্দেশ্যহীন করতে পারল না। তার হৃদয় আরো কোমল হয়ে পড়ল।

যাবার সময় কৃষ্ণচন্দ্র তাকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন সেটাই আজ তাকে যথেষ্ট প্রেরণা জোগাল। শান্তা হয়ে গেল সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। বর্ষার শেষ

বিন্দুর মতই বাণীর অন্তিম শব্দ কখনও নিষ্ফল হয় না। শান্তা আজকাল এমন কোন কথা বলত না যাতে বাবার মনে দুঃখ হয়। বাবা যখন বেঁচে ছিলেন তখন তাঁকে অবহেলা করলেও এখন তাঁর সম্বন্ধে বিরূপ চিন্তা মনে আসতে দেয় না। তার নিশ্চিত ধারণা ছিল যে ভৌতিক শরীর থেকে মুক্ত আত্মার কাছে ব্যক্ত অব্যক্ত কোন চিন্তাই অজানা থাকে না। যদিও জাহ্নবীকে সন্তুষ্ট করতে সে এখন আপ্রাণ চেষ্টা করে, তবু প্রতিদিনই তাকে দু চার বার বকুনি খেতে হয়। রাগ হলেও শান্তা মুখ চেপে সহ্য করত, একলা বসেও কাঁদত না। তার ভয় হত কাঁদলে বাবার আত্মা কষ্ট পাবে।

হোলির দিন উমানাথ নিজের দুই মেয়ের জন্যে ভালো শাড়ী কিনে আনল। জাহ্নবীও রেশমী শাড়ী বের করল, কিন্তু শান্তাকে পুরোনো আটপৌরে শাড়ী পরতে হল। শাড়ীতে জরির পাড় বসানো নেই বলে দু বোন মুখ ভার করে বসে আছে, আর শান্তা হাসিমুখে ঘরের কাজকর্ম করছে দেখে জাহ্নবীর তার জন্যে দয়া হল। সে নিজের একটা পুরোনো রেশমী শাড়ী বের করে শান্তাকে দিল। শান্তা নির্বিবাদে শাড়ীটা পরে পুরি মালপোয়া ভাজতে লেগে গেল।

একদিন শান্তা উমানাথের ধুতি কাচতে ভুলে গেল। সকালে স্নান করতে গিয়ে উমানাথ দেখে যে ধুতি ভিজে পড়ে রয়েছে। সে কিছু বলল না বটে কিন্তু জাহ্নবী এমন গাল মন্দ করল যে শান্তা কেঁদে ফেলল! এ দেখে উমানাথের দুঃখ হল। মনে হল দু মুঠো ভাতের জন্যে একে এত কষ্ট দিচ্ছি। ভগবানের কাছে এর কি জবাব দেব? জাহ্নবীকে কিছু বলল না বটে তবে ঠিক করল এ অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। শ্রাদ্ধ শান্তি চুকে গেলে উমানাথ মদন-সিংহের নামে মামলা দায়ের করার কাজে লেগে পড়ল। উকিলেরা বলেছিল যে তার জিত হবেই। পাঁচ হাজার টাকা পেলে কত উপকার হবে ভেবে উমানাথের আনন্দের সীমা রইল না। নতুন বাড়ী করবার কল্পনা মাথায় এল। সে ঘরের ছবি মনে আঁকা হয়ে গেল। উপযুক্ত জমির জন্যে কথাবার্তা শুরু হয়ে গেল। আনন্দ কল্পনাতে শুধু শান্তার কথাই মনে পড়ল না।

জাহ্নবীর অত্যাচার তাকে শান্তার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। গজাধরের দেওয়া হাজার টাকা মামলায় খরচের জন্য আলাদা করে রাখা ছিল। একদিন জাহ্নবীর সাথে এ বিষয়ে তার কিছু কথাবার্তা হল। একটা সুযোগ্য বরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, শান্তাও কথাটা শুনল। মোকদ্দমার কথা শুনে তার দুঃখ হলেও বুঝত এ সম্বন্ধে তার কিছু বলা অনুচিত কিন্তু বিয়ের কথা শুনে সে চুপ করে থাকতে পারল না। এক প্রবল প্রেরক শক্তি তার লজ্জা আর সঙ্কোচ দূর করে দিল। উমানাথ বেরিয়ে গেলে সে জাহ্নবীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—মামা তোমায় এখন কি বলছিলেন? জাহ্নবী বলল—কি আর বলবেন, নিজের দুঃখের কাহিনী গাইছিলেন। অভাগী সুমনের জন্যেই এই সব হলো, না হলে কি দু বার করে খাটতে হতো? এখন তেমন ভালো ঘরও মিলবে না, সুন্দর বরও

মিলবে না। একটু দূরে এক গাঁয়ে ছেলে দেখতে গিয়েছিলেন।

শান্তা মাটির দিকে চেয়ে উত্তর দিল—আমি কি তোমাদের এত কষ্ট দিচ্ছি যে আমায় দূর করতে ব্যস্ত হয়েছ? তুমি মামাকে বলো যে আমার জন্যে কষ্ট না করেন।

জাহ্নবী—তুমি হচ্ছ ওঁর আদরের ভাগ্নী, তোমার দুঃখ আর দেখতে পারছেন না। আমিও বললাম যে এখন ও সব থাক্। মামলার টাকা হাতে পেলে নিশ্চিন্ত হয়ে করো, তা আমার কথা মানবেন কেন?

শান্তা—আমাকে ওখানে পাঠিয়ে দিচ্ছ না কেন?

জাহ্নবী বিস্মিত হয়ে বলল—কোথায়?

শান্তা সরল ভাবে উত্তর দিল—চুনার বা কাশী।

জাহ্নবী—ছোট ছেলের মত কি যাতা বলছ? এমন হলে আর ভাবনার কি ছিল? ওরা যদি তোমায় ঘরে নিতে চাইতো তবে কি এই গণ্ডগোল পাকাতো?

শান্তা—বৌ করে না রাখলে ঝি করেই রাখবেন।

জাহ্নবী নির্দয়ভাবে বলল—বেশ তো তাই যাও। তোমায় মাথায় করে নিয়ে যাবেন আর অপমান সয়ে ফিরিয়ে আনবেন, এমন কাজ তোমার মামাকে দিয়ে হবে না। উনি ওদের মুখে ঝামা ঘসে টাকা আদায় করে ছাড়বেন।

শান্তা—মামী, তাঁরা যতই অভিমানী হোন না কেন, আমি দরজায় গিয়ে দাঁড়ালে আমার উপর তাঁদের দয়া হবে। আমার বিশ্বাস আমায় তাঁরা দরজা থেকে তাড়িয়ে দেবেন না। শত্রুও দরজায় এলে তাকে তাড়াতে লোকের সঙ্কোচ হয়। আর আমি তো—

জাহ্নবী এ নির্লজ্জতা আর সইতে পারল না; কথার মাঝে বলে উঠল চুপ কর্। লাজলজ্জা একেবারে ঘুচে গেছে। 'মান ন মান, ম্যয় তেরা মেহমান'! যে আমার খোঁজ নেয় না, লাখপতি হলেও তার দিকে মুখ তুলে চাই না, আমরা তো এই ঠিক করেছি। ওরা এখানে নাকে খৎ দিলেও তোর মামা ওদের তাড়িয়ে দেবে।

শান্তা কোন উত্তর দিল না। যে যাই বলুক সে ভাবত তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বিবাহিতা মেয়ের আবার অন্য ঘরে বিয়ে হবে—এটা তার অসহ্য মনে হত। বিয়ের দিনের এক মাস আগে থেকেই সদনের রূপগুণের প্রশংসা শুনে সে নিজেকে তার হাতে সঁপে দিয়েছিল। দ্বার পুজোর সময় দরজায় সদনকে নিজের স্বামী ভেবেই দেখেছিল, তাকে অপরিচিত মানুষ মনে হয় নি। এখন অন্য পুরুষের কল্পনা তার কাছে সতীত্বের উপর কুঠারাঘাত। এতদিন সদনকে স্বামী বলে ভেবে আজ তাকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না, তাতে সদন তাকে স্বীকার করুক বা না করুক। দ্বার পুজোর পরেই যদি সদন তার কাছে আসত, তবে সে তাকে স্বামী ভেবেই গ্রহণ করত, বিবাহ তো অগ্নিসাক্ষী, সিঁদুর দান নয়, শুধু মনের মিলন।

এতদিন শান্তার আশা ছিল যে কোন না কোন দিন সে স্বামীর ঘরে যাবে, স্বামীর পায়ে আশ্রয় পাবে কিন্তু আজ বিয়ে, মানে আবার বিয়ের কথা শুনে তার অনুরক্ত হৃদয় কেঁপে উঠল। সে নিঃসঙ্কোচে জাহ্নবীকে অনুরোধ করেছিল, আমায় স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে দাও, তার ক্ষমতা এই পর্যন্তই, এ ছাড়া কি আর করত সে? কিন্তু জাহ্নবীর নিষ্ঠুর উপেক্ষা দেখে তার ধৈর্য থাকল না। মনের চঞ্চলতা বাড়ল। রাতে সকলে শুয়ে পড়লে সে পদ্মসিংহকে একটা চিঠি লিখতে বসল। এই তার শেষ উপায়। এতেও নিষ্ফল হলে তার কর্তব্য সে স্থির করে ফেলেছিল।

চিঠি শীঘ্রই শেষ হল। কি লিখবে তা আগেই মনে ঠিক করে নিয়েছিল, বাকী ছিল শুধু লেখা:

"পূজ্য ধর্মপিতার চরণ কমলে সেবিকা শান্তার প্রণাম। আমি অতিশয় দুঃখে আছি। দয়া করে আমাকে আপনার চরণে আশ্রয় দিন। পিতাজী গঙ্গায় ডুবে প্রাণ দিয়েছেন। এখানে আপনাদের বিরুদ্ধে মামলা করার আলোচনা হচ্ছে। আমার পুনর্বিবাহের কথাবার্তা চলছে। শীঘ্র আমাকে উদ্ধার করুন। এক সপ্তাহ আপনার প্রতীক্ষায় থাকিব। তারপর আপনি এই অবলার আহ্বান আর শুনিতে পাইবেন না।"

এমন সময় জাহ্নবীর ঘুম ভেঙে গেল। মশার কামড়ে সারা গা ফুলে উঠেছে। চুলকোতে চুলকোতে বলল—শান্তা, কী হচ্ছে?

শান্তা নির্ভয়ে বলল—চিঠি লিখছি।

"কাকে?"

"নিজের শ্বশুরকে।"

"জলে ডুবে মরছিস না কেন?"

"সাত দিনের দিন মরবো।"

জাহ্নবী কোন উত্তর না দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। শান্তা খামের উপর ঠিকানা লিখে সেটা নিজের কাপড়ের পুঁটলিতে রেখে শুয়ে পড়ল।

৪০

কলেজে ঢোকার পরই পদ্মসিংহের প্রথম বার বিয়ে হয়েছিল, আর এম. এ. পাশ করার পর এক ছেলের বাপ হলেন। কিন্তু বালিকা-বধু শিশু পালনের মর্ম জানত না। জন্মের সময় শিশু হৃষ্টপুষ্ট হলেও ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল—শেষ পর্যন্ত ষষ্ঠ মাসে শিশু আর তার মা দুজনেই মারা গেল। পদ্মসিংহ স্থির করেছিলেন আর বিয়ে করবেন না, কিন্তু ওকালতি পাশ করার পর তাঁকে আবার বিয়ে করতে হল। সুভদ্রারাণী বধূবেশে তাঁর ঘরে এল। তার পরও সাত বছর কেটে গেছে।

প্রথম দু তিন বছর পদ্মসিংহ সন্তানের কথা ভাবেন নি। ভামা এ বিষয়ে কথা তুললে তিনি এড়িয়ে যেতেন। বলতেন, আমার ছেলে দরকার নেই। ছেলের বোঝা আমি সামলাতে পারবো না। এখনও সন্তান লাভের আশা আছে বলেই অধীর হতেন না।

কিন্তু যখন চার বছর কেটে গেল তখন একটু হতাশার ভাব দেখা দিল। চিন্তা হল, সত্যিই কি আমি নিঃসন্তান হয়েই থাকব? যতদিন যায় তত চিন্তা বাড়ে। জীবন যেন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হতে লাগল।

সুভদ্রার উপর যে সে টান নেই তা সুভদ্রা বুঝে গেল। তার দুঃখ হল বটে তবে এটা নিজের কপালের দোষ ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিল।

পদ্মসিংহ নিজেকে অনেক বোঝাতেন, তুমি ছেলে নিয়ে কি করবে? জন্ম থেকে পঁচিশ বছর পর্যন্ত তাকে খাওয়াও, খেলাও, পড়াও; তারপরও ভয় ছেলেটা মানুষ হবে কি না। আর যদি মরে গেল তো নাম ধরে কাঁদো। আর আমিই যদি মারা যাই তো তার জীবন নষ্ট। আমার এমন সুখ চাই না। কিন্তু এ সব চিন্তায় শান্তি মিলত না।

সুভদ্রাকে নির্দোষ ভেবে তিনি মনের ভাব লুকিয়ে সুভদ্রাকে আগের মতোই ভালবাসেন দেখাতে চাইতেন কিন্তু অন্তরে নৈরাশ্যের অন্ধকার থাকতে মুখে আলো ফুটবে কেন? সাধারণ বুদ্ধির মানুষও বুঝতে পারত যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে টান নেই। ভালোর মধ্যে এই যে সুভদ্রার পতিপ্রেম আর সেবায় কোন ঘাটতি ছিল না বরং দিনে দিনে তা বাড়তে লাগল। সে চাইছিল প্রেম ভালবাসা দিয়ে সন্তানের অভাবকে চেপে রাখতে। কিন্তু এই কঠিন কাজে সফল হত সেই বৈদ্যের মতো যে রোগীকে ওষুধের বদলে গান শুনিয়ে সারাতে চায়, ঘর সংসারের ছোট খাট ব্যাপারে অনুচিত হলেও সে স্বামীর মতেই সায় দিয়ে চলত, সব সময় নিচু হয়ে থাকত। আর যেদিন থেকে সদন এসেছে, কতোরার তার জন্যে বকুনি খেতে হয়েছে।

স্ত্রীর স্বামীর বর্শার আঘাত সহ্য করতে পারে, কিন্তু অপরের জন্যে স্বামীর রোষ দৃষ্টিও তার অসহ্য লাগে। সদন হয়ে দাঁড়াল সুভদ্রার চোখের কাঁটা। শেষে গতকাল ব্যাপারটা চরমে পৌঁছাল। ভীষণ গরম পড়েছে। মিসিরাইন (রাঁধুনী) কি কারণে আসে নি। সুভাদ্রাকে রাঁধতে হল। সে পদ্মসিংহের জন্যে লুচি ভাজল, কিন্তু গরমে অতিষ্ঠ হয়ে সদনের মোটা মোটা রুটি তৈরী করল।

খেতে বসে পদ্মসিংহ সদনের পাতে রুটি দেখে রাগে জ্বলে উঠে নিজের লুচি সদনের থালায় রাখলেন। সুভদ্রা রেগে কটূক্তি করল, পদ্মসিংহও সমান ঝাঁজে উত্তর দিলেন। কথা কাটাকাটি হতে হতে পদ্মসিংহ রেগে আসন ছেড়ে আসন ছেড়ে উঠে গেলেন। সুভদ্রা তাঁর মান ভাঙাবার চেষ্টা করল না। রান্না ঘর বন্ধ করে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। দুজনের একজনেরও রাগ শান্ত হল না।

আজ রাঁধুনী রান্না করেছে কিন্তু না পদ্মসিংহ খেয়েছেন, না সুভদ্রা। সদন

একবার এ'কে, একবার ও'কে খাওয়ার জন্যে অনুরোধ করছে। কিন্তু এক তরফে উত্তর মিলছে এখন খিদে নেই, আর অন্য তরফ থেকে উত্তর মিলছে, খেয়ে নেব'খন। ওটা কি আর বাদ পড়বে। ওটা বাদ দিতেই যদি পারি তবে একজনের এত লাঞ্ছনা হয়? আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে সুভদ্রা সদনের সঙ্গে হেসে কথাগুলো বলছিল অথচ সে-ই হচ্ছে ঝগড়ার মূল কারণ।

তৃতীয় প্রহরে পদ্মসিংহ বিছানা থেকে উঠে হাই তুলছিলেন। মন সুভদ্রার উপর বিষিয়ে রয়েছে। সুভদ্রা ছাড়া অপর যে কোনও লোকের জন্য সহানুভূতি আছে। এমন সময় ডাকপিয়ন তাঁকে একটা বেয়ারিং চিঠি দিল। তিনি অপ্রসন্ন চোখে পিয়নকে দেখলেন যেন সে বেয়ারিং চিঠি এনে অপরাধ করেছে। প্রথমে চিঠি ফেরৎ দেবার ইচ্ছে হল, হয়তো কোন গরীব মক্কেল কাঁদুনি গেয়ে চিঠি লিখেছে। পরে একটু ভেবে চিঠিটা নিয়ে খুলে পড়তে লাগলেন। ওটা ছিল শান্তার চিঠি। একবার পড়ে টেবিলের উপর রেখে দিলেন। একটু পরে আবার তুলে পড়লেন, তারপর ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন। মদন সিংহ যদি সেখানে উপস্থিত থাকতেন তো তাঁকে চিঠিটা দেখিয়ে বলতেন এটা আপনার কুলমর্য্যাদার অভিমান আর লোকনিন্দার ভয়ের ফল। আপনি একজন লোকের প্রাণ নিলেন—এর পাপ আপনার হবে।

মামলার কথাটা পড়ে তিনি যেন আনন্দ পেলেন। মামলা দায়ের হলে খুব ভালো হবে। তাঁর কৌলীন্যগর্ব ধুলোয় মিশে যাবে। উমানাথ নিশ্চয় ডিগ্রী পাবে আর তখন ভাই সাহেব টের পাবেন কুলীনতার দাম কত বেশী। হায়! অবলা মেয়েটা না জানি কেমন ভাবে দিন কাটাচ্ছে?

পদ্মসিংহ চিঠিটা আবার পড়লেন। পড়ে নিজের উপর একটা শ্রদ্ধার ভাব জাগল। চিঠিটা তাঁর ন্যায় নিষ্ঠা জাগিয়ে দিয়েছে। 'ধর্মপিতা' শব্দটা তাঁকে বশীভূত করল। কথাটা তাঁর মনে বাৎসল্য রস সঞ্চার করল। জামা কাপড় বদলে তিনি বিঠলদাসের বাড়ী গেলেন। সেখানে জানা গেল যে তিনি অনিরুদ্ধ সিংহের বাড়ীতে গিয়েছেন। তৎক্ষণাৎ সাইকেল সেদিকে ফেরালেন। শান্তার বিষয়ে তিনি এখনই কিছু স্থির করে ফেলতে চাইছিলেন, ভয় ছিল যে দেরী হলে এ উৎসাহ কমে যেতে পারে।

কুমার সাহেবের বাড়ীতে গোয়ালিয়র থেকে এক জলতরঙ্গ বাজিয়ে এসেছিল। তার বাজনা শোনবার জন্য বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। পদ্মসিংহ সেখানে পৌঁছে দেখেন বিঠলদাস আর প্রফেসর রমেশ দত্ত জোর গলায় তর্কে মেতেছেন। আর কুমার সাহেব, পণ্ডিত প্রভাকর রাও আর সৈয়দ তেগ আলী বসে এই বটের পাখীর লড়াইয়ের তামাসা দেখছেন।

শর্মাজীকে দেখেই কুমার সাহেব তাঁকে অভ্যর্থনা করে বললেন—আসুন, আসুন, দেখুন এখানে জোর সংগ্রাম লেগেছে। কোন উপায়ে ছাড়ান নয়তো লড়াই করতে করতে দু জনেই মরবে।

তখন প্রফেসর রমেশ চন্দ্র বলছিলেন—থিয়জফিস্ট হওয়া দোষের নয়। আমি যে থিয়জফিস্ট সেটা সারা শহর জানে। আমাদের সংস্থার চেষ্টাতেই আজ আমেরিকা, জার্মানী, রুশ প্রভৃতি দেশে রাম আর কৃষ্ণের ভক্ত এবং গীতা, উপনিষদ ইত্যাদি সদ্‌গ্রন্থের অনুরাগী পাঠক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের সংস্থা হিন্দু জাতির গৌরব বাড়িয়েছে, তার মহত্ত্বের প্রসার ঘটিয়েছে, তাকে সেই উচ্চাসনে বসিয়েছে যা সে নিজের অকর্মণ্যতার দোষে কয়েক শতাব্দী ধরে হারিয়েছিল। থিয়জফিস্টরা নিজেদের প্রদীপের সাহায্যে আমাদের অন্ধকার দূর করে এমন রত্ন দিয়েছেন যা খুঁজে পাবার সামর্থ্য আমাদের ছিল না। যদি আমরা এঁদের যশ স্বীকার না করি তবে তা হবে আমাদের চরম কৃতঘ্নতা। এই প্রদীপ ব্লাভাট্‌স্কীয় হোক বা অন্য কারোর হোক আমাদের সেটা জানবার কোন প্রয়োজন নেই। যে আমাদের অন্ধকার দূর করেছে, তার অনুগ্রহ স্বীকার করা আমাদের কর্তব্য। যদি আপনি একে দাসত্ব বলেন তবে সেটা আপনার অন্যায়।

বিঠলদাস ভাষণটা এমন উপেক্ষার ভাব নিয়ে শুনছিলেন যেন নিরর্থক বাজে কথা শুনছেন। তিনি বললেন—এরই নাম দাসত্ব কিন্তু দাসও তো এক বিষয়ে স্বাধীন থাকে, তার শরীরটা থাকে পরের অধিকারে, আত্মা নয়। আর আপনারা তো আত্মাকেও বেচে দিয়েছেন। আপনাদের ইংরেজী শিক্ষা আপনাদের এত নিচে নামিয়েছে যে যতক্ষণ না কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিত কোন বিষয়ের দোষ-গুণ আলোচনা করেন ততক্ষণ আপনারা সে বিষয়ে উদাসীন থাকেন। উপনিষদ ভালো জিনিষ বলেই তাকে আপনারা আদর করেন না। এই জন্য আদর করেন যেহেতু ব্লাভাট্‌স্কি আর ম্যাক্সমুলার একে ভাল বলেছেন। নিজের বুদ্ধিতে কাজ করবার শক্তি আপনাদের লোপ পেয়েছে। এতদিন তান্ত্রিক বিদ্যা সম্বন্ধে আপনাদের মুখে কোন কথা শোনা যেত না। আজ যেহেতু য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা এর রহস্য উদ্‌ঘাটনে প্রবৃত্ত হয়েছেন তাই আপনারা তন্ত্রের গুণ গাইতে শুরু করেছেন। এই মানসিক দাসত্ব ওই শারীরিক দাসত্বের চেয়েও অধম। আপনারা ঔপনিষদ পড়েন ইংরেজিতে আর গীতা পড়েন জার্মান ভাষায়। অর্জুনকে অর্জুনা, কৃষ্ণকে কৃশ্‌না বলে মাতৃভাষা-জ্ঞানের পরিচয় দেন। যেখানে আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদের প্রতিভার প্রবল শক্তির সাহায্যে আমাদের বিজয়-পতাকা ওড়াতে পারতাম, সেখানে আপনারা এই মানসিক দাসত্বের জন্যেই পরাজয় স্বীকার করেছেন।

রমেশ দত্ত এর উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় কুমার সাহেব বলে উঠলেন —বন্ধুগণ! আমি আর না বলে থাকতে পারছি না, লালা সাহেব, আপনি আপনার এই 'দাসত্ব' শব্দটা প্রত্যাহার করুন।

বিঠল দাস—প্রত্যাহার করব কেন?

কুমার—আপনার এটা বলবার অধিকার নেই।

বিঠল—আপনি কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি না।

কুমার—আমি বলতে চাই আমাদের কারুরই অপরকে দাস বলার অধিকার নেই। অন্ধের দেশে কে কাকে অন্ধ বলবে? রাজাই হই আরভিখারীই হই, আমরা সবাই তো চাকর। যদি আমরা মূর্খ, গরীব, গেঁয়ো হই তবে একটু দাসত্ব করি। তখন আমরা রাম নাম নিই, গোপালন করি আর নিজেদের গঙ্গায় স্নান করি। আর যদি আমরা বিদ্বান, উন্নত ধনী হই তবে বেশী দাসত্ব করি। আমরা তখন বিদেশী ভাষা বলি, কুকুর পুষি আর স্বদেশবাসীকে নিচু বলে ভাবি। গোটা জাত আজ এই দুভাগে বিভক্ত। তাই কেউ কাউকে চাকর বলতে পারে না। দাসত্বের মানসিক, আত্মিক, শারীরিক ভাগ করা ভ্রান্তিজনক, দাসত্ব শুধু আত্মিক; অন্য দশাগুলো এর বিভিন্ন রূপ মাত্র। মোটর, বাংলো, পোলো, পিয়ানো এরা সব যেন এক একটা বেড়ী। যারা এই সব বেড়ী পরে নি তারাই খাঁটি স্বাধীনতার আনন্দ পেতে পারে। আপনারা জানেন, এরা কারা? এরা হচ্ছে আমাদের দীন কৃষক যারা পরিশ্রম করে খাবার যোগাড় করে, জাতীয় পোশাক, ভাষা আর ভাবের মর্য্যাদা দেয় আর কারো সামনে মাথা হেঁট করে না।

প্রভাকর রাও মুচকি হেসে বললেন—আপনার কৃষক হওয়াই উচিত।

কুমার – তাহলে পূর্বজন্মের কুকর্মের ফল ভোগ করবে কি করে? বড়দিনের ফলের ডালি সাজাব কি করে? সেলাম জানাবার জন্যে খানসামার খোশামোদ করব কি করে? উপাধি পাবার লোভে নৈনিতাল ছুটব কি করে? ডিনার পার্টি দিয়ে লেডিদের কুকুর কোলে তুলব কি করে? দেবতাদের সন্তুষ্ট করতে দেশহিতকর কাজে অসম্মতি জানাব কি করে? এ সব হচ্ছে মানুষের অধঃপতনের অন্তিম অবস্থা। এ সব ভোগ শেষ না হলে আমার মুক্তি নেই। (পদ্ম সিংহকে) বলুন শর্মাজী, আপনার প্রস্তাবটা বোর্ডে উঠবে কবে? আপনাকে আজকাল একটু কম উৎসাহী দেখাচ্ছে। এ প্রস্তাবটার কি অন্য জনহিতকর প্রস্তাবের মতোই গতি হবে?

বাস্তবপক্ষে ইদানীং পদ্মসিংহের উৎসাহে কিছু ভাটা পড়েছে। প্রস্তাবটা পাশ হবার আশা বৃদ্ধির সঙ্গে মনে অবিশ্বাসও বাড়ছিল। পরীক্ষা যতদিন না হয় ছাত্র তার জন্য তৈরী হতে থাকে, কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর ভাবী জীবন-সংগ্রামের চিন্তা তাকে হতাশ করে ফেলে। সে বুঝতে পারে যে উপায়ে এতদিন সে সফল হয়েছে সে সব এই নতুন, বিস্তৃত ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত। শর্মাজীরও সেই একই দশা। নিজের প্রস্তাব তাঁর কাছেই কিছুটা নিরর্থক মনে হচ্ছিল। শুধু নিরর্থকই নয়, কখনো কখনো এ প্রস্তাবে লাভের বদলে ক্ষতি হবার ভয়ও হচ্ছিল। কিন্তু নিজের এই সন্দেহ প্রকাশ করবার সাহস তাঁর ছিল না: তাই কুমার সাহেবের দিকে বিশ্বাসভরা দৃষ্টি ফেলে বললেন—আজ্ঞে না, ব্যাপার তা নয়। আজকাল অবসর কম বলে কাজে একটু ঢিলে পড়েছে।

কুমার—ওটা পাশ হবারে কোন বাধা নেই তো?

পদ্মসিংহ তেগ আলীর দিকে চেয়ে বললেন—মুসলমান মেম্বাররই ভরসা।

তেগ আলী গম্ভীর হয়ে বললেন—ও'দেরউপর ভরসা রাখা হচ্ছে বালির উপর দেয়াল গাঁথা। আপনি তো জানেন না ওখানে কি প্যাঁচ কসা হচ্ছে! ঠিক সময়ে ধোকা আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

পদ্মসিংহ—আমি এমনটা আশা করি নি।

তেগ আলী—সেটা আপনার সদ্‌গুণে। ওখানে এখন হিন্দী উর্দুর ঝগড়া, গোবধ সমস্যা, সুদের ক্ষতিপূরণ, আইন সব ব্যাপারেই ধর্মের দোহাই দিয়ে দল ভাঙ্গাবার চেষ্টা চলছে।

প্রভাকর রাও—শেঠ বলভদ্র দাস কি আসবেন না? তাঁকে বুঝিয়ে দলে টানা দরকার।

কুমার—আমি তাঁকে নিমন্ত্রণ করি নি কারণ আমি জানতাম যে তিনি কখনই আসবেন না। তিনি মতভেদকে শত্রুতা বলে মনে করেন। আমাদের প্রায় সব নেতারই এই অবস্থা। এইটেই একমাত্র বিষয় যেখানে তাঁদের জীবন্ত মনে হচ্ছে। আপনার সঙ্গে তাঁর সামান্য মতভেদ হল কি তিনি আপনার প্রকাশ্য শত্রু হয়ে গেলেন। কথা বলা দূরে থাক আপনার চেহারাটাও দেখতে চাইবেন না। উলটে সুযোগ পেলে অন্যদের কাছে আপনার নিন্দে করবেন, নিজের বন্ধুদের কাছে আপনার আচার-বিচার, রীতি-ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করবেন। আপনি ব্রাহ্মণ হলে ভিখারী বলবেন, ক্ষত্রিয় হলে কাঠ গোঁয়ার বলবেন। বৈশ্য হলে আপনাকে বেনে, দাঁড়িপাল্লা-ধারী পদবী দেবেন আর শূদ্র হলে তো আপনি চণ্ডাল পদবাচ্য হবেনই। আপনি যদি গান ভালবাসেন তো আপনি দুরাচারী, যদি সৎ সঙ্গী হন তবে বছিয়া কে তাউ (আকাট মূর্খ) উপাধি লাভ করবেন এমন কি আপনার মা ও স্ত্রীর নামেও কুৎসা রটানো হবে। আমাদের দেশে মতভেদ হওয়া মহাপাপ, এর কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই। ওহো! দেখুন, ডাক্তার শ্যামাচরণের মোটর এসে গেল।

ডাক্তার শ্যামাচরণ মোটর থেকে নেমে উপস্থিত ভদ্রলোকদের দিকে তাকিয়ে বললেন—I am sorry, I was late. কুমার সাহেব তাঁকে অভ্যর্থনা করে হাত ধরলেন আর ডাক্তার সাহেব চেয়ারে বসে বললেন—When is the performance going to begin?

কুমার—ডাক্তার সাহেব, আপনি তো কখনো এমন ভুল করেন না।

ডাক্তার—তবে মশাই, সেজন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে নিন।

কুমার—এর প্রায়শ্চিত্য হচ্ছে যে আপনি বন্ধুদের সঙ্গে মাতৃভাষায় কথা বললেন।

ডাক্তার—আপনারা হচ্ছেন রাজা মহারাজা। এসব আপনাদের পালন করা সম্ভব। আমরা কি করে পালন করব? ইংরেজী তো আমাদের Lingua Franca (সার্বদেশিক ভাষা) হতে চলেছে।

কুমার—আপনারাই তো ঐ ভাষাকে এই গৌরব দিয়েছেন। পারস্য ও কাবুলের মূর্খ সেনা আর হিন্দু ব্যবসাদারদের মেলামেশার ফলে উর্দু ভাষার সৃষ্টি হল। যদি আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রদেশের পরস্পর নিজ নিজ ভাষায় কথাবার্তা চালাতেন তবে এতদিনে হয়তো এক সার্বদেশিক ভারতীয় ভাষা সৃষ্টি হয়ে যেত। যতদিন আপনাদের মত বিদ্বান লোকে ইংরেজীর ভক্ত হয়ে থাকবেন ততদিন সার্বদেশিক ভারতীয় ভাষার জন্ম কখনই হবে না। কিন্তু এটা কষ্টসাধ্য কাজ, কেই বা করতে চায়? এখানে তো লোকে ইংরেজীর মত উন্নত ভাষা পেয়েছে, সকলে তাতেই মেতে গেছে। আমি বুঝতে পারি না ইংরেজী বলতে আর লিখতে পারায় লোকে এত গৌরব বোধ করে কেন? আমিও তো ইংরেজী পড়েছি, দু বছর বিলেতে কাটিয়ে এসেছি আর আপনাদের অনেক ইংরেজীতে ধুরন্ধর পণ্ডিতের চেয়ে ভালো ইংরেজী বলতে ও লিখতে পারি, কিন্তু তাতে আমার ভীষণ ঘৃণা হয়। মনে হয় যেন কোন ইংরাজের ছাড়া জামা কাপড় পরতে হচ্ছে।

পদ্মসিংহ এ আলোচনায় ভাগ নিলেন না। একটু সুযোগ পেয়েই তিনি বিঠলদাসকে ডেকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে শান্তার চিঠিটা দেখালেন।

বিঠলদাস বললেন—এখন আপনি কি করতে চান?

পদ্ম—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। চিঠি পাবার পর থেকেই মনে হচ্ছে যেন অথৈ জলে পড়েছি।

বিঠল—কিছু তো করতেই হবে।

পদ্ম—কি করব?

বিঠল—শান্তাকে আপনার কাছে আনুন।

পদ্ম—গোটা পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে।

বিঠল—যায় তো যাক। কর্ত্তব্যের সামনে ভয়ের কি আছে?

পদ্ম—আপনি তো ঠিক কথাই বলছেন, কিন্তু আমার এত ক্ষমতা নেই। দাদাকে রাগাবার সাহসও আমার নেই।

বিঠল—নিজের কাছে না রাখুন, বিধবাশ্রমে রাখুন; এটা তো শক্ত কাজ নয়।

পদ্ম—ভালো উপায় বের করেছেন, আমার মাথায় আসে নি। বিপদে পড়লে আমার বুদ্ধি যেন ঘুলিয়ে যায়।

বিঠল—কিন্তু আপনাকেই যেতে হবে।

পদ্ম—কেন? আপনি গেলে হবে না কেন?

বিঠল—উমানাথ আমার সঙ্গে তাকে পাঠাবে কেন?

পদ্ম—এতে ওদের কি আপত্তি থাকতে পারে?

বিঠল—আপনি তো এক এক সময় ছোট ছেলের মতন কথা বলেন। শান্তা

ওর মেয়ে নয় বটে, কিন্তু এখন তো সে ওর বাপের জাই। তবে একজন-অপরিচিত লোকের সঙ্গে যেতে দেবে কেন?

পদ্ম—ভাই সাহেব, আপনি রাগ করবেন না। সত্যিই আমার মাথার ঠিক নেই। কিন্তু আমি গেলে পরিস্থিতি ভয়ানক হয়ে পড়বে। দাদা শুনেছে তো আমায় মেরেই ফেলবেন। বরযাত্রীদের সভায় আমাকে যেভাবে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলেন তা আমার আজও মনে আছে।

বিঠল—বেশ, আপনাকে যেতে হবে না। আমিই যাবো। তবে উমানাথের নামে একটা চিঠি দিতে তো আপনার কোন আপত্তি নেই?

পদ্ম—আপনি হয়তো আমায় শুধু মাটির ঢেলা ভাববেন কিন্তু আমার এত সাহস নেই। এমন উপায় বের করুন যাতে দরকার পড়লে আমি এড়িয়ে যেতে পারি। দাদা যেন আমার উপর দোষ চাপাবার সুযোগ না পান।

বিঠলদাস একটু ঝাঁজের সঙ্গে উত্তর দিলেন—আমি তো এমন কোন উপায় দেখছি না। আপনিও নিজেকে মানুষ বলে পরিচয় দেন। কোথায় সেই জ্বালাময়ী বক্তৃতা আর কোথায় এই ভীরুতা!

পদ্মসিংহ লজ্জিত হয়ে বললেন—এখন যা ইচ্ছে হয় বলুন, কিন্তু এ কাজের সমস্ত ভার আপনাকেই নিতে হবে।

বিঠল—আচ্ছা, একটা টেলিগ্রাম তো করে দেবেন, না সেটাও পারবেন না?

পদ্ম—(উচ্ছ্বসিত হয়ে) হ্যাঁ, আমি টেলিগ্রাম করে দেব। জানতাম আপনি একটা উপায় ঠিক বের করবেন। এখন যদি কোন কথা ওঠে তো আমি বলে দেব আমি টেলিগ্রাম করি নি, অন্য কেউ আমার নামে করেছে—পরমুহূর্তেই তাঁর মত বদলে গেল। নিজের ভীরুতার জন্যে লজ্জা হল। মনে ভাবলেন দাদা এত মূর্খ নন যে এই সৎকাজের জন্যে আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন; আর হলেও সে জন্যে আমার পেছিয়ে আসা উচিত হবে না।

বিঠল—তবে আজই টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিন।

পদ্ম—কিন্তু এটা পুরো জালিয়াতি হবে।

বিঠল—তা তো হবেই; আপনিই ভেবে দেখুন।

পদ্ম—আমি যাই তো কেমন হয়?

বিঠল—খুব ভালো হয়, কোন ঝামেলা থাকে না।

পদ্ম—ঠিক আছে, আমি আর আপনি দুজনেই যাব।

বিঠল—কবে?

পদ্ম—আজই টেলিগ্রামে জানাচ্ছি যে আমরা শান্তাকে দ্বিরাগমনের জন্যে নিতে আসছি। পরশু সন্ধ্যার গাড়িতে রওনা হবো।

বিঠল—পাকা কথা তো?

পদ্ম—হ্যাঁ, একেবারে পাকা। আপনি আমার কান ধরে নিয়ে যাবেন।

বিঠলদাস সরল হৃদয় কথকের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালেন; তারপরে দুজনে ফিরে গিয়ে জলতরঙ্গ শুনতে বসলেন। তার সুমধুর ধ্বনি আকাশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

৪৬

স্বাস্থ্যলাভের জন্য যখন আমরা পাহাড়ে যাই তখন কুপথ্য গ্রহণ না করবার প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি থাকে। নিয়মিত ব্যায়াম করি। আরোগ্যলাভের প্রতি সদাই সজাগ থাকি। সুমন বিধবাশ্রমে এসেছিল আত্মিক স্বাস্থ্যলাভের জন্যে, আর নিজের অভীষ্ট ক্ষণেকের জন্যেও ভোলে নি। সে আশ্রমের অন্য বোনদের সেবায় তৎপর থাকত আর ধর্মের বই পড়ত। দেবতার উপাসনা, স্নানাদি কাজে তার ব্যথিত হৃদয় শান্তি পেত।

অমোলার খবর বিঠলদাস আগে জানান নি, কিন্তু যখন শান্তার আশ্রমে থাকার কথা নিশ্চিত হয়ে গেল তখন তিনি সুমনকে এ বিষয়ে অবহিত করা উচিত মনে করে কুমার সাহেবের বাড়ি থেকে ফিরেই তাকে সমস্ত বৃত্তান্ত শোনালেন।

আশ্রম তখন নিস্তব্ধ। রাত অনেক হয়েছে, তবু সুমনের চোখে ঘুম নেই। আজ তার নিজের ভুলের যথার্থ স্বরূপ চোখে পড়েছে। ক্লোরোফর্ম করা রুগী জ্ঞান ফিরে নিজের কাটা ছেঁড়া গভীর ক্ষত দেখে ভয়ে ও যন্ত্রণায় যেমন আবার জ্ঞান হারায় সুমনের অবস্থা এখন সেই রকম। তার মনে হচ্ছে বাপ, মা, বোন তিনজন তার সামনে বসে রয়েছে। মা লজ্জায়, দুঃখে মাথা নিচু করে রয়েছে, মুখে উদাস ভাব; বাবা ক্রোধোন্মত্ত রক্তবর্ণ চোখে তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন আর শান্তা শোক, নৈরাশ্য আর তিরস্কারের প্রতিমূর্তি হয়ে একবার মাটির দিকে একবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছে।

সুমন অস্থির হয়ে পড়ল। সে খাট থেকে উঠে পাকা মেজেয় জোরে জোরে মাথা ঠুকতে লাগল। নিজেকে তার পিশাচিনী মনে হচ্ছিল। মাথায় চোট লেগে তার মাথা ঘুরতে লাগল। চেতনা ফিরে পেয়ে দেখে মাথা কেটে রক্ত পড়ছে। ধীরে ধীরে দরজা খুলল। উঠোন অন্ধকার। সে এক ছুটে ফটকের কাছে এল। ফটক তালা বন্ধ। তালা কয়েকবার নাড়াচাড়া করলেও খুলল না। বুড়ো চৌকিদার ফটকের একটু দূরে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। সুমন ধীরে ধীরে তার কাছে এসে মাথার নিচে চাবি খুঁজতে লাগল। চৌকিদার চমকে উঠে বসে চিৎকার করতে লাগল—'চোর! চোর!' সুমন ছুটে পালিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

ভোরের হাওয়ার মতো মনের প্রচণ্ড অস্থিরতাও শীঘ্র থেমে যায়। সুমন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অনেকক্ষণ কাঁদল। হায়! আমার মত ডাইনী সংসারে কেউ নেই। বিলাসিতার মোহে আমি নিজের কুলের সর্বনাশ করেছি। নিজের বাপকে মেরেছি। শান্তার গলায় ছুরি বসিয়েছি। এ কালামুখ ওকে কি করে দেখাব? চোখ মেলে তার দিকে চাইবো কি করে? বাবা যখন আমার কথা শুনলেন তখন তাঁর কত দুঃখই না হয়েছিল? এই সব ভেবে সে আবার কাঁদতে লাগল। এই বেদনাই তার অন্য সব কষ্টের চেয়ে বেশী মনে হতে লাগল।

বাবাকে এ সব কথা না বলে মদনসিংহ যদি তাকে কলুর ঘানিতে ফেলে পিষতেন, হাতীর পায়ের তলায় থেঁৎলে দিতেন, আগুনে ফেলে দিতেন, কুকুর দিয়ে খাওয়াতেন তো সে টুঁ শব্দটিও করত না। বিলাসিতার লোভে আর নির্দয় অপমান যদি তার লজ্জা ঘুচিয়ে না দিত তো সে কখনই ঘরের বাইরে পা বাড়াত না। স্বামীর হাতে অজস্র লাঞ্ছনা সহ্য করেও ঘরেই পড়ে থাকত। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় তার ধারণাও ছিল না যে একদিন দালমণ্ডীতে গিয়ে ঢুকতে হবে। কিছু না বুঝেই সে ঘর ছেড়েছিল; শোকে দুঃখে হতাশায় সেদিন ভুলে গিয়েছিল যে তার বাপ আছে, বোন আছে।

অনেকদিন যোগাযোগ ছিল না বলে তাদের কথা মনে আসে নি। সংসারে সে নিজেকে একলা অসহায় ভাবত। তার ধারণা যেন সে অন্য দেশে আছে আর সে যা কিছু করবে তা গোপন থাকবে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আবার সে আত্মীয়তার বন্ধন অনুভব করছে। যাদের সে ভুলে গিয়েছিল তারা যেন আবার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আর লজ্জায় যেন দূরে সরে যাচ্ছে।

বাকী রাতটুকু সুমনের দুশ্চিন্তায় কাটল। চারটে বাজলে সে গঙ্গাস্নান করতে রওনা হল। সে একলাই যেত বলে চৌকিদার কোন আপত্তি করল না।

গঙ্গাতীরে এসে সুমন চারপাশে দেখতে লাগল কেউ আছে কি না। সে আজ গঙ্গায় এসেছে স্নান করতে নয়, ডুবে মরতে। তার কোন ভয় বা দ্বিধা নেই। কাল কোনও সময়ে শান্তা আশ্রমে এসে যাবে। তাকে মুখ দেখানোর চেয়ে গঙ্গার কোলে আশ্রয় নেওয়া অনেক সোজা।

হঠাৎ সে দেখতে পেল যে কোন লোক তার দিকে এগিয়ে আসছে। আবছা অন্ধকার থাকলেও সুমন এটুকু বুঝল যে কোন সাধু হবে। সুমনের আঙুলে একটা আংটি ছিল। সে স্থির করল ওটা সাধুকেই দান করবে, কিন্তু সাধু কাছে আসতেই সুমন ভয়, লজ্জা, ঘৃণায় নিজের মুখ ঢাকল। সাধু হচ্ছে গজাধর।

সুমন দাঁড়িয়ে আছে, গজাধর তার পায়ের উপর পড়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বলল—আমার অপরাধ ক্ষমা করো।

সুমন পিছনে সরে গেল। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই অপমানের দৃশ্য। ঘা যেন বিষিয়ে গেল। তার ইচ্ছে হল বলে—তুমিই 'আমার বাবাকে প্রাণে মেরেছো, তুমিই আমার জীবন নষ্ট করেছো; কিন্তু গজাধরের অনুতপ্ত আচরণ, তার সাধু বেশ, আর আত্মহত্যার সংকল্পের জন্য নিজের মানসিক উদারতা—সব কটার মিলিত প্রভাবে তার মন গলে গেল। চোখে জল এল, করুণস্বরে বলল—তোমার কোন দোষ নেই। যা কিছু হয়েছে সে সব হচ্ছে আমার কর্মের ফল।

গজাধর—না সুমন, এমন বোলো না। সব আমার বোকামি আর গোঁয়ারতুমির ফল। ভেবেছিলাম যে এর প্রায়শ্চিত্ত করতে পারব, কিন্তু আমার অত্যাচারের ভীষণ পরিণাম দেখে বুঝেছি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। আমি নিজের চোখে তোমার বাবাকে গঙ্গায় মিলিয়ে যেতে দেখেছি।

সুমন উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করল—তুমি কি বাবাকে ডুবতে দেখেছিলে?

গজাধর—হ্যাঁ সুমন, ডুবতে দেখেছিলাম। আমি সে রাতে আমোলা যাচ্ছিলাম; পথে তাঁর সঙ্গে দেখা। মাঝরাতে তাঁকে গঙ্গার দিকে যেতে দেখে আমার সন্দেহ হল। তাঁকে আমার আস্তানায় নিয়ে এসে তাঁর মন শান্ত করবার চেষ্টা করলাম। আমার চেষ্টা সফল হয়েছে ভেবে আমিও শুয়ে পড়লাম। একটু পরে ঘুম ভাঙলে তাঁকে আর সেখানে দেখতে পেলাম না। তখনই গঙ্গার দিকে ছুটলাম। সেই সময় কানে গেল তিনি আমায় ডাকছেন। কিন্তু তিনি যে ঠিক কোথায় আছেন তা বোঝবার আগেই নিষ্ঠুর ঢেউগুলো তাঁকে গ্রাস করল। দুর্লভ আত্মা আমার চোখের সামনেই স্বর্গে চলে গেলেন। তখন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল না যে আমার পাপ এত ভীষণ, এতই ক্ষমার অযোগ্য। জানি না পরলোকে আমার কি গতি হবে।

সাবান যেমন ময়লা দূর করে গজাধরের এই অনুশোচনা সুমনের হৃদয়ে সেই কাজ করল। তার মনের মালিন্য দূর হয়ে গেল। তার মনের যে ভাব সে লুকিয়ে রাখতে চাইত তা আজ ব্যক্ত হল। বলল—পরমাত্মা তোমায় সদ্বুদ্ধি দিয়েছেন, তুমি নিজের সুকীর্তির জোরে কিছু লাভ করতে পারো, কিন্তু আমার কি গতি হবে? আমার ইহলোক পরলোক দুই-ই গেল। হায়! আমার কোথাও ঠাঁই নেই। লুকিয়ে আর লাভ কি, তোমার দারিদ্র আর তোমার নিষ্ঠুর ব্যবহারে আমার মনে যখন দুঃখের ভাব জাগল সেইসময় চারদিকে খারাপ লোকেদের মান-মর্যাদা, সুখ-বিলাস দেখে সেই ভাব কাঁটাগাছের মতো আমার সমস্ত হৃদয় আচ্ছন্ন করে ফেলল। সে সময় একটু আঘাতই যথেষ্ট ছিল। তোমার প্রেম, সহানুভূতি আর একটু উদারতা সে ব্যথায় মলমের কাজ করতে পারত; কিন্তু তুমি তাকে দুপায়ে থেঁৎলে দিলে। যন্ত্রণায় আমি জ্ঞানহারা প্রায়। তোমার সেই পাশবিক ব্যবহার যখন মনে পড়ে তখন যেন সব কিছু

অমরণ ধাম, মনে হয় তোমাকে অভিশাপ দিই। এখন আমার অন্তিম সময়, একটু পরেই এই পাপ শরীর গঙ্গায় ডুবে যাবে। আমি বাবার কাছে পৌঁছে যাবো। তাই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করেন।

গঙ্গাধর চিন্তিত ভাবে বলল—সুমন, প্রাণ দিলেই যদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হত তো আমি অনেক আগেই আত্মহত্যা করতাম।

সুমন—অন্তত দুঃখের তো শেষ হবে।

গঙ্গাধর—হ্যাঁ, তোমার দুঃখের অবসান হতে পারে কিন্তু যাঁরা তোমার দুঃখে দুঃখ পাচ্ছেন তাঁদের দুঃখের সীমা থাকবে না। তোমার মাতা-পিতা শরীরিক বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছেন কিন্তু তাঁদের বিদেহী আত্মা তোমার কাছে কাছে রয়েছেন। তাঁরা তোমার সুখে সুখী দুখে দুঃখী হন। ভেবে দেখ আত্মহত্যা করে তাঁদের দুঃখ বাড়িয়ে দেবে, না প্রায়শ্চিত্ত করে তাঁদের সুখ শান্তি দেবে? হৃদয়ে অনুতাপ দিয়ে ঈশ্বর জানিয়ে দেন যে নিজেকে সংশোধন করবার এটাই শেষ সুযোগ। যদি এর উদ্দেশ্য না বুঝে আমরা শোকের অবস্থায় আত্মঘাতী হই তবে তাঁর এই অন্তিম প্রেরণা যেন নিষ্ফল হয়ে যায়। এটাও ভেবে দেখ তুমি না থাকলে অবলা শান্তার কি দশা হবে। সে এখনোও সংসারের ভালোমন্দ কিছুই জানো না। তুমি ছাড়া সংসারে আর কে আছে তার? উমানাথের অবস্থা তুমি তো জানই; সে ওর ভার নেবে না। তার মনে দয়া থাকলে কি হবে, লোভ তার চেয়েও বেশী। যে কোন দিন নিশ্চয় বিদায় করে দেবে। তখন কে তাকে দেখবে?

গঙ্গাধরের কথায় সুমন প্রকৃত সহানুভূতি লক্ষ্য করল। সে তার দিকে কোমলদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল—শান্তার সঙ্গে দেখা করার চেয়ে মরেযাওয়াই সহজ মনে হচ্ছে। কয়েকদিন আগে সে পদ্মসিংহকে একটা চিঠি দিয়েছে। উমানাথ অন্য কোথাও তার বিয়ে দিতে চাইছে। আর সে বিয়ে করবে না।

গঙ্গাধর—সে দেবী।

সুমন—শর্মাজী নিরুপায় হয়ে স্থির করেছেন যে শান্তাকে এনে আশ্রমে রাখবেন। তাঁর ভাই যদি তাকে মেনে নেন তবে তো ভালই নইলে বেচারীকে কতদিন না জানি আশ্রমে থাকতে হবে। কাল তার এখানে আসার কথা। কি করে তার সামনে যাব, কি করে তার দিকে চাইব এই সব ভেবে ভয়ে লজ্জায় আমি মরে যাচ্ছি। সে যখন ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে আমায় দেখবে তখন আমি কি করব? আর যদি সে ঘৃণায় আমার গলা জড়িয়ে ধরতে সঙ্কুচিত হয় তবে তো আমায় তখনই বিষ খেয়ে মরতে হবে। এ দুর্গতির চেয়ে মরে যাওয়া ভালো।

সুমনের উপর গঙ্গাধরের শ্রদ্ধা হল। তার মনে হল এমন অবস্থায় পড়লে সুমন যা করতে চাইছে সেও তাই করত। বলল—সুমন, তুমি ঠিক বলেছ।

কিন্তু তোমার যত দুঃখ কষ্টই হোক না কেন, শান্তার ভালোর জন্যে তোমাকে সে সব সহ্য করতে হবে। তোমার কাছে থেকে তার যতটা উপকার হবে, অন্য কাউকে দিয়ে তা হতে পারে না। এতদিন নিজের জন্যে বেঁচেছিলে, এবার অপরের জন্যে বাঁচো।

এই বলে গঙ্গাধর যে পথে এসেছিল সেই পথে ফিরে গেল। সুমন গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে তার কথা ভাবতে লাগল, পরে স্নান করে আশ্রমের দিকে রওনা হল—যেন যুদ্ধে হেরে গিয়ে সে ফিরে এল।

৪২

শান্তা চিঠি তো লিখল, কিন্তু উত্তর পাবার আশা তার ছিল না। তিন দিন কেটে গেছে, হতাশা বাড়ছে দিনে দিনে। যদি অনুকূল উত্তর না আসে তবে উমানাথ নিশ্চয় তার বিয়ে অন্যত্র দেবে, এই চিন্তায় শান্তার বুক কাঁপত। দিনের মধ্যে কয়েকবার সে দেবীর থানে গিয়ে নানারকম মানত করত। কখনো শিব মন্দিরে গিয়ে নিজের মনস্কামনা জানাত। ক্ষণিকের জন্যেও সদনের চিন্তা তার মন থেকে দূর হত না। সে কল্পনায় সদনকে সামনে বসিয়ে হাতজোড় করে বলত, প্রাণনাথ, তুমি আমায় আপন করে নিচ্ছ না কেন? লোকনিন্দার ভয়ে? হায়, আমি এতই সস্তা যে এই দামে বেচা হবে। তুমি আমায় ত্যাগ করেছ, আগুনে ফেলে দিচ্ছো শুধু এই অপরাধে যে আমি সুমনের বোন! এই কি উচিত? যদি তোমার দেখা পেতাম, তোমাকে ধরতে পারতাম তো দেখতাম তুমি কেমন করে আমার কাছ থেকে পালাও! তুমি তো পাথর নও যে আমার চোখের জলে গলবে না। তুমি নিজের চোখে একবার আমার এই দশা দেখলে স্থির থাকতে পারতে না। হ্যাঁ, তুমি কখনই পারতে না। তোমার বিশাল হৃদয় অকরুণ হতেই পারে না। কি করি, আমার মনের এই দশা তোমায় কি করে দেখাই?

চতুর্থ দিন সকালে পদ্মসিংহের চিঠি এল। শান্তা ভয় পেল। তার প্রেমের জোয়ারে ভাটা এল। ভবিষ্যতের আশঙ্কা তার মন অস্থির করে তুলল।

কিন্তু উমানাথের আনন্দ ধরে না। বাজনা, গাড়ীর যোগাড় করে সারা গাঁয়ে নিমন্ত্রণ পাঠাল। অভ্যাগতদের জন্যে বৈঠকখানায় ফরাশ ইত্যাদি বিছানো হল। গাঁয়ের লোক অবাক, এ আবার কেমন গৌণা (দ্বিরাগমন)? বিয়েই তো হয়নি, গৌণা কিসের? তারা ভাবল এ হচ্ছে উমানাথের কোন নতুন চাল।

ও হচ্ছে একের নম্বর ধূর্ত। নির্দিষ্ট সময়ে উমানাথ স্টেশনে গেল। আর বাজনা বাজিয়ে অভ্যাগতদের ঘরে নিয়ে এল। বৈঠকখানায় থাকতে দিল। শুধু তিনজন এসেছে। পদ্মসিংহ, বিঠলদাস আর এক চাকর।

পরদিন সন্ধ্যায় বিদায়ের লগ্ন। তৃতীয় প্রহর শেষ হল কিন্তু উমানাথের বাড়ীতে গাঁয়ের কোন স্ত্রীলোক দেখা গেল না। সে বার বার অন্দরে যাচ্ছে, রাগ দেখাচ্ছে, দেওয়ালকে ধমকাচ্ছে, 'এক এক করে সব শোধ নেব।' জাহ্নবীকে রাগ দেখিয়ে বলছে, 'সবাইকে দেখে নেব।' কিন্তু তার যে ধমকানিতে নম্বরদার পর্যন্ত কাঁপত, আজ তা কারো উপর খাটল না। অন্যায় চাপ জ্ঞাতিরা সহ্য করে না। অহঙ্কারীদের মাথা নিচু করবার জন্যে এই সব সুযোগ খোঁজে।

সন্ধ্যা হল। দরজায় পালকি এনেছে কাহারেরা। জাহ্নবী আর শান্তা গলা জড়িয়ে খুব কাঁদল।

শান্তার হৃদয় প্রেমে ভরপুর। এ বাড়ীতে সে যত কষ্ট পেয়েছিল এখন সে সব ভুলে গেছে। এদের সঙ্গে আর দেখা হবে না, এ ঘরে আর আসব না, চিরকালের জন্যে এদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকে যাচ্ছে মনে করে তার বুক ফেটে যাচ্ছিল। জাহ্নবীর হৃদয়ও করুণায় ভরে গেছে। এই মা-বাপ-মরা মেয়েটাকে কত কষ্ট দিয়েছি মনে করে তার চোখে জল এল। দুজনের হৃদয়েই বইছিল খাঁটি, নির্মল, কোমল ভাবের তরঙ্গ।

উমানাথ ঘরে এলে শান্তা তার পা জড়িয়ে ধরে বলল—তুমিই আমার বাবা। মেয়েকে ভুলে যেও না। আমার বোনদের শাড়ী গয়না দিয়ো; হোলি, তিজ উৎসবে তাদের বাড়ীতে এনো, কিন্তু তোমার দু ছত্র লেখা চিঠি পেলেই আমি ভাগ্য মনে করব।

উমানাথ বলল—বেটী, তুমিও আমার অন্য দুই মেয়ের মতনই। পরমাত্মা তোমায় সদা সুখে রাখুন—বলে কাঁদতে লাগল।

সন্ধ্যা হয়েছে। মুন্নী গাই ঘরে ফিরলে শান্তা তার গলা জড়িয়ে কাঁদতে লাগল। তিন চার বছর ধরে সে তার সেবা যত্ন করছে। আর কাকে ভুষি খাওয়াতে ছুটবে? কার গলায় কালো সুতোয় কড়ি বেঁধে ঝোলাবে? মুন্নী মাথা নিচু করে তার হাত চাটছে। তার চোখও বিয়োগ ব্যথায় করুণ।

জাহ্নবী শান্তাকে এনে পালকিতে বসিয়ে দিল। বেহারারা পালকি তুলল। শান্তার মনে হল সে অথই জলে ভেসে চলেছে।

গাঁয়ের মেয়েরা নিজেদের দরজায় দাঁড়িয়ে পালকি দেখছিল আর কাঁদছিল।

উমানাথ স্টেশন পর্যন্ত এল। যাবার সময় সে নিজের পাগড়ী খুলে পদ্মসিংহের পায়ে রাখল। পদ্মসিংহ তাকে জড়িয়ে ধরলেন।

গাড়ী ছাড়লে পদ্মসিংহ বিঠলদাসকে বললেন—এবার অভিনয়ের সব চেয়ে কঠিন অংশ এসে পড়ল।

বিঠল—বুঝলাম না।

পদ্ম—শান্তাকে কিছু না জানিয়েই কি তাকে আশ্রমে পৌঁছে দেবেন? তাকে এ জন্যে তৈরি করা দরকার।

বিঠল—হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ভেবেছেন। তা গিয়ে বলে দিই।

পদ্ম—একটু ভেবে নিন, কি বললেন? এখন তো ও ভাবছে যে শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছি। এই প্রত্যাশাই তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে। কিন্তু যখন সে আমাদের সব কথা জানবে তখন তার কত কষ্ট হবে। এখন মনে হচ্ছে যে এ সব কথা আগেই কেন বলে দিই নি।

বিঠল—তা এখন বললেই বা ক্ষতি কি? মির্জাপুরে গাড়ী অনেকক্ষণ দাঁড়ায়। আমি গিয়ে ওকে বুঝিয়ে দেব।

পদ্ম—বড় ভুল করে ফেলেছি।

বিঠল—ভুলের জন্যে আফসোস করলেই যদি চলে তবে প্রাণভরে তাই করুন।

পদ্ম—আপনার কাছে যদি পেন্সিল থাকে তো দিন। চিঠি লিখে সব ব্যাপার জানিয়ে দিই।

বিঠল—না, না, টেলিগ্রাম করুন, আরো ভালো হবে। আপনি একটি বিচিত্র জীব। একটা সামান্য ব্যাপারে আপনি এত আগুপিছু করতে লেগেছেন?

পদ্ম—সমস্যাটাই এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে, আমি কি করবো? একট কথা মনে এসেছে। মোগল সরাইয়ে অনেকক্ষণ থাকতে হবে। সেখানেই তার কাছে সব বৃত্তান্ত জানিয়ে দেব।

বিঠল—এতক্ষণে কথার মতো কথা বলেছেন। এই জন্যেই বুদ্ধিমান লোকে বলে কোন কাজ ভালো করে না ভেবে চিন্তে করা উচিত নয়। আপনার বুদ্ধি ঠিক পথে আসে বটে তবে অনেক ঘোরাঘুরি করার পরে। কথাটা আগে আপনার মাথায় আসে নি।

শান্তা ইণ্টার ক্লাসের মেয়েদের কামরায় বসে ছিল। সেখানে আরো দুজন খৃষ্টান মহিলা ছিল। তারা শান্তাকে দেখে ইংরেজীতে বলাবলি করতে লাগল।

'মনে হচ্ছে এ নতুন বিয়ে করা বৌ'।

'হ্যাঁ, উচু জাতের হবে। শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছে।'

,এমন কাঁদছে যেন কেউ জোর করে নিয়ে যাচ্ছে।'

'স্বামীর চেহারা হয়তো এখনও দেখে নি, ভালবাসা কি করে হবে? ভয়ে হয়তো বুক কাঁপছে।'

'এটা এদের খুবই নিকৃষ্ট প্রথা। বেচারী মেয়েকে এক অজানা ঘরে পাঠিয়ে

দিচ্ছে যেখানে তার আপন বলতে কেউ নেই।'

'এ সব হচ্ছে পুরনো দিনের প্রথা যখন মেয়েকে জোর করে ধরে নিয়ে যেত।'

'কি বাইজি, (শান্তাকে) শবশুর বাড়ী যাচ্ছ ?'

শান্তা ধীরে মাথা হেলিয়ে জানিয়ে দিল।

'তুমি তো রূপবতী দেখছি। তোমার স্বামীও তোমার জুড়ি তো ?'

শান্তা গম্ভীরভাবে উত্তর দিল—স্বামীর সৌন্দর্য দেখা হয় না।

'যদি সে কালো ভূতের মত হয় ?'

শান্তা গর্বভরে উত্তর দিল—আমার কাছে তিনি দেবতুল্য, তা যেমনই হোন না কেন।

'আচ্ছা, মনে কর তোমার সামনে দুজনকে আনা হল ; একজন রূপবান, অপর জন কুৎসিত ; সেখানে তুমি কাকে পছন্দ করবে ?'

শান্তা দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল—যাকে আমার বাপ-মা পছন্দ করবেন।

শান্তা বুঝেছিল যে ওরা আমাদের বিবাহপ্রথার নিন্দে করছে। একটু পরে সে তাদের জিজ্ঞাসা করল—শুনেছি আপনারা নাকি নিজেরাই স্বামী নির্বাচন করেন ?

'হ্যাঁ, এ বিষয়ে আমরা স্বাধীন।'

'আপনারা মা-বাপের চেয়ে নিজেদের বেশী বুদ্ধিমান ভাবেন ?'

'আমাদের মা-বাপ কি করে জানবে যে তাদের বাছাই করা পুরুষের সঙ্গে আমাদের প্রেম হবে ?'

'তা হলে আপনারা বিয়েতে প্রেমকেই মুখ্য বলে মনে করেন ?'

'তা না তো কি ? বিয়ে তো প্রেমের বন্ধন।'

'আমরা বিয়েকে ধর্মের বন্ধন মনে করি। আমাদের কাছে প্রেমের স্থান ধর্মের পরে।'

নটার সময় গাড়ী মোগলসরাইয়ে এল। বিঠলদাস এসে শান্তাকে নামিয়ে নিলেন আর দূরে সরে প্ল্যাটফর্মে সতরঞ্চি পেতে তাকে বসালেন। বেনারস যাবার গাড়ী ছাড়বে আধ ঘণ্টা পরে।

শান্তা দেখল এদেশি লোকেরা মাথায় বড় বড় মোট নিয়ে একটা সরু গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে যাবার জন্যে একে অপরের ঘাড়ে পড়ছে। অন্য একটা সরু গেটের সামনে হাজার হাজার লোক ভেতরে আসবার জন্যে ঠেলাঠেলি করছে কিন্তু অন্যদিকে একটা চওড়া গেট দিয়ে ইংরাজেরা কুকুর নিয়ে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে যাতায়াত করছে। তাদের কেউ কিছু বলছে না বা আটকাচ্ছে না।

এমন সময় পণ্ডিত পদ্মসিংহ তার কাছে এসে বললেন-আমি তোমার ধর্মপিতা পদ্মসিংহ।

শান্তা উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত জোড় করে তাঁকে প্রণাম করল।

পদ্মসিংহ বললেন—তুমি হয়তো ভাবছ আমরা দুয়ারে নামলাম না কেন ? এর কারণ হচ্ছে যে এখনও পর্যন্ত আমি দাদাকে তোমার বিষয়ে কিছুই জানাতে পারি নি। তোমার চিঠি পেয়ে আমি এমন ভয় পেয়ে গেলাম যে তোমাকে প্রথমে নিয়ে আসাই সবচেয়ে জরুরি মনে হল। দাদাকে কিছু জানাবার অবকাশ পেলাম না। তাই এখন কিছুদিন বেনারসে থাকতে হবে। আমি ঠিক করেছি তোমাকে ঐ আশ্রমেই রাখব যেখানে আজকাল তোমার বোন সুমনবাঈ থাকে। সুমনের সঙ্গে থাকলে তোমার কোন কষ্ট হবে না। তুমি সুমনের যে সব কলঙ্কের কথা শুনেছ সে সব ভুলে যাও। সে এখন দেবীর মতন। তার জীবন এখন পবিত্র, উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছে। তা না হলে আমি আমার ধর্মপত্নীকে তার সঙ্গে কখনও থাকতে দিতাম না। দু এক মাসের মধ্যে আমি দাদাকে মানিয়ে নেব। যদি এ বিষয়ে তোমার কোনও আপত্তি থাকে তো স্পষ্ট করে বল ; তা হলে অন্য বন্দোবস্ত করব।

পদ্মসিংহ খানিকটা দ্বিধা নিয়েই কথাটা শেষ করলেন। মুখে সুমনের যত প্রশংসা করলেন, তার উপর তাঁর নিজের তত বিশ্বাস ছিল না। মদন সিংহের সম্বন্ধেও তিনি বেশ বাড়িয়ে বলেছেন। সরল হৃদয় মেয়েটাকে এভাবে ঠকাতে তাঁর কষ্ট হল।

শান্তা কাঁদতে কাঁদতে পদ্মসিংহের পায়ে পড়ল আর লজ্জা, নৈরাশ্য আর বিষাদ ভরা গলায় বলল—আপনার শরণ নিয়েছি, যা উচিত মনে করবেন তাই করুন।

শান্তার মন বেশ হালকা হয়ে গেল। তাকে আর নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। কিছুদিনের জন্যে তার জীবন অন্তত নির্দিষ্ট পথে চলবে। তার অবস্থা কতকটা যেন সেই লোকটির মত যে নিজের কুঁড়ে ঘরে আগুন লাগলে এই ভেবে খুশী হয় যে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে অন্ধকারের ভয় থাকবে না।

এগারোটার সময় তিনজনে গাড়ী করে আশ্রমে পেঁছাল। বিঠলদাস নেমেই সুমনকে খবর দিতে গিয়ে দেখেন সে জ্বরে বেহুঁস হয়ে আছে। আশ্রমের কয়েকটি মেয়ে তার শুশ্রূষায় ব্যস্ত। কেউ বাতাস করছে, কেউ মাথা টিপছে, থেকে থেকে কাতরানি শোনা যাচ্ছে। বিঠলদাস ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—ডাক্তার ডাকা হয়েছে ? উত্তর মিলল—হ্যাঁ, একটু আগে দেখে গিয়েছেন।

কয়েকজন মেয়ে শান্তাকে গাড়ী থেকে নামিয়ে আনল। শান্তা সুমনের পাশে দাঁড়িয়ে ডাকল, দিদি ! সুমন চোখ খুলল না। শান্তা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে সজল চোখে দিদিকে দেখতে লাগল। এই আমার আদরের দিদি যার সঙ্গে তিন চার বছর আগে খেলা করেছি। কোথায় গেল সেই কালো লম্বা চুল ? ফুলের মতো ফোটা সে মুখ কই ? সেই চঞ্চল, জীবন্ত, হাসিমাখা চোখ কোথায়

গেল? সেই কোমল শরীর, সিঁদুরের মত টকটকে রঙ, সেই গোলাপী গাল কোথায় গেল? এ কি সুমন? না তার শব? না তার নির্জীব মূর্তি? তার ফ্যাকাশে মুখে অনাসক্তি, সংযম, আত্মত্যাগের নির্মল জ্যোতি।

শান্তার হৃদয়ে ক্ষমা আর ভালবাসা উথলে উঠল। অন্য মেয়েদের চলে যেতে ইসারা করে সে কাঁদতে কাঁদতে সুমনের গলা জড়িয়ে বলল—দিদি, চোখ খোলো, শরীর কেমন লাগছে? আমি তোমার শান্তি।

সুমন চোখ মেলে পাগলের মত বিস্মিত চোখে শান্তাকে দেখে বলল—কোন্ শান্তি? তুই সরে যা, আমাকে ছুঁস না; আমি পাপী, অভাগী, ভ্রষ্টা; তুই দেবী সাধ্বী, আমার ছোঁয়া যেন তোর গায়ে না লাগে। বাসনা, লালসায় এই হৃদয় কলঙ্কিত হয়ে গেছে। তুই এর কাছে আসিস নে। এখান থেকে পালিয়ে যা, আমার সামনে নরকের অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে, যমদূতেরা ঐ কুণ্ডে আমাকে ফেলবার জন্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তুই এখান থেকে পালিয়ে যা—বলতে বলতে সুমন আবার অজ্ঞান হয়ে গেল।

শান্তা সারারাত সুমনের পাশে বসে হাওয়া দিতে লাগল।

৪৩

শান্তার আশ্রমে আসার পর এক মাস কেটে গেলেও পদ্মসিংহ এখনও পর্যন্ত কারো সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেন নি। কখনো ভাবেন দাদাকে চিঠি লিখি, কখনো ভাবেন তাঁর কাছে গিয়ে সব বলি, কখনো বিঠলদাসকে পাঠাবার চিন্তা করেন, কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারছিলেন না।

এদিকে তাঁর বন্ধুরা বেশ্যাদের বিষয়ে প্রস্তাবটা শীঘ্র বোর্ডে তোলবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সফল হবার সম্ভাবনা ষোল আনা। দেরি করলে, বলা যায় না, কোন রকম বাধা হতে পারে। পদ্মসিংহ ব্যাপারটায় গড়িমসি করছিলেন। এইভাবে মে মাস এসে গেল, আর বিঠলদাস ও রমেশ দত্ত এমন তাড়া দিতে লাগলেন যে তিনি বিবশ হয়ে বোর্ডের নিয়মানুসারে নিজের প্রস্তাব দাখিল করলেন। দিন আর সময় স্থির হয়ে গেল।

দিন যত এগিয়ে আসে পদ্মসিংহের মনে অশান্তি ততই বাড়ে। তিনি বুঝতে পারলেন যে প্রস্তাবটা শুধু স্বীকৃত হয়ে গেলেই উদ্দেশ্য সফল হবে না। একে রূপায়িত করতে হলে শহরের সব হোমড়া চোমড়াদের সহানুভূতি আর সহযোগিতা প্রয়োজন। সেই জন্যে তিনি যে কোন উপায়ে হাজী হাসিমকে নিজের দলে টানতে চাইছিলেন। শহরে হাজী সাহেবের প্রভাব এত বেশী যে

বেশ্যারাও তাঁর আদেশ অমান্য করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত হাজী সাহেবও গলে গেলেন। পদ্মসিংহের সদুদ্দেশ্যে তাঁর বিশ্বাস হল।

আজ বোর্ডে প্রস্তাবটা উঠবে। মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের চত্বরে আজ খুব ভিড়। বেশ্যারাও সদল বলে বোর্ড অফিসে উপস্থিত। বোর্ডে তাদের কি হয় তাই জানতে।

বোর্ডের কাজ আরম্ভ হল। সব মেম্বার উপস্থিত। ডাক্তার শ্যামাচরণ পাহাড়ে যাওয়া মুলতুবি রেখেছেন। মুন্সী অবুল বফার তো সারারাত ঘুম হয় নি। শুধু ভেতর-বার করেছেন। আজ তাঁর পরিশ্রম আর উৎসাহের অন্ত নেই।

পদ্মসিংহ তাঁর প্রস্তাব উত্থাপন করলেন এবং উপযুক্ত ভাষণে তার উপকারিতা বোঝালেন। প্রস্তাবটা তিন ভাগে বিভক্তঃ (১) বেশ্যাদের শহরের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে জনবসতি থেকে দূরে রাখা হোক, (২) শহরের মধ্যে প্রধান বেড়াবার জায়গায় ও পার্কে তাদের আসা নিষিদ্ধ করা হোক, (৩) বেশ্যাদের নাচ গান করানোর উপর মোটা রকম ট্যাক্স ধার্য করা হোক এবং এ সব যেন কখনও উন্মুক্ত স্থানে করা না হয়।

প্রফেসর রমেশদত্ত প্রস্তাবটি সমর্থন করলেন।

সৈয়দ শফকত অলী (পেং ডেপুটী কলে) বললেন—প্রস্তাবটা আমি ভাল মনে করি কিন্তু উপযুক্ত সংশোধন ছাড়া আমি এটা সমর্থন করতে পারি না। আমার মত হচ্ছে রিজল্যুশনের প্রথম ভাগে এই শব্দগুলো জুড়ে দেওয়া হোক—কেবল তাদের বাদ দিয়ে যারা ন' মাসের মধ্যে হয় নিকা করে নেবে অথবা এমন কিছু শিল্পকর্ম শিখে নেবে যা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে।

কুমার অনিরুদ্ধ সিংহ বললেন—এ সংশোধনে আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে। বেশ্যাদের পতিত মনে করবার কোন অধিকার আমাদের নেই। সেটা আমাদের পরম ধৃষ্টতা। আমরা দিন রাত ঘুষ নিচ্ছি, সুদ আদায় করছি, গরীবের রক্ত চুষছি, অসহায়ের গলা কাটছি ; তাই সমাজের কোন অঙ্গকে নিচু বা তুচ্ছ মনে করবার অধিকার আমাদের নেই। সবচেয়ে নীচ আমরা, সব চেয়ে পাপী, দুরাচারী হচ্ছি আমরাই যারা নিজেদের সভ্য, উদার, খাঁটি মনে করি। আমাদের শিক্ষিত ভাইদের দৌলতেই দালমন্ডী সমৃদ্ধ। তাই চকে শোরগোল আর বেশ্যাপাড়া জমজমাট। এই মীনাবাজার তো আমরাই সাজিয়েছি, এ পাখীদের আমরাই ফাঁদ পেতে ধরেছি। এই কাঠপুতুল সব তো আমাদেরই সৃষ্টি। যে সমাজে অত্যাচারী জমিদার, ঘুষখোর রাজকর্মচারী, অন্যায়ী মহাজন, স্বার্থপর বন্ধু আদর সম্মানের পাত্র হয়, সেখানে দালমন্ডী জাঁকজমকে ভরে উঠবে না কেন ? অসৎপথের অর্থ অসতের কাছে ছাড়া আর কোথায় যাবে ? যেদিন উপহার, ঘুষ আর সুদের সুদ আদায় বন্ধ হবে সেদিনই

কারামণ্ডী খালি হয়ে যাবে, সব পাখী উড়ে যাবে—তার আগে নয়। সংশোধনী ছাড়া মধ্যপ্রস্তাব যেন বিনা মসলাপাটিতে কাটা না। আমি তো মেনে নিতে পারি না।

প্রভাকর রাও বললেন—আমি তো বুঝতে পারছি না সংশোধনীর সঙ্গে প্রস্তাবের সম্বন্ধ কোথায়? আপনি এটা অন্য একটা প্রস্তাব করে আনতে পারেন। তাদের সুপথে আনার জন্যে যা কিছু করবেন তা সর্বদা প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু এ কাজটা শহর থেকে সরিয়ে এনে করলে শহরে রেখে করানোর মতই সহজ হবে, বরং এতে বেশী সুবিধা হবে।

অবদুল বফা—আমি এই সংশোধনী সম্পূর্ণ সমর্থন করি।

আব্দুল লতীফ—সংশোধনী ছাড়া প্রস্তাব মানতে রাজী নই।

দীনানাথ তেওয়ারীও সংশোধনীর উপর জোর দিলেন।

পদ্মসিংহ বললেন—আমার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য বেশ্যাদের কষ্ট দেওয়া নয়, বরং তাদের সুপথে আনা। তাই এই সংশোধনী মেনে নিতে আমার কোন আপত্তি নেই।

সেয়দ তেগ আলী বললেন—সংশোধনীর ফলে প্রস্তাবের আসল উদ্দেশ্যই মাটি হয়ে যাবার ভয় আছে। আপনারা যেন বাড়ীর সদর দরজা বন্ধ করে পিছন দিকে অন্য দরজা তৈরি করছেন। যে মেয়েরা এতকাল ভোগবিলাসে অসংযত জীবন কাটিয়েছে। তাদের পক্ষে জীবনধারণের জন্যে মেহনত ও মজদুরির পথ বেছে নিতে রাজী হওয়া অসম্ভব। এই সংশোধনীর সুযোগ নিয়ে তারা অনুচিত সুবিধা আদায় করবে। কেউ নিজের বালাখানায় একটা সিঙ্গার মেশিন রেখে নিজেকে বাঁচাবে, কেউ মোজা বোনার মেশিন রাখবে, কেউ পানের দোকান খুলে বসবে, কেউ বা ডালায় আপেল বেদানা সাজিয়ে বালাখানায় রেখে দেবে। নকল নিকা, শাদির ধুম পড়ে যাবে আর এ সবের আড়ালে আগের চেয়েও অনাচার বেড়ে যাবে। এই সংশোধনী মঞ্জুর করা হচ্ছে মানব প্রকৃতির অজ্ঞতার পরিচয়।

হকীম শোহরৎ খাঁ বললেন—সৈয়দ তেগ আলীর ধারণা আমারতো ভুল মনে হয়। প্রথমে এই দুষ্টাদের শহর থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত। পরে যদি তারা সৎভাবে জীবন কাটাতে চায় তবে সেটা যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য হলে পরীক্ষা নিয়ে তাদের শহরে বসবাসের অনুমতি দেওয়া উচিত। শহরের দরজা তো বন্ধ নেই, যে চায় সে এসে থাকতে পারে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই সংশোধনীর ফলে প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে।

শরীফ হসন উকীল বললেন—পণ্ডিত পদ্মসিংহ যে একজন সতিসৎ, দয়ালু ভদ্রলোক তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এই সংশোধনী মেনে নিয়ে প্রস্তাবের উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি না রেখে সর্বজনপ্রিয় হবার চেষ্টা করেছেন। এর জের

প্রস্তাবটা না তোলাই ভালো হত। সৈয়দ শরাফত অলী সাহেব যদি আর একটু ভেবে কাজ করতেন তবে তিনি কখনই এই সংশোধনীর কথা তুলতেন না।

শাকির বেগ বললেন—কম্প্রোমাইজ করা দেশের ব্যাপারে যতই প্রশংসনীয় হোক না কেন সামাজিক সমস্যায় এটা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়; এতে সামাজিক ব্যাভিচার শুধু পরদার আড়ালে রাখা হয়।

সভাপতি শেঠ বলভদ্রদাস প্রস্তাবের প্রথম অংশের উপর ভোট নিলেন। পক্ষে ৯ জন, বিপক্ষে ৮ জন। প্রস্তাব স্বীকৃত হয়ে গেল।

তারপর সংশোধনীর জন্য ভোট নেওয়া হল। ৮ জন পক্ষে, ৮ জন বিপক্ষে। সংশোধনী পাশ হয়ে গেল। সভাপতি অনুকূলে ভোট দিলেন। ডাক্তার শ্যামাচরণ কোন পক্ষে ভোট দেন নি।

প্রফেসর রমেশ দত্ত, রুস্তম ভাই আর প্রভাকর রাও সংশোধনীর স্বীকৃতিকে নিজেদের হার ভেবে পদ্মসিংহের দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন তিনি বিশ্বাস-ঘাতকতা করছেন। কুমার সাহেবের সম্বন্ধে তাদের ধারণা হল যে তিনি শুধু বাক্যবাগীশ, সন্দেহপ্রবণ ও সিদ্ধান্তহীন মানুষ।

অবুল বফা ও তাঁর বন্ধুরা খুব খুশী, যেন তাদেরই জিত হয়েছে। তাঁদের আনন্দের উচ্ছ্বাস প্রভাকর রাও ও তাঁর বন্ধুদের বুকে কাঁটার মত বিঁধছিল।

প্রস্তাবের দ্বিতীয় অংশের জন্য ভোট নেওয়া হল। প্রভাকর রাও ও তাঁর বন্ধুরা এবার বিরোধিতা করলেন। তাঁরা পদ্মসিংহকে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দিতে চাইছিলেন। প্রস্তাবের দ্বিতীয় ভাগ অস্বীকৃত হল। আবুল বফা বন্ধুদের সঙ্গে বগল বাজাতে লাগলেন।

এবার প্রস্তাবের তৃতীয় ভাগের পালা এল। কুমার অনিরুদ্ধসিংহ এর সমর্থন করলেন। হকীম শোহরত খাঁ, সৈয়দ শফকত অলী, শরীফ হসন আর শাকির বেগ এর অনুমোদন করলেন। কিন্তু প্রভাকর রাও ও তাঁর বন্ধুরা এর বিরোধিতা করেন। সংশোধনী পাশ হয়ে যাবার পর এ সম্বন্ধে সব প্রচেষ্টাই তাঁদের বিচারে নিষ্ফল বলে মনে হচ্ছিল। তাঁদের স্বভাব হচ্ছে, হয় সবটাই নেব নয়তো কিছুই নেব না। এ প্রস্তাবও অস্বীকৃত হল।

রাত হয়ে গেলে সভা ভঙ্গ হল। যাদের হারবার ভয় ছিল তারা হাসতে হাসতে চলে গেল; আর যারা জিতবে বলে নিশ্চিত ছিল তাদের চেহারায় উদাস ভাব।

যাবার সময় কুমার সাহেব মিস্টার রুস্তমভাইকে বললেন—আপনারা একি করলেন?

রুস্তমভাই ব্যঙ্গ করে উত্তর দিলেন—আপনি যা করলেন আমিও তাই করলাম। আপনি ঘড়া ফুটো করলেন, আমি সেটা আছড়ে ফেলে দিলাম। দুইয়ের পরিণাম একই।

সবাই চলে গেলেন। অন্ধকার বাড়ছে। চোকীদার ও মালীও ফটক বন্ধ করে চলে গেলে। শুধু পদ্মসিংহ সেখানে মাঠে ঘাসের উপর চিন্তামগ্ন মুখে বসে রইলেন।

৪৪

সংশোধনী মেনে নিয়ে যে পদ্মসিংহ ভুল করেছেন এটা পদ্মসিংহ মন থেকে মেনে নিতে পারেন নি। একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে বন্ধুরা যে এত বিরোধিতা করবে তা তিনি কল্পনা করতে পারেন নি। প্রস্তাবের একটা অংশ পাশ না হবার দোষটা তাঁর ঘাড়ে চাপানোর জন্যে তাঁর দুঃখ ছিল না যদিও তাঁর মনে হচ্ছিল যে এর জন্যে দায়ী হচ্ছে সঙ্গীদের অসহিষ্ণুতা আর অদূরদর্শিতা। সংশোধনীটাকে তিনি গৌণ ভেবেছিলেন। এর অপব্যবহার হবার সম্ভাবনা পদ্মসিংহ বিশ্বাস করেন নি। এই অবিশ্বাস প্রস্তাবের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর ঘাড়েই চাপিয়ে দিচ্ছিল। ক্রমশ তাঁর ধারণা হতে লাগল যে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এ প্রস্তাবে সুফল হবার সম্ভাবনা নেই।

অনর্থক এই ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ার জন্যে মাঝে মাঝে তাঁর অনুতাপ হত। এই কাঁটার ঝোপে কেন যে ঝাঁপ দিতে গেলেন তা ভেবে পেলেন না। ব্যর্থতার ভার যদি সংশোধনীর ঘাড়ে পড়ে তবে একটা ভারী দায়িত্ব থেকে মুক্তি পান; কিন্তু এটা দুরাশা মনে হচ্ছিল। সমস্ত বদনাম তাঁর ঘাড়েই চাপানো হবে, বিরোধীদল ব্যঙ্গ করবে, তাঁর ধৃষ্টতার জন্যে কত টীকা-টিপ্পনী হবে আর এ সব তাঁকে একলা সহ্য করতে হবে।

তাঁর কোন বন্ধু নেই, সান্ত্বনা দেবার দেবার কেউ নেই। আশা ছিল বিঠলদাস তাঁর সঙ্গে ন্যায্য ব্যবহার করবেন, তাঁর রুষ্ট বন্ধুদের ঠাণ্ডা করবেন কিন্তু বিঠলদাস উলটে তাঁকেই দোষী সাব্যস্ত করলেন। তিনি বললেন—আপনি সংশোধনী প্রস্তাব মেনে নিয়ে সমস্ত গুড়কে গোবর করে দিয়েছেন, কত বছরের পরিশ্রম জলে গেল। শুধু কুমার সিংহ ছিলেন একমাত্র লোক যিনি পদ্মসিংহকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, সহানুভূতি দেখিয়েছেন।

সারা মাস পদ্মসিংহ কাছারি গেলেন না। একলা বসে শুধু এই বিষয়ে চিন্তা করতেন। তাঁর চিন্তায় একটা নিস্পৃহ ভাবে এসে গিয়েছিল। বন্ধুদের বিরোধিতায় দুঃখ পেয়ে তিনি ভাবতেন, যদি এমন সুশিক্ষিত বিবেচক পুরুষেরা একটা সামান্য কথার জন্যে নিজেদের স্থির সিদ্ধান্তের প্রতিকূল ব্যবহার

করেন তবে এ দেশের কল্যাণের কোনও আশা নেই। সংশোধনী স্বীকার করে আমি ভুল করেছি স্বীকার করছি কিন্তু আমার ভুল তাঁদের পথভ্রষ্ট করবে কেন?

এই মানসিক কষ্টভোগের সময় পদ্মসিংহ এই প্রথম অনুভব করলেন মনকে স্বচ্ছ করে তুলতে অবলা স্ত্রী কতটা শক্তি ধরে। সারা সংসারে একমাত্র সুভদ্রাই তাঁর মনের অবস্থা ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছে। সংশোধনী তিনি যতটা দরকারী মনে করেন সুভদ্রার বিবেচনায় তার প্রয়োজন আরও বেশী। যে তাঁর বন্ধুদের সম্বন্ধে তাঁর চেয়েও বেশী তাঁর সমালোচনা করত। তার কথায় পদ্মসিংহ শান্তি পেতেন, যদিও তিনি বুঝতেন যে এমন দুরূহ বিষয় বোঝাবার ও বিচার করবার সামর্থ্য সুভদ্রার নেই, সে যা বলে তা তাঁর কথারই প্রতিধ্বনি তবু তাঁর আনন্দে কোন বাধা পড়ত না।

কিন্তু মাস শেষ হবার আগেই প্রভাকর রাও নিজের পত্রিকার এই প্রস্তাব নিয়ে ধারাবাহিক ভাবে লিখতে আরম্ভ করলেন। লেখায় পদ্মসিংহকে এমন মর্মভেদী আঘাত করতে লাগলেন যে তা পড়ে তিনি জ্বলে উঠতেন। এক লেখায় তিনি পদ্মসিংহের ভূতপূর্ব চরিত্র ও সংশোধনীর মধ্যে সম্বন্ধ দেখালেন। অন্য দিন তাঁর আচরণ সম্বন্ধে আক্ষেপ করে লিখলেন। ইনি হচ্ছেন বর্তমান কালের দেশসেবক যিনি দেশকে ভুলতে পারলেও নিজেকে কখনও ভোলেন না। যিনি দেশসেবার আড়ালে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করে যাচ্ছেন। জাতির নবযুবকেরা অতলে তলিয়ে যায় তো যাক, কিন্তু কাশীর হাকীর কৃপা যেন অটুট থাকে।

এই সংকীর্ণতা এবং মিথ্যা অভিযোগের জন্য পদ্মসিংহের যেমন রাগ হচ্ছিল তেমনি তিনি আশ্চর্যও হচ্ছিলেন। আজ তিনি অনুভব করলেন অভদ্রতা কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে। এঁরাই সভ্যতা ও শালীনতার ধ্বজাধারী বলে পরিচয় দেন কিন্তু নিজেরা এত ঘৃণ্য! কারুরই এর প্রতিবাদ করবার সাহস-টুকুও নেই।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। কাগজটা খাটের উপর রাখা। পদ্মসিংহ টেবিলের সামনে বসে লেখাটার উত্তর লেখবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু কলম চলছিল না। এমন সময় সুভদ্রা এসে বলল—গরমে এখানে বসে কেন? বাইরে বসবে চলো।

পদ্ম—প্রভাকররাও আজ আমাকে খুব গালাগালি দিয়েছে; তারই জবাব লিখছি।

সুভদ্রা—ও এমন করে তোমার পেছনে লেগেছে কেন?

এই বলে সুভদ্রা কাগজটা নিয়ে লেখাটা পড়তে লাগল। আর পাঁচ মিনিটে তার আদ্যোপান্ত পড়ে ফেলল।

পদ্ম—লেখাটা কেমন হয়েছে?

সুভদ্রা—এ কি আর লেখা, এ তো সোজা গালাগালি। আমি তো জানতাম গালাগালির লড়াই শুধু মেয়েরাই করে কিন্তু এখন দেখছি পুরুষেরা আমাদের চেয়েও এগিয়ে আছে। আচ্ছা, ইনি নিজে কি বিদ্বান?

পদ্ম—বিদ্বান হবে না কেন, সারা দুনিয়ার বই গুলে খেয়েছে।

সুভদ্রা—আর এই তার পরিচয়?

পদ্ম—আমি এর উত্তর লিখছি। এমন চুটিয়ে লিখব যে বাছাধন টের পাবেন কার পাল্লায় পড়েছেন।

সুভদ্রা—কিন্তু গালাগালির উত্তর আবার কি হবে?

পদ্ম—গালাগালি।

সুভদ্রা—না, গালাগালির উত্তর হচ্ছে মৌনতা। গালাগালের উত্তরে গালাগাল তো মূর্খেও দেয়, তবে তার আর তোমার মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

পদ্মসিংহ সশ্রদ্ধভাবে সুভদ্রার দিকে তাকালেন। তার কথা তাঁর মনে দাগ কাটল। অহঙ্কারের বশে আমরা যাদের মূর্খ বলি তাদের কাছেও আমরা মাঝে মাঝে শিক্ষা পাই।

পদ্ম—তবে মৌনব্রত ধারণ করি?

সুভদ্রা—আমি তো তাই বলি। ওর যা মনে আসে বলে যাক, পরে কোন সময় নিশ্চয় লজ্জিত হবে। আর সেইটেই হবে শাস্তি।

পদ্ম—ও কখনই লজ্জিত হবে না। এরা লজ্জিত হতে জানে না। আমি যদি এখন তার কাছে যাই তো আমায় খুব আদর অভ্যর্থনা করবে, হেসে হেসে কথা বলবে; কিন্তু সন্ধ্যা হতে না হতেই আবার গাল দেওয়ার নেশা চড়ে যাবে।

সুভদ্রা—এদের কাজ কি শুধু অপরের কুৎসা ছড়ানো?

পদ্ম—তা নয়, তবে সম্পাদকেরা গ্রাহক বাড়াবার জন্যে এইরকম রঙবেরঙের ফুলঝুরি ছড়াতে থাকেন। এই রকম কেচ্ছা ভরা লেখা থাকলে কাগজের বিক্রি বাড়ে। লোকে এ সব পড়ে আনন্দ পায় আর সম্পাদকরাও নিজের মহান কর্ত্তব্য ভুলে জনতার কেচ্ছাপ্রীতি বাড়িয়ে তোলেন। কিছু সম্পাদক তো বলেন যে গ্রাহককে খুশী রাখাটাই তাঁর কর্ত্তব্য। আমরা যার খাই তার গুণই গাইব।

সুভদ্রা—তবে তো এঁরা শুধু পয়সার গোলাম। এঁদের উপর রাগ না করে বরং করুণা করাই উচিত।

পদ্মসিংহ টেবিল ছেড়ে উঠলেন। উত্তর দেবেন না ঠিক করলেন। আগে সুভদ্রার বিচার শক্তিতে তাঁর আস্থা ছিল না। এখন তিনি বুঝলেন যে যদিও তিনি অনেক লেখাপড়া করেছেন তবু তার মত উদারমনা হতে পারেন নি। সে অশিক্ষিতা হলেও তার বিচার বুদ্ধি অনেক বেশী। তিনি আজ বুঝলেন স্ত্রী নিঃসন্তান হলেও পুরুষের জন্যে সে শান্তি ও আনন্দের উৎস হতে পারে। তিনি সুভদ্রার প্রতি নতুন করে আকর্ষণ বোধ করলেন। সেই প্রেমের স্রোতে কয়েক বছরের মনের মালিন্য কেটে গেল। তিনি সুভদ্রাকে যেন নতুন করে পেলেন। তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরে সুভদ্রা আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল।

৪৫

সুমনকে দেখে সদন যখন ফিরে এল তখন তার মনে হল যেন চোরে তার সঞ্চিত ধন চুরি করে নিয়েছে।

সে ভাবছিল, সুমন আমার সঙ্গে কথা কইল না কেন, আমার দিকে তাকাল না কেন? না, সে নিজের পূর্ব জীবনের জন্য লজ্জিত হয়ে আমায় ভুলে যেতে চাইছে। হয়তো আমার ব্যাপারটা জেনে আমায় নিষ্ঠুর ভাবছে। সুমনের সঙ্গে আরেকবার দেখা করবার প্রবল ইচ্ছা হল। পরদিন আবার বিধবাশ্রম মাঠের দিকে রওনা হল কিন্তু মাঝপথ থেকেই ফিরে এল। তার ভয় হল যদি শান্তার কথা ওঠে তবে আমি তার কি জবাব দেব। সেই সঙ্গে স্বামী গজানন্দের উপদেশও মনে পড়ল।

আজকাল মাঝে মাঝে সদন শান্তার প্রতি তার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা করে। কয়েক মাস ধরে সমাজ সংক্রান্ত বক্তৃতা শোনার পর সদনের উপর তার কোনও প্রভাব পড়বে না—এটা অসম্ভব। তার মন বলছে, আমরা শান্তার উপর অবিচার করছি কিন্তু বিবেকের নির্দেশে কোন কিছু গ্রাহ্য না করে কর্ত্তব্য করে যাবার মত শক্তি তখনও তার হয় নি।

আজকাল বেশ মন দিয়ে লেখাপড়া করছে। চক ও দালমণ্ডী ভ্রমণ থেকে বঞ্চিত হয়ে তার প্রাণশক্তি এই নতুন পথ ধরেছে। আর্য সমাজের উৎসবের সময় চরিত্র গঠনের মহত্ত্ব সম্বন্ধে সে কয়েকটা বক্তৃতা শুনেছিল। আগে তার ধারণা ছিল তার সব শিক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছে কিন্তু বক্তৃতা শুনে তার ভ্রম দূর হল। শুনেছিল শুধু বেশী বিদ্বান হলেই লোকের আত্মিক উন্নতি হয় না। এর জন্য সচ্চরিত্র হওয়া নিতান্ত দরকার। চরিত্রের তুলনায় বিদ্যার মূল্য অনেক কম। সেদিন থেকেই সে চরিত্রগঠন ও মনোবল সম্বন্ধে নানা বই পড়তে লাগল। দিন দিন পড়ার ঝোঁক বাড়ছিল; তার এখন মনে হতে লাগল যে বিদ্যাহীন হলেও সে সংসারে কিছু কাজ করতে পারে। বইপত্রে ইন্দ্রিয় সংযম করার জন্যে যে সব নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সে সব কখনও ভুলত না।

মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের যে সভায় বেশ্যাদের সম্বন্ধে প্রস্তাবটা উঠেছিল সে সভায় সদন উপস্থিত ছিল। সংশোধনী পাশ হওয়াতে সে হতাশ হয়ে গিয়েছিল আর কাকার ভুল হয়েছে মেনে নিয়েছিল কিন্তু যখন প্রভাকর রাও পদ্মসিংহের নামে কুৎসা রটাতে শুরু করলেন তখন সে কাকাকে সমর্থন করতে ব্যগ্র হল।

সে দু তিনটে প্রবন্ধ লিখে ডাকে প্রভাকর রাওয়ের কাছে পাঠাল। কয়েকদিন সেগুলো প্রকাশিত হবার আশায় রইল। তার ধারণা তার লেখাগুলো ছাপা হলেই হুলস্থূল পড়ে যাবে, সংসারে একটা বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটে যাবে ডাকে

কাগজ এলেই সে নিজের লেখার খোঁজ করত কিন্তু তার বদলে দেখতে পেত সেই পুরোনো কুৎসা ভরা লেখা। সেগুলো পড়ে তার শরীর মন জ্বলতে থাকে। শেষ লেখাটা পড়ে তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটবার উপক্রম হল। সে ঠিক করল যাই ঘটুক না কেন সম্পাদক কে শিক্ষা দেওয়া দরকার। তিনি যদি সজ্জন হতেন তো আমার লেখাগুলো ছাপতেন। তার ভাষা হয়তো অশুদ্ধ, কিন্তু যুক্তিহীন তো ছিল না। সেগুলো চেপে রাখার প্রমাণ হচ্ছে যে তিনি সত্যাসত্য জানতে চান না; শুধু জনতাকে খুশী করতে প্রতিদিন গালমন্দ করেন। নিজের অভিপ্রায় সে কাউকে জানাল না, সন্ধ্যার সময় মোটা লাঠি হাতে 'জগৎ কার্যালয়ে' হাজির হল। কার্যালয় বন্ধ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু প্রভাকররাও নিজের সম্পাদকীয় ঘরে বসে কিছু লিখছিলেন। সদন অসংকোচে ভিতরে ঢুকে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। প্রভাকররাও চমকে মাথা তুলে দেখলেন এক লম্বা চওড়া যুবক লাঠি হাতে উদ্ধত ভাবে দাঁড়িয়ে। রুষ্ট হয়ে বললেন—আপনি কে ?

সদন—আমি এখানেই থাকি। আপনার কাছে শুধু জানতে চাই আপনি এতদিন ধরে পদ্মসিংহকে কেন গালাগাল দিচ্ছেন ?

প্রভাকর—আচ্ছা, আপনিই কি দু তিনটে লেখা আমার কাছে পাঠিয়ে ছিলেন ?

প্রভাকর—সেজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ দিই। আসুন, বসুন; আমি তো আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলাম, কিন্তু আপনার ঠিকানা জানতাম না। আপনার লেখা ভালো আর যুক্তিপূর্ণ। আমি ওগুলো আগেই ছাপতাম কিন্তু অজ্ঞাত নামা লেখা ছাপা নিয়ম বিরুদ্ধ বলে নিরুপায় ছিলাম। আপনার নাম কি ?

সদন নিজের নাম জানাল। তার রাগ একটু কমেছে।

প্রভাকর—আপনাকে তো শর্মাজীর পরম ভক্ত বলে মনে হচ্ছে।

সদন—আমি তাঁর ভাইপো।

প্রভাকর—আরে, তবে তো আপনি আমাদেরই দলে। বলুন, শর্মাজী ভালো আছেন তো ? তাঁর দেখা তো পাই না।

সদন—এখন পর্যন্ত তো ভালো আছেন, কিন্তু আপনার লেখায় এই সুর বজায় থাকলে তাঁর কি গতি হবে সেটা ঈশ্বরই জানেন। আপনি তাঁর বন্ধু হয়ে কি করে এত বিদ্বেষ ছড়াচ্ছেন ?

প্রভাকর—বিদ্বেষ ? রাম-রাম ! আপনি বলছেন কি ? তার প্রতি আমার লেশমাত্র বিদ্বেষ নেই। আমাদের সম্পাদকদের কর্তব্য সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন না। পাবলিককে সব কিছু জানানো আমাদের ধর্ম। মনোভাব লুকিয়ে রাখা আমাদের নীতি-বিরুদ্ধ। আমরা কারো মিত্র নই, শত্রুও নই। আমরা আমাদের আজকের বন্ধুদের এক মুহূর্তে ত্যাগ করি আর আজন্ম শত্রুকে এক

মুসলমানদের আপন করে নিতে পারি। সার্বজনিক বিষয়ে আমরা কারও কোনো ক্ষতি করি না, কারণ আমরা ক্ষমা করলে তার প্রভাব আরো ক্ষতিকারক হয়ে পড়ে।

'পদ্মসিংহ আমার বিশিষ্ট বন্ধু, তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে। তাঁর বিরুদ্ধে লিখতে আমার কষ্ট হয়। পরশু পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার শুধু মতের পার্থক্য ছিল, কিন্তু সেই দিনই এমন প্রমাণ আমি পেয়েছি যাতে বোঝা যায় যে ঐ সংশোধনী স্বীকার করার পিছনে তাঁর অন্য উদ্দেশ্য ছিল। আপনাকে বলতে বাধা নেই উনি কয়েকমাস আগে সুমন বাঈ নামে এক বেশ্যাকে চুপি-চুপি বিধবাশ্রমে ঢুকিয়ে দিয়েছেন আর প্রায় মাস খানেক আগে তার ছোট বোনকেও আশ্রমে রেখে দিয়েছেন। আমি তো এখনও চাই যে খবরটা যেন মিথ্যে হয়। অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, শুধু এর প্রতিবাদের প্রত্যাশাতেই আমি শীঘ্রই এই খবরটা ছাপিয়ে দেব।

সদন—এ খবর আপনি কোথায় পেলেন ?

প্রভাকর—সেটা আমি বলতে পারি না, তবে আপনি শর্মাজীকে বলে দেবেন যে এটা যদি তার উপর মিথ্যা দোষারোপ হয় তবে তিনি আমাকে জানিয়ে দিন। আমি তো শুনেছি প্রস্তাবটা বোর্ডে তোলবার আগে হাজী হাসীমের কাছে প্রতিদিন যেতেন। এই অবস্থায় আপনি নিজেই বুঝতে পারেন, তাঁর উদ্দেশ্য যে কতখানি নিঃস্বার্থ তা আমি কি করে বুঝব ?

সদনের রাগ ঠাণ্ডা হল। প্রভাকররাওয়ের কথায় সে বশীভূত হয়ে গেল, তাঁর উপর শ্রদ্ধা হল। কথাবার্তার পর সে ঘরে ফিরে এল। এখন তার প্রবীণ চিন্তা, শান্তাকে সত্যিই আশ্রমে আনা হয়েছে কি না।

রাতে খেতে বসে তার খুব ইচ্ছে হল শর্মাজীর সঙ্গে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করে কিন্তু সাহসে কুলোল না। সুমনকে বিধবাশ্রমে যেতে সে নিজেই দেখেছে, কিন্তু এখন এমন কয়েকটা কথা তার মনে পড়ল যার তাৎপর্য এতদিন সে বুঝতে পারে নি; তাই তার মনে সন্দেহ হল যে শান্তাকে হয়তো সত্যিই আশ্রমে আনা হয়েছে।

সদনের সারা রাত অস্থিরতায় কাটল। শান্তা আশ্রমে এল কেন ? কাকা এখানে আনলেন কেন ? উমানাথ কি তাঁকে ঘরে রাখতে চান না ? এই সব প্রশ্ন তার মনে ওঠে। সকালে সে বিধবাশ্রম ঘাটের দিকে গেল, উদ্দেশ্য—সুমনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তো সব কথা জিজ্ঞাসা করব। সেখানে একটু অপেক্ষা করবার পর সুমনকে আসতে দেখা গেল। ওর পিছনে আর এক সুন্দরী আসছে। তার মুখ ঘোমটায় ঢাকা।

সদনকে দেখেই সুমন থমকে দাঁড়াল। কয়েকদিন ধরে সে সদনের সঙ্গে দেখা করতে চাইছিল। যদিও প্রথমে সে স্থির করেছিল যে সদনের সঙ্গে কখনও কথা বলবে না, কিন্তু শান্তাকে উদ্ধার করতে হলে কথা বলা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

লজ্জিতভাবে সে বলল—সদন সিংহ, বহু ভাগ্যে আজ তোমার দেখা পেয়েছি। তুমি তো এদিকে আসাই ছেড়ে দিয়েছ। ভাল আছ তো?

সদন সঙ্কুচিত হয়ে বলল—হ্যাঁ, ভালোই সব।

সুমন—বড় রোগা মনে হচ্ছে। অসুখ হয়েছিল নাকি?

সদন—না ভালই আছি। আমার কাছে মরণ আসবে কেন?

আমরা নিজেদের আক্ষেপ জানাতে আর অপরের সহানুভূতি জাগাতে প্রায়ই এ রকম কৃত্রিম কথার আশ্রয় নিয়ে থাকি।

সুমন—চুপ করো, এমন অলক্ষুণে কথা বোলো না। আমি মরতে চাইলেই ঠিক হত, আমার জন্যেই এ সব হচ্ছে। এ রামলীলায় আমিই হচ্ছি কৈকেয়ী। নিজেও ডুবেছি আর অপরকেও আমার সঙ্গে ডোবাচ্ছি। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? বসে পড়। তোমার সঙ্গে আজ আমার অনেক কথা আছে। কিছু মনে কোর না, এখন থেকে তোমায় ভাইয়া বলে ডাকব। এখন তোমার সঙ্গে আমার ভাই বোনের সম্পর্ক। আমি তোমার বড় শালী, যদি কোন কড়া কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে তবে কিছু মনে কোরো না। আমার কথা তুমি তো জেনেইছ। তোমার কাকা আমায় উদ্ধার করেন। এখন আমি বিধবাশ্রমে থেকে নিজের প্রায়শ্চিত্ত করছি আর চিরকাল করব। এদিকে এক মাস হল আমার অভাগী বোনও এখানে এসে গেছে। উমানাথের ঘরে সে টিকতে পারল না। শর্মাজীকে ভগবান চিরজীবী করুন, তিনি নিজে অমোলা গিয়ে একে এখানে এনেছেন। কিন্তু এখানে আনার পর তিনিও আর এর খোঁজখবর করেন না। আচ্ছা, তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি, বলতো এ কোথাকার নীতি যে এক ভাই চুরি করে আর অন্য ভাই ধরা পড়ে? তোমার তো আর এখন অজানা নয় যে আমার কপাল মন্দ বলে, গ্রহের ফেরে, পূর্বজন্মের পাপের ফলে আমি অভাগী ধর্মের পথ ছেড়েছি। তার জন্যে আমার শাস্তি পাওয়া উচিত আর আমি তা পেয়েছি। কিন্তু এ বেচারী কি দোষ করেছিল যে জন্যে তোমরা একে ত্যাগ করলে? এর উত্তর তোমায় দিতে হবে! দ্যাখ, গুরুজনদের দোহাই দিয়ো না, সে হচ্ছে কাপুরুষের চাল। সত্য করে বল এটা অন্যায় কি না? আর তুমি এ অন্যায় হতে দিলে কি করে? একটা অবলা মেয়ের জীবন নষ্ট করতে একটুও দয়া হল না?

শান্তা সেখানে না থাকলে সদন হয়তো নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে সাহস পেত। সে অন্যায়টা স্বীকার করে নিত। কিন্তু শান্তার সামনে তখনই এক কথায় হার মানতে প্রস্তুত সে ছিল না। আবার কুল মর্যাদার কথা তুলতেও তার সঙ্কোচ হচ্ছিল। সে এমন কিছু বলতে চায় না যাতে শান্তা দুঃখ পায়, কিংবা তার মনে মিথ্যা আশার সঞ্চার হয়। শান্তার উপর তার চোখ পড়াতে সে বিষম সংকটে পড়ল। তার দশা এখন সেই লোভী ছেলের

মতো যে নিমন্ত্রিত অতিথির আনা মিঠাই মুখে চোখে দেখে অথচ মায়ের ভয়ে হাত বাড়িয়ে নিয়ে খেতে পারে না। বলল—দিদি, আপনি তো গোড়াতেই আমার মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন, তাই কি করে বলি যে যা কিছু হয়েছে তা গুরুজনেরাই করেছেন। আমি তাঁদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজে রেহাই পেতে চাই না। সে সময় আমারও লোকলজ্জার ভয় হয়েছিল। আপনিও মানবেন যে সংসারে থেকে সংসারের নিয়ম মেনে চলতে হয়। অন্যায় হয়েছে মানছি, কিন্তু অন্যায়টা আমরা করিনি, ঐ সমাজই করেছে যার মধ্যে আমরা বাস করি।

সুমন—ভাই, তুমি লেখাপড়া জানা মানুষ। তোমার সঙ্গে কথায় পারবো না। তোমার যা উচিত মনে হয় তাই করো। অন্যায় কিন্তু অন্যায়ই, তা সে একজনই করুক বা গোটা সমাজই করুক। অপরের ভয়ে কারুর উপর অন্যায় করা অনুচিত। শান্তা এখানে দাঁড়িয়ে আছে তাই তার ব্যাপারটা ফাঁস করতে চাই না, কিন্তু এটুকু নিশ্চয় বলবে যে অন্যখানে তুমি অর্থ, সম্মান, রূপ, গুণ সব হয়তো পাবে কিন্তু এত প্রেম কোথাও পাবে না। ওর হৃদয় যদি তোমার মতই হত তবে আজ সে নতুন শ্বশুর বাড়ীতে আনন্দে দিন কাটাত। শুধু তোমার প্রতি প্রেমই তাকে এখানে টেনে এনেছে।

সদন দেখতে পেল শান্তার চোখের জল বেরিয়ে তারই পায়ে পড়ছে। তার সরল প্রেমিক হৃদয় দুঃখে ভরে উঠল। করুণ স্বরে বলল—বুঝতে পারছি না কি করবো? ঈশ্বর সাক্ষী করে বলছি দুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

সুমন—তুমি পুরুষ মানুষ, পরমেশ্বর তোমায় সব শক্তি দিয়েছেন।

সদন—আমাকে যা বললেন তাই করতে আমি রাজী।

সুমন—কথা দিচ্ছ তো?

সদন—আমার মনে এখন যা হচ্ছে তা ঈশ্বরই জানেন, মুখে কি বলবো?

সুমন—পুরুষদের কথায় বিশ্বাস হয় না।

এই বলে সুমন মুচকে হাসল। সদন লজ্জিত হয়ে বলল—ক্ষমতা থাকলে আমি হৃদয়টা বের করে এনে আপনাকে দেখাতাম। এই বলে সে আড়চোখে শান্তার দিকে তাকাল।

সুমন—বেশ, তবে তুমি এই গঙ্গার তীরে শান্তার হাত ধরে বল, তুমি আমার স্ত্রী, আর আমি তোমার স্বামী। আমি তোমার ভার নিলাম।

সদনের আত্মিক শক্তি হার মানল। সে এদিক ওদিক চাইতে লাগল যেন লুকোবার জায়গা খুঁজছে। তার মনে হল গঙ্গা যেন তাকে লুকিয়ে রাখার জন্যে এগিয়ে আসছে। ডুবন্ত মানুষের মতো একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে লজ্জায় চোখ নিচু করে থেমে থেমে বলল—সুমন, আমাকে ভেবে দেখবার অবসর দাও। সুমন নম্র হয়ে বলল—হ্যাঁ, ভেবে চিন্তেই ঠিক করো। আমি তোমায় কোন সঙ্কটে ফেলতে চাই না। এই বলে সে শান্তাকে বলল—দ্যাখ, তোর স্বামী

আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমার যা বলবার তাকে আমি তা বলেছি কিন্তু তার মন গলাতে পারলাম না। এখন সে চিরদিনের মতো হাতছাড়া হয়ে যাবে। যদি তোর প্রেম সত্যি হয় আর তাতে যদি শক্তি থাকে তো ওকে আটকে ভালবাসার অধিকার চেয়ে নে।

এই বলে সুমন গঙ্গার দিকে এগিয়ে গেল। শান্তাও ধীরে ধীরে তার পিছনে চলে গেল। তার প্রেম অভিমানে চাপা পড়েছে। যার নাম নিয়ে যাবজ্জীবন দুঃখ সইবার সংকল্প করেছিল, কল্পনায় যার পায়ে নিজেকে সমর্পণ করেছিল, তার উপর বিরূপ হয়ে উঠল। সে তার অবস্থার কথা ভাবল না, অসুবিধার কথা বিচার করল না, তার পরাধীনতার কথা চিন্তা করল না। এ সময় সে যদি সদনের সামনে হাতজোড় করে দাঁড়াত তাহলে তার অভীষ্ট সফল হতো কিন্তু সে সময় বিনয়ের চেয়ে অভিমান বড় হয়ে দাঁড়াল।

সদন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অনুতপ্ত হৃদয়ে ঘরের দিকে রওনা হল।

৪৬

সদনের মনে হচ্ছিল সে বিরাট অপরাধ করে ফেলেছে। বারবার নিজের কথাগুলো বিচার করে নিশ্চিত হল যে সে নিষ্ঠুরের মত কাজ করেছে অথচ বাসনা তাকে পাগল করে তুলেছিল।

সে ভাবত—সংসারকে এত ভয় করছি কেন? সংসার আমায় কি দিচ্ছে? শুধু মিথ্যে বদনামের ভয়ে আমি এমন রত্ন ত্যাগ করব? যা পূর্বজন্মের বহু তপস্যার ফলেই মেলে। আমার নিজের ধর্মপালন করবার জন্যে যদি আমার বন্ধুরা আমায় ত্যাগ করে তো ক্ষতি কি? লোকনিন্দার ভয় এইজন্যে দরকার যে সেটা খারাপ কাজ করতে বাধা দেয়। কিন্তু যদি সেটা কর্তব্যের পথে বাধা দেয় তবে তার জন্যে ভয় পাওয়া কাপুরুষতা। যদি আমি বিনা দোষে কারোর নামে অভিযোগ করি, তো সংসার আমাকে বদনাম দেয় না, বরং এ কুকাজে আমার সহায়তা করে। আমি যদি কারোর টাকা মেরে দিই, কারোর জমি বেইমানি করে নিয়ে নিই তো সংসার আমায় দন্ড দেয় না, দিলেও তা যৎসামান্য; কিন্তু এই কাজের জন্যে আমার বদনাম করে, মুখে চুণকালি মাখায়; না, লোকনিন্দার ভয়ে আমি এ অধর্ম করতে পারি না, ওকে মাঝদরিয়ায় ডুবতে দেব না। সংসার যাই বলুক না কেন, আমি এ অন্যায় করব না।

স্বীকার করি মা বাপের আদেশ পালন আমার ধর্ম। তাঁরা আমার জন্ম দিয়েছেন, আমায় পালন করেছেন। বাপের কোলে খেলেছি, মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়েছি। তাঁদের কথায় বিষ খেতে পারি, তলোয়ারের উপর চলতে পারি, আগুনে ঝাঁপ দিতে পারি, কিন্তু তাঁদের কথামতো যে মেয়েকে রক্ষা করা আমার

ধর্ম আরে অবহেলায় দূরে সরিয়ে দিতে পারব না। মা-বাপ আমার উপর বিরূপ হবেন নিশ্চয়, হয়তো আমায় ত্যাগ করবেন বা ভাববেন আমি মরে গেছি, কিন্তু কয়েক দিন দুঃখভোগ করে নিজেদের সামলে নেবেন। তাঁরা আমায় ভুলে যাবেন। সময়ে তাদের ঘা শুকিয়ে যাবে।

হায়! আমি কি কঠোর, কি পাষান-হৃদয়! যে মেয়ে প্রাসাদের শোভা হতে পারে সে আমার সামনে হাত জোড় করে দাঁড়াল তবু আমার মন গলল না? সে অবস্থায় আমি তার পায়ে মাথা রেখে জোড়হাতে বলতে পারতাম, দেবী! আমার অপরাধ ক্ষমা করো। গঙ্গাজল এনে তার পায়ে দিতাম যেমন করে উপাসক তার ইষ্টদেবীকে দেয়। তার বদলে আমি পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে থেকে কুল-মর্য্যাদার বেসুরো রাগিণী গাইতে লাগলাম। কি দুর্বুদ্ধি! আমার কথায় তার কোমল মনে কত না কষ্ট হয়েছে। সেটা তার অভিমানেই স্পষ্ট বোঝা যায়। সে আমাকে হৃদয়হীন, অহঙ্কারী, ধূর্ত্ত ভেবে আমার দিকে চোখ তুলেও চায়নি। বাস্তবে আমি এরই যোগ্য!

এই অনুতাপ কয়েকদিন ধরে সদনের মনে কাঁটার মত বিঁধতে লাগল। শেষে সে স্থির করল আলাদা আস্তানা করতে হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। এ ছাড়া গতি নেই। মা-বাপের বাড়ীর দরজা আমার জন্যে বন্ধ, কড়া নাড়লেও খুলবে না। কাকা আমায় আশ্রয় দেবেন বটে, কিন্তু তাঁর কাছে থেকে পরিবারে ভাঙন ধরাবার বীজ পোঁতা ভাল হবে না। মা বাবা ভাববেন উনি তাঁদের ছেলেকে বিগড়ে দিচ্ছেন। নিজের পথ নিজে দেখা ছাড়া আমার অন্য কোন উপায় নেই।

মনে হত, যাই, গিয়ে নিজের লাগানো আগুন নিভিয়ে দিই, কিন্তু চলতে গেলেই সহসা উপে যেত। মনে প্রশ্ন জাগত—কোন ভরসায় যাব? ঘর কই?

এই সমস্যার সমাধানের চিন্তায় সদন দিনরাত ডুবে থাকত। সারা শহর চষে বেড়াল। কখনো কাছারির দিকে যায়, কখনো বড় বড় কারখানায় ছোটাছুটি করে, দু চার ঘণ্টা ঘোরাঘুরি করে ঘরে ফিরে আসে। এতদিন সুখেই দিন কেটেছে; বিনয় শিক্ষা হয় নি, অহংকারী হয়েছে। পথ হাঁটে বুক ফুলিয়ে, কুছ পরোয়া নেই ভাব। সংসারের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। এখানে যে মাথা অনেকখানি নিচু করা দরকার সেটা তার জানা ছিল না। এখানে যে পাথরের নিদয় চৌকাঠে মাথা ঠুকতে জানে, যে উদ্যোগী, যে নিপুণ, নম্র, যে যোগীর মতই মনকে জয় করেছে, যে অন্যায়ের সামনে মাথা নত করে, অপমান গায়ে মাখে না আর যার আত্মমর্য্যাদাবোধ নেই শুধু তার প্রার্থনাই মঞ্জুর হয়।

যে সদগুণ মানুষকে দেবতুল্য করে তোলে, এখানে যে সে গুণের কদর নেই তা তার জানা ছিল না। সে সত্যবাদী, সরল, স্পষ্টভাষী, রেখে ঢেকে কাজ করতে জানে না। এ সব গুণের মহত্ব যতই থাক না কেন, সংসারের চোখে

বিদ্যার অভাব যে এ সব গুণে দিয়ে পূর্ণ করা যায় না সে জ্ঞান তার ছিল না। জীবনের অমূল্য সময় অনর্থক নষ্ট করেছে বলে অনুতাপের অন্ত নেই। স্বনির্ভর হবার মত কোন কাজ শেখে নি। এক মাসের বেশী কেটে গেল কিন্তু আজ পর্যন্ত সদনের কোন কাজ জুটল না।

হতাশায় তার মনে অসন্তোষের ভাব জেগে উঠল। নিজের মা-বাপ, কাকার উপর, সারা সংসারের উপর রাগ হল। কিছুদিন আগে সে নিজেও ফিটন চড়ে হাওয়া খেতে যেত, কিন্তু এখন কাউকে ফিটন চড়ে যেতে দেখলে তার গা জ্বলে উঠে। কোন বিলাসী লোককে পায়ে হেঁটে যেতে দেখলে সেও ইচ্ছে করে তার পাশে সমান তালে হাঁটত। ভাবত, বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকাতে দেখলেই মজা দেখিয়ে দেব। গাড়ীর কোচয়ানের চিৎকারের কোন তোয়াক্কা করত না। সবাইকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে ঝগড়া বাধাতে চাইত। ওরা গাড়ী চড়ে ঘোরে, কোট প্যান্ট পরে সেজে গুজে হাওয়া খেতে যায় আর তার কোন উপায় হয় না।

নিজেদের জমিদারি ছিল বলে সদনের মনে জীবিকার প্রশ্ন কোনদিন জাগে নি। তাই শিক্ষার প্রতি বিশেষ নজর পড়েনি; কিন্তু আজ সেই প্রশ্ন এসে পড়ায় সে বুঝতে পারল তার অক্ষমতা কত বেশী। ইংরাজী না পড়লেও হিন্দীভাষায় তার দখল বেশ ভালো। শিক্ষিত সমাজের মাতৃভাষার প্রতি অশ্রদ্ধাকে সে দেশ ও জাতির বিরোধিতা করা মনে করত। নিজেকে সচ্চরিত্র ভেবে সে গর্ববোধ করত। যেদিন তার লেখা 'জগৎ' পত্রিকায় ছাপা হল সেদিন থেকে সে ইংরাজী জানা লোকদের অশ্রদ্ধার চোখে দেখতে লাগল। তারা সবাই স্বার্থপর। গরীবের গলা টিপতে আর নিজেদের পেট ভরাতে তারা ইংরাজী শেখে; সবাই বিলাসিতার দাস; ইংরাজের মুখ ভঙ্গীটুকুই শিখেছে; দয়া ধর্ম নেই, মাতৃভাষার প্রতি টান নেই, চরিত্র নেই, আত্মবল নেই! এরা কি মানুষ?

এ সব কথাই সে ভাবত, কিন্তু এখন নিজের জীবিকার সমস্যা দেখা দিতে সে বুঝল যে সে তাদের উপর অবিচার করছিল। তারা বাস্তবিক দয়ার পাত্র। আমি ভাষায় পণ্ডিত না হতে পারি কিন্তু অনেকের চেয়ে বেশী জানি। আমার চরিত্র আদর্শ না হলেও অনেকের চেয়ে ভাল। আমার বিচার শক্তি ভাল না হলেও খারাপ নয়, তবু আমার জন্যে সব দরজাই বন্ধ। আমি কোথাও চাপরাসী হতে পারি, বড় জোর হয়তো কনস্টেবল হয়ে যাব। বাস; আমার দৌড় এই পর্যন্তই। এতে আমার প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে। আমি যতই চরিত্রবান, বুদ্ধিমান হই না কেন, ইংরাজী জানি না বলে সে সবের কোন দাম নেই। আমার চেয়ে অধম কে আছে যে এই অন্যায় চুপিচুপি সহ্য করে? না, উল্টে এ জন্যে আমার গর্ব করাই উচিত। মন থেকে চাকরি করার চিন্তা দূর করে দেওয়াই উচিত।

রাতের জঙ্গলে পথ ভুলে লোকে যেমন রাতের অন্ধকারকে দায়ী করে

সদনেরও ঠিক সেই অবস্থা হয়েছে এখন।

হতাশা আর চিন্তা নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে নদীর ধারে এমন জায়গায় সে এল যেখানে অনেক নৌকা জমা হয়েছে। নদীতে ছোট নৌকাগুলো এদিক ওদিক নেচে বেড়াচ্ছে। কোন নৌকা থেকে গানের সুর ভেসে আসছে। কিছু নৌকা থেকে মাল্লারা বস্তা নামাচ্ছে। সদন একটা নৌকায় উঠে বসল। সন্ধ্যার শান্তিদায়িনী ছটায় আর গঙ্গাতটের মনোরম দৃশ্যে সে মুগ্ধ হল। মনে হল কি আনন্দময় জীবনে এদের! ঈশ্বর আমাকে এমন একটা কুঁড়েঘর দিতেন তো আমি তাতেই খুশি হতাম। নদীর তীরে বেড়াই, ঢেউয়ের উপর চলি আর আনন্দে গান গাই। শান্তা কুঁড়ে ঘরের দরজায় আমার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। মাঝে মাঝে নৌকোয় বসে দুজনেই গঙ্গার উপর ঘুরে বেড়াই।

তার রসিক মন সেই সরল সুখময় জীবনের এক ছবি আঁকে, সেই সুখস্বপ্ন দেখে সে আত্মহারা। তার চিত্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সেখানকার প্রত্যেকটি জিনিষ যেন তার চোখে তখন সুখ, শান্তি, আনন্দের রঙে রাঙা হয়ে গেছে। সে উঠে গিয়ে মাল্লাকে জিজ্ঞাসা করল—চৌধুরীজী, এখানে বিক্রির জন্যে কোন নৌকা আছে?

মাল্লা বসে হুঁকো টানছিল। সদনকে দেখে দাঁড়াল আর কয়েকটা নৌকা দেখাল। সদনের একটা নতুন নৌকা পছন্দ হল। দর কষাকষি হতে লাগল। আরো মাল্লা জড়ো হল। শেষে ৩০০ টাকায় রফা হল। এও ঠিক হল যে নৌকাটা যার সেই ওটা চালাবার জন্যে চাকরি করবে।

সদন খুশীমনে ফিরে চলল, জীবনে তার আর অন্য কিছুই চাই না, যেন সে একটা বড় যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরছে। সারারাত ঘুম হল না। সে মনশ্চক্ষে দেখতে লাগল তার নৌকা পাল তুলে দিগন্তরে যায় মিলিয়ে যাচ্ছে, কিম্বা যেন তার চোখের সামনে জলের উপর নাচছে। তার কল্পনায় নদীতটে গড়ে উঠল সুবুজ লতাপাতায় ঘেরা এক কুটির আর মনোহারিনী মূর্ত্তিতে সেখানে বসল শান্তা। কুটির যেন আলোয় ঝলমল। তার আনন্দ-কল্পনা ধীরে ধীরে নদীর ধারে এক সুন্দর বাড়ী তৈরী করল। সেখানে সুন্দর বাগান হল আর সদন বাগানে শান্তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচেছ। একপাশে নদীর কলকল ধ্বনি, অন্যপাশে পাখীদের কলরব। যাকে আমরা ভালবাসী তাকে একই অবস্থায় দেখি। তাকে যে অবস্থায় স্মরণ করি, সেই সময়ের কাপড় চোপড় আমাদের মনে আঁকা হয়ে যায়। সদন শান্তাকে দেখেছিল সে সাধারণ শাড়ী পরে মাথা নিচু করে গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে আছে। সে ছবি তার চোখ থেকে মিলিয়ে যায় নি।

সদনের মনে হচ্ছিল তার কাজে প্রচুর লাভ হবে। ক্ষতির সম্ভাবনা তার চিন্তায় আসে নি। সব চেয়ে বিচিত্র ব্যাপার এই যে এখন পর্যন্ত তার মনেই আসেনি যে টাকা কোথায় পাবে।

সকাল হতেই তার চিন্তা হল কি করে টাকার জোগাড় করি। কার কাছে চাইব, কেই বা দেবে? চাইলেও কি বলে চাইব? কাকাকে বলি? না, আজকাল ওঁর পয়সার টানাটানি। কয়েকমাস থেকে কাছারি যাচ্ছেন না। আর বাবার কাছে চাওয়া তো পাথর থেকে তেল বের করার মত ব্যাপার। যদি এখন না যাই তো চৌধুরী কি মনে করবে? ছাতে পায়চারি করতে থাকে। একটু আগে কল্পনায় গড়া বিশাল বাড়ীটা ধ্বসে পড়ে। যৌবনের আশা যেন খড়ের আগুন, জলতে বা নিভতে দেরি হয় না।

হঠাৎ একটা উপায় মনে হতে সে এমনভাবে হেসে উঠল যেন শত্রুকে মাটিতে ফেলে দিয়ে গলা ফাটিয়ে হাসছে। বাঃ; আমি কেমন বোকা। আমার সিন্দুকে মোহন মালা রাখা আছে। দাম ৩০০ টাকার বেশীই হবে। ওটাই বেচে দিই না কেন? যখন কেউ চাইবে তখন দেখা যাবে। চাইবেই বা কে, আর চাইলে পরিষ্কার বলে দেব যে বেচে খেয়ে ফেলেছি। যা ইচ্ছে হয় করবে, আর সে সময়ে হাতে টাকা জমে তো বের করে ছুঁড়ে দেব। সিন্দুক খুলে মালা বের করে তার চিন্তা হল কি করে মালাটা বেচা যায়। বাজারে গিয়ে গয়না বেচা নিজের মান সম্মান বেচার মতই অপমান। এই সব চিন্তার সময় জীতন কাহার ঘর ঝাঁট দিতে এল। সদনকে বলল—ভাইয়া, আজ অমন মন মরা দেখাচ্ছে, চোখ লাল, রাতে ঘুম হয় নি?

সদন বলল—ঘুম এল না। মাথায় এক চিন্তা ঘুরছে।

জীতন—এমন কি চিন্তা? বল তো শুনি।

সদন—তোমায় বলি আর সারা বাড়ীতে ঢাক পিটিয়ে বেড়াও আর কি।

জীতন—ভাইয়া, তোমাদের ঘরে চাকরি করে জীবন কাটালাম। পেটে কথা না থাকলে একদিনও টিকতাম না। এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।

এক দরিদ্র অথচ ভদ্র পুরুষ যেমন মুখ ফুটে 'নেই' কথাটা বলতে সঙ্কোচ ও লজ্জা বোধ করে সেই ভাবেই সদন বলল—আমার একটা মোহন মালা আছে, এটা কোথাও বেচে দিতে পারবে? আমার টাকার দরকার।

জীতন—এ আর এমন কি বড় কাজ, এর জন্যে চিন্তা কিসের? কিন্তু টাকা নিয়ে কি করবে? মালকিনের কাছে চাইছ কেন। উনি কখনো 'না নেই' বলবেন না। কিন্তু হ্যাঁ, মালিককে বললে মিলবে না। এ ঘরে মালিক কিছু নয়, মালকিনই আসল।

সদন—আমি ঘরের কারো কাছ থেকে নিতে চাই না।

জীতন মালাটা হাতে নিয়ে ওজন যাচাই করল আর সন্ধ্যের আগেই বেচে দিয়ে আসবে বলে চলে গেল। কিন্তু বাজারে না গিয়ে সে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে খাটের তলায় মাটি খুঁড়তে লাগল। একটু পরে একটা মাটির হাঁড়ি বেরিয়ে এল। এতেই আছে তার সারা জন্মের রোজগার; আর সারা

জীবনের কার্পণ্য, কপটতা, বেঈমানি, দালালি, গোলমাল সব কিছু এই হাঁড়ির মধ্যে টাকা হয়ে সঞ্চিত রয়েছে। তাই বোধ হয় টাকাগুলোর গায়ে কালো দাগ ধরেছে। কিন্তু সারা জন্মের পাপের ফল কতো কম। পাপ কতো সস্তা!

জীতন টাকা গুণে কুড়ি টাকার থাক করল। মোট ১৭ থাক হলো। তখন সে দাড়িপাল্লায় মালা রেখে টাকা দিয়ে ওজন করল। ওজন ২৫ টাকার চেয়ে কিছু বেশী হল। সোনার দর তখন বেশ চড়া, ২৫ টাকা ভরি হবে। এবার ২৫ টাকার থাক লাগাল, ১৩ থাক হয়ে ১৫ টাকা রয়ে গেল। তার সব টাকা মালার দামের চেয়ে ২৮৫ টাকা কম হচ্ছে। মনে ভাবল এ জিনিষ হাতছাড়া করা যায় না। বলে দেব মালার ওজন ১৩ ভরি ছিল। তাতে আরো ১৫ টাকা বেঁচে যাবে। চলো মালারানী এবার এই খোপে নিশ্চিন্তে বসে থাকো।

হাঁড়ী আবার মাটির নিচে চলে গেল। পাপের আকার আরো সূক্ষ্ম হয়ে গেল।

জীতনের আনন্দ ধরে না। অনায়াসে ২৮৫ টাকা লাভ হল। এমন সুযোগ তার কখনো জোটেনি। মনে হল আজ নিশ্চয় কোন ভাল লোকের মুখ দেখে উঠেছি। নষ্ট হওয়া চোখের মতই নষ্ট হওয়া বিবেকে আলো যেতে পারে না।

দশটার সময় জীতন ৩২৫ টাকা এনে সদনের হাতে দিল। সদন যেন পড়ে পাওয়া ধন পেল।

টাকা দিয়ে জীতন নিঃস্বার্থ ভাব দেখিয়ে মুখ ফেরাল। সদন তার দিকে পাঁচ টাকা বাড়িয়ে ধরে বলল—নাও, পান তামাক খেয়ো।

তখন জীতনের মুখের ভাব যেন কোন বৈষ্ণব মদ দেখে ফেলেছে। বলল—ভাইয়া, তোমাদের খেয়ে পরেই তো বেঁচে আছি। এ সব আবার কেন? এ কি সইবে?

সদন—না, না, আমি খুশী হয়েই দিচ্ছি, এতে দোষ নেই।

জীতন—না ভাইয়া, তা হবে না। এমন করলে তো কবেই দু চার পয়সা জমিয়ে ফেলতে পারতাম। ভগবান তোমার ভালো করুন।

সদনের বিশ্বাস হল এ একেবারে খাঁটি লোক; এর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা উচিত।

সন্ধ্যার সময় সদনের নৌকা গঙ্গার বুকে ভাসছিল যেন আকাশে মেঘ চলেছে। কিন্তু তার চেহারায় আনন্দের বদলে ভবিষ্যতের আশঙ্কা ফুটে উঠেছে। ছাত্র যেন পরীক্ষায় পাশ করে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তার মনে হচ্ছে যে বাঁধ তাকে সংসাররূপী নদীর বন্যার হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল সেটা যেন ভেঙে গেছে আর সে অগাধ সাগরে দাঁড়িয়ে আছে। সে ভাবছিল নদীতে নৌকা তো ভাসালাম কিন্তু পরে সেটা ভিড়বে তো? এখন বুঝতে পারছে জল কত গভীর, হাওয়ার কত জোর আর জীবন-যাত্রা যেমন ভেবেছিল তেমন সরল নয়। তরঙ্গ

যদিও মিষ্টি সুরে গান শোনায় কিন্তু তার ভয়ঙ্কর গর্জনও কানে আসে। হাওয়া তরঙ্গের গায়ে হাত বোলায় আবার কখনো কখনো তাকে উথালপাথাল করে তোলে।

৪৭

সদনের লেখার জন্যে প্রভাকর রাওয়ের ক্রোধ অনেকটা প্রশমিত হয়েছিল। আর সদনের আগ্রহে পদ্মসিংহ তাঁকে সুমনের সব বৃত্তান্ত লিখে জানালে তিনি সাবধান হলেন।

মিউনিসিপ্যালিটিতে প্রস্তাবটা পাশ হবার পর প্রায় তিন মাস কেটে গেছে। কিন্তু সংশোধনী নিয়ে তেগ অলী যে ভয় দেখিয়েছিলেন তা অমূলক প্রমাণ হয়ে গেল। দালমণ্ডীর কোঠায় দোকান হল না, বেশ্যাদেরও নিকে শাদির উপর বিশেষ টান দেখা গেল না। অবশ্য কয়েকটা কোঠা খালি হল। সেখানকার বেশ্যারা ভাবী নির্বাসনের ভয়ে অন্যত্র থাকবার ব্যবস্থা করে নিল। কোনও আইন জারি করতে যতটা সংগঠিত হওয়া দরকার তার বিরোধিতা করতে আরো বেশী সংগঠন থাকা দরকার। প্রভাকর রাওয়ের ক্রোধ প্রশমিত হবার এটাও একটা কারণ।

বেশ্যাদের প্রতি ঘৃণাবশেই পদ্মসিংহ প্রস্তাবটায় হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে নানা ভাবে বিচার করে দেখার ফলে তাঁর ঘৃণা অনেকটা দয়া ও ক্ষমায় রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। আর সেই জন্যেই তিনি সংশোধনী সমর্থন করেছিলেন। তাঁর মনে হত বেচারা মেয়েরা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে নিজেদের সর্বনাশ করছে। প্রেম বিলাসের লালসা এদের অন্ধ করে রেখেছে। এ অবস্থায় তাদের প্রয়োজন দয়া আর সহানুভূতি। এই অত্যাচারের ফলে তাদের শোধনার শক্তি কমে গেলে যাদের আমরা প্রেম, শিক্ষা, জ্ঞান, উপদেশ দিয়ে উদ্ধার করতে পারি। তারা আমাদের হাতের বাইরে চলে যাবে। আমরা নিজেরাই তো মায়া মোহের অন্ধকারে ডুবে আছি, ওদের শাস্তি দেবার কোনও অধিকার আমাদের নেই। এদের কাজেই কি এরা কম দণ্ডভোগ করছে যে আমরা আবার অত্যাচার করে তাদের জীবনে আরো দুঃখ ডেকে আনবো?

আমাদের চিন্তা হচ্ছে কর্মের পথপ্রদর্শক। ঘৃণা, সংকোচ ত্যাগ করে পদ্মসিংহ কাজে নেমে পড়লেন। সুমনের সামনে থেকে যে পদ্মসিংহ পালিয়ে এসেছিলেন এখন তাঁকেই দিনদুপুরে দালমণ্ডীর কোঠায় দেখা গেল। এখন তাঁর লোক-নিন্দার ভয় নেই। লোকে তাঁর সম্বন্ধে কি ভাববে সে চিন্তা নেই- মনে প্রকৃত সেবার ভাব জেগেছে। কাঁচা ফল ঢিল মারলে পড়ে যায় না কিন্তু পাকলে নিজেই মাটির টানে নেমে আসে। পদ্মসিংহের অন্তরে সেবার ভাব পাকা হয়ে গেছে।

এ বিষয়ে বিঠলদাস তাঁর পথ থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। আজন্ম বেশ্যা যে শোধরাবে এ বিশ্বাস তাঁর ছিল না। এই মত পোষণ করতেন বলে সৈয়দ শফকত অলীও সরে দাঁড়ালেন। কুমার সাহেবের তো সাহিত্য, সঙ্গীত ও সৎসঙ্গে থেকে অবকাশ ছিল না, শুধু সাধু গজাধর পদ্মসিংহের সঙ্গে এ কাজে লেগে রইলেন।

৪৮

একমাস কেটে গেছে। সদন তার নতুন পেশার কথা কাউকে জানায়নি। রোজ সকালে উঠে গঙ্গাস্নানের ছুতো করে চলে যেত। সেখান থেকে ফিরে আসত দশটায়। খেয়ে আবার যেত আর ফিরত রাত করে। ঘাটে তার নৌকাই সব চেয়ে সাজানো, দেখবার মতো। ভিতরে জাজিস পাতা; দু তিনটে মোড়া রয়েছে; তাই শহরের রসিক ফুর্তিবাজ লোকেরা তার নৌকোতেই চড়ত। ভাড়ার ব্যাপারে নিজে কথা বলত না। এ কাজটা তার চাকর ঝিংগুরে মাল্লা করত। সে নিজে কখনো গঙ্গার ধারে বসে, কখনো নৌকায়, নিজেকে অনেক করে বুঝিয়েছে, কাজ করায় লজ্জা কি? আমি তো কোন খারাপ কাজ করছি না, কারো চাকর নই, কেউ চোখ রাঙাতে পারে না। কিন্তু কোন ভদ্রলোক তার নৌকার দিকে আসতে দেখলেই সে পিছিয়ে পড়ত আর লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিত।

সে হচ্ছে জমিদারের ছেলে, উকিলের ভাইপো। উঁচু বংশের ছেলে হয়ে মাল্লার কাজ করতে স্বভাবতই লজ্জা পেত, হাজার যুক্তিতেও তা দূর হত না। এই সংকোচের ফলে তার বেশ ক্ষতি হত। যে কাজে সে অনায়াসে একটাকা পেতে পারত, সেখানে তাকে অর্ধেকেই রাজী হতে হত। জাঁকজমক ভরা দোকানে নিরেট মাল থাকলেও তার কদর বেশী। এখানে তো মালও সরেস, অভাব শুধু এক চতুর সুদর্শন দোকানদারের। সদন এটা বুঝলেও সংকোচবশে কিছু বলতে পারত না? তা সত্ত্বেও রোজ দেড় দু টাকা পেত। গঙ্গাতীরে তার ঝুপড়ি তৈরী হবার দিন এগিয়ে আসে। ক্রমেই সে নিজের পায়ে দাঁড়াবার যোগ্যতা লাভ করছে। এই সব ভেবে তার বড় আনন্দ হত। রাতের পর রাত সে এই কল্পনা নিয়েই জেগে কাটায়।

এই সময়ে মিউনিসিপ্যালিটি বেশ্যাদের জন্যে শহরের বাইরে একটা বাড়ী তৈরী করাবে স্থির করল। লালা ভগতরাম এ কাজের ঠেকা পেলেন। নদীর

ওপারে ইঁটভাটা আর চুণভাটি করবার জন্যে জমি পাওয়া গেল না। তাই তিনি ওপারে জমি নিয়ে সেখানে ঐ সব জিনিষ তৈরী করতে লাগলেন। ওপার থেকে ইঁট, চুন ইত্যাদি আনবার জন্যে তাঁর একটা নৌকার দরকার হল। নৌকা ঠিক করতে মাল্লাদের কাছে এলেন। সদনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সদন নিজের নৌকা দেখালে ভগতরাম সেটা পছন্দ করলেন। ঝিংগুরের সংগে মজুরি ঠিক হল, দিনে দু খেপ মাল আনার কথা হল। ভগতরাম বায়না দিয়ে চলে গেলেন।

টাকার লোভ খারাপ। সদন এখন আর সে উড়নচণ্ডী নয়। তার মাথায় এখন চিন্তার বোঝা, কর্ত্তব্যের দায়। এসব থেকে সে মুক্তি চায়, তার নজর এখন প্রতিটি পয়সার উপর। এখন তার টাকা রোজগার আর ঘর তৈরী করবার নেশা লেগেছে। সেদিন রাত থাকতেই উঠে নদীর ধারে গেল আর ঝিংগুরকে জাগিয়ে নৌকা খুলে দিল। সকাল হতে না হতেই ওপারে পেঁৗছে গেল। ফেরবার সময় সে নিজেও হাসিমুখে দু চার বার দাঁড় টানল। এতেই নৌকার গতি বাড়তে দেখে সে জোরে জোরে দাঁড় টানতে লাগল। নৌকার গতি দ্বিগুণ হয়ে গেল। ঝিংগুর প্রথমে হাসলেও পরে অবাক হয়ে গেল।

আজ থেকেই সদনের কর্তৃত্ব সে বেশী করে মানতে লাগল। বুঝে গেল বাবু শুধু মাটির ঢেলা নন। দরকার হলে নিজেই নৌকা চালিয়ে নিয়ে যাবেন। আমার জারিজুরি আর বেশী খাটবে না।

সেদিন দু ক্ষেপ হল, পরের দিন হল এক, কারণ সদনের আসতে দেরি হয়েছিল। তৃতীয় দিন রাত নটায় সে তৃতীয় খেপ পুরো করল কিন্তু তখন তার সর্বাংগে ঘাম ঝরছিল। এমন ক্লান্ত যে ঘরে ফেরাই কষ্টকর। এইভাবে দু' মাস কাজ করার ফলে তার বেশ লাভ হল। আরো দু জন মাল্লা রাখল।

সদন এখন মাল্লাদের নেতা হয়েছে। তার ঝুপড়ি তৈরী হয়েছে। ভিতরে একটা তাক, দুটো খাট, দুটো ল্যাম্প, কিছু বাসনপত্র ছিল। একটা বসবার কামরা, একটা রাঁধবার, একটা শোবার। দরজার সামনে ইঁটের তৈরী চবুতরা। তার আশে পাশে গামলা রাখা। দুটো গামলা থেকে লতাগুলো ঘরের উপরে উঠছে। এই চাতাল এখন মাল্লাদের আড্ডার জায়গা হয়েছে। তারা প্রায়ই এখানে বসে তামাক খায়। সদন তাদের বড় উপকার করেছে। অফিসারদের কাছে লেখা-লেখি করে তাদের আট দিন বেগার খাটা থেকে মুক্ত করেছে। এর ফলে তার কদর বেড়েছে। কিছু টাকাও জমেছে। মাল্লাদের বিনা সুদে ধারও দেয়। তার এখন সাইকেলের দিকে নজর, শৌখিন লোকদের জন্যে একটা সুন্দর বজরা কেনার ইচ্ছে আছে, আর হারমোনিয়ামের জন্যে চিঠিও লেখা হয়েছে।' এ সবই হচ্ছে সেই দেবীর আগমনের প্রস্তুতি, যে দেবী ক্ষণিকের জন্যেও তার মন থেকে সড়ে না।

একদিন রাতে সদন নিজের কুঁড়ে ঘরে বসে, নদীর দিকে তাকিয়ে আছে। নৌকার ফিরে আসতে আজ দেরি হচ্ছে। সামনে আলো জ্বলছে। সদনের হাতে খবরের কাগজ কিন্তু পড়ায় মন নেই। নৌকা না ফেরায় অনিষ্টের আশঙ্কা মনে জাগছে। কাগজ রেখে সে নদীর ধারে এল। বালির চর চাঁদনীর রুপোলী চাদরে ঢাকা। জলের ঢেউয়ে চাঁদের আলো দেখে মনে হচ্ছে কোন ঝরণা থেকে নির্মল জলের ধারা ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়ে বেরিয়ে আসছে। ঝুপড়ির সামনে কয়েকজন মাল্লা বসে গল্প করছে। এমন সময় সদন দেখল দুজন স্ত্রীলোক শহরের আসছে। তাদের একজন মাল্লাদের জিজ্ঞাসা করল—আমরা ওপারে যাব। নৌকায় নিয়ে যাবে ?

সদন গলার আওয়াজে চিনল। সুমন বাঈ-এর গলা। বুকে কাঁপন, চোখে নেশা লাগল। ছুটে চবুতরার কাছে এসে বলল—দিদি, তুমি এদিকে কোথায় যাচ্ছ ?

সুমন ভালো করে সদনকে দেখল যেন তাকে চেনেই না। অন্য মেয়েটি ঘোমটা টেনে আলোর কাছ থেকে কয়েক পা পেছিয়ে অন্ধকারে সরে দাঁড়াল। সুমন অবাক হয়ে বলল—কে ? সদন ?

মাল্লাদের তাদের ঘিরে দাঁড়াতে দেখে সদন বলল—তোমরা এখন এখান থেকে যাও। এরা আমাদের ঘরের মেয়ে, আজ এখানেই থাকবে। তারপর সুমনকে প্রশ্ন করল—দিদি, সব খবর বলুন, কি ব্যাপার ?

সুমন—খবর ভালোই। ভাগ্যে যা লেখা তাই ভোগ করছি। আজকের কাগজ তুমি হয়তো এখনও দেখনি। প্রভাকর রাও না জানি কি ছেপেছে যে আশ্রমে হৈ চৈ পড়ে গেল। আমরা দু বোন সেখানে আর একদিনও থাকলে আশ্রম একেবারে খালি হয়ে যেত। ওখান থেকে বেরিয়ে আসাই ভালো হয়েছে। এখন দয়া করে ওপারে যাবার জন্যে একটা নৌকা ঠিক করে দাও। ওখান থেকে মোগলসরাই চলে যাব। অমৌলা যাবার কোন গাড়ী পেয়েই যাব। এখান থেকে রাতে কোন গাড়ী ছাড়ে না ?

সদন—এখন তো তুমি নিজের ঘরেই এসেছ, আর অমৌলা যাবে কেন ? তোমাদের অনেক কষ্ট হয়েছে বটে কিন্তু তোমরা আসাতে আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে তা বলতে পারি না। ক'দিন থেকেই ভাবছিলাম তোমার সঙ্গে দেখা করব কিন্তু কাজের চাপে ছুটি পাচ্ছিলাম না। তিন চার মাস হল মাল্লার কাজ করতে লেগেছি। এ ঘর তোমাদের, ভিতরে চলো।

সুমন ঝুপড়ির ভিতরে গেল। শান্তা সেই অন্ধকারে মুখ নিচু করে নিঃশব্দে কাঁদছিল। সদন সিংহের মুখের কথা শোনার পর থেকেই কেঁদে তার দিন কাটে। নিজের অভিমানের কথা মনে হলে অনুতাপে তার বুক ফেটে যায়। সে ভাবে, আমি যদি তখন তাঁর পায়ে পড়তাম তো তিনি নিশ্চয় আমায় দয়া

করতেন। সদনের মূর্তি তার চোখে ভাসে, তার কথা যেন কানে বাজে। কথাগুলো কড়া হলেও শান্তার কাছে প্রেম ও করুণায় ভরা মনে হত। নিজের মনকে বুঝিয়েছিল এসব আমার কপালদোষে হয়েছে, সদনের কোন দোষ নেই। সে তো তখন সত্যিই নিরুপায়। নিজের বাপ মার কথা মানা তো তার ধর্ম। তাকে ধর্মপথ থেকে টেনে আনা তো আমারই দোষ। হায়! আমি আমার স্বামীর ওপর অভিমান করেছি! আমার আরাধ্য দেবতার অনাদর করেছি। নিজের স্বার্থে তাঁকে অপমান করেছি। দিনদিন আত্মগ্লানি এইভাবে বাড়ছিল। শোক, চিন্তা, বিরহ যন্ত্রনায় শান্তা জৈষ্ঠ্য মাসের নদীর মতো শুকিয়ে গিয়েছিল।

সুমন ঘরে চলে গেলে সদন ধীরে ধীরে শান্তার কাছে কাঁপা গলায় ডাকল—শান্তা! এই বলতে বলতেই তার গলা বুজে এল।

শান্তা প্রেমে গদগদ হয়ে গেল। সে প্রেমে পার্থিব আকর্ষণ নেই, স্বার্থ নেই। মনে মনে বলল, জীবনের ভরসা কি? বাঁচে কি না জানি না, আর কখনো এঁর দেখা পাই কি না পাই, একবার এঁর পায়ে মাথা রেখে কাঁদবার ইচ্ছে বাকী থাকে কেন? এর চেয়ে ভাল অবসর কি মিলবে? স্বামী! তুমি আমায় নিজের হাতে তুলে ধরে যদি চোখের জল মুছিয়ে দাও, আমার মন শান্ত হবে। আমার জন্ম সফল হবে। যতদিন বাঁচবো এ সৌভাগ্যের কথা মনে করে আনন্দ পাবো। তোমার দেখা পাবার আশা তো ছেড়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু ঈশ্বর যখন সুদিন দিলেন তখন মনোবাসনা পূর্ণ না করি কেন? জীবন রূপী মরুভূমিতে বৃক্ষ যখন পেয়েছি, তখন এর ছায়ায় বসে দগ্ধ হৃদয় শীতল করি না কেন?

এই ভেবে কাঁদতে কাঁদতে শান্তা সদনের পায়ের উপর পড়ল, শুকনো ফুলের পাপড়ি যেন হাওয়ার বেগে ঝরে পড়ল। সদন ঝুঁকে তাকে তুলে বুকে নিতে গেল কিন্তু শান্তার অবস্থা দেখে তার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠল। গঙ্গাতীরে প্রথম দর্শনের সময় সে ছিল সৌন্দর্যের এক কোমল কলি, আর আজ যেন বসন্তের শুকনো ঝরা পাতা!

সদনের হৃদয় নদীর বুকে চাঁদের কিরণের মতই কাঁপতে লাগল। কাঁপা হাতে সে তার সংজ্ঞাহীন শরীর তুলে ধরল। হতাশ হয়ে ঈশ্বরের শরণ নিল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, প্রভু, আমি পাপ করেছি, একটা দুঃখী হৃদয়কে নির্দয় হয়ে কষ্ট দিয়েছি, কিন্তু তার জন্যে এ শাস্তি অসহ্য। আমার কাছ থেকে রত্ন কেড়ে নিয়ো না। তুমি তো দয়াময়, আমাকে দয়া করো।

শান্তাকে বুকে তুলে সদন ঝুপড়িতে নিয়ে খাটে শুইয়ে ব্যাকুল হয়ে বলল—সুমন, দ্যাখো এ কেমন হয়ে যাচ্ছে। আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি।

সুমন কাছে এসে বোনকে দেখল। কপালে ঘামের ফোটা, চোখ স্থির, নাড়ী পাওয়া যাচ্ছে না! মুখ বর্ণহীন। সে তাড়াতাড়ি পাখা দিয়ে বাতাস

করতে লাগল। শান্তার দুঃখ দুর্দশা দেখে তার মনে কয়েকমাস ধরে যে রাগ জমেছিল তা এখন ফেটে পড়ল। তিরস্কারের ভঙ্গীতে সদনকে বলল—এ তোমার অত্যাচারের ফল, এ তোমারই কীর্তি। তোমারই নিষ্ঠুর হাতে এই ফুল পিষে ফেলেছে, নিজের পায়ে এ লতা মাড়িয়েছ। নাও, এবার তুমি দায়মুক্ত হবে। সদন, যবে থেকে বেচারী তোমার কথা শুনেছে। তখন থেকেই তার মুখে হাসি নেই, চোখের জলের বিরাম নেই। অনেক বলা কওয়ার পর দু চার গ্রাস মুখে তুলত। আর তুমি তার উপর এই অত্যাচার করেছ শুধু সে আমার বোন বলে যার পায়ে তুমি বছরের পর বছর নাক ঘসেছ। যার পায়ের তলায় হাত বুলিয়েছ, যার কুটিল প্রেমে তুমি মাসের পর মাস মাতাল হয়ে থাকতে। এখনও তো তুমি মা বাপের আদেশ মেনে চলতে না কি? তখনও তুমি উঁচু কুলের ব্রাহ্মণ ছিলে, না কি আর কেউ ছিল? তোমার দুষ্কর্মে তখন তোমার কুলে কালি পড়ত না। আজ স্বর্গের দেবতা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্ধকারে পাতের এঁটো খেতে রাজী, কিন্তু আলোয় নিমন্ত্রণ নেব না। এ সব শুধু জয়াচুরি, দাগাবাজি। তুমি বেচারীর সঙ্গে যা করেছ তার ফল ভগবান তোমায় দেবেন। এর যা ভোগ ছিল তা ভুগেছে। আজ না হোক কাল মরবে; কিন্তু ওর কথা মনে করে তোমায় কাঁদতে হবে। অন্য কোন মেয়ে হতো তো তোমার কথা শোনার পর তোমার দিকে চোখ তুলেও চাইত না, তোমার অভিশাপ দিত; কিন্তু এ বেচারী তোমার জন্যে কেঁদে মরতো। একটু ঠাণ্ডা জল আনো।

অপরাধীর মতন মাথা নিচু করে সদন কথাগুলো শুনছিল। এতে মন একটু হালকা হল। সুমন তাকে গালাগাল দিলে আরো হালকা বোধ হত। সে নিজেকে এই তিরস্কার পাবার যোগ্য বলেই মনে করত।

ঠাণ্ডা জলের বাটি সুমনকে দিয়ে সে নিজে হাওয়া দিতে লাগল। সুমন শান্তার মুখে জলের ছিটে দিতে লাগল, তাতেও শান্তা চোখ মেলল না দেখে সদন বলল—এবার ডাক্তার ডেকে আনি?

সুমন—না, ব্যস্ত হয়ো না। ঠাণ্ডা লাগলেই জ্ঞান ফিরবে। ডাক্তারের কাছে এর ওষুধ নেই।

একটু আশ্বস্ত হয়ে সদন বলল—সুমন, তুমি ভাববে আমি মিথ্যে বলছি, কিন্তু তোমায় সত্যি করে বলছি সেই অলক্ষুণে সময় থেকে আমি একদিনও শান্তি পায়নি। নিজের মূর্খতায় বারবার আফসোস করেছি। কয়েকবার ইচ্ছে হয়েছে নিজে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আসি, কিন্তু কোন মুখে যাই? বাড়ী থেকে কোন সাহায্য পাবো না আর তুমি তো জানো আমি অকর্মার ধাড়ি? এখন শুধু এই চিন্তা কি করে দু পয়সা রোজগার করি আর নিজের ঝুপড়ি তৈরী করি। মাসের পর মাস চাকরির খোঁজে ঘুরেছি, কোথাও যোগাড় করতে পারিনি। শেষে

গঙ্গামায়ের শরণ নিয়েছি আর এখন ঈশ্বরের দয়ায় আমার নৌকা ঠিক মতো চলছে। এখন আমি কারো সাহায্য কি দয়া চাই না। এই ঝুপড়ি তৈরী করিয়েছি। ইচ্ছে আছে আর কিছু টাকা জমলে ওপারে কোনও গাঁয়ে একটা ঘর তৈরী করাব। দ্যাখো, ওর শরীর কিছুটা সামলেছে মনে হচ্ছে।

সুমনের রাগ কিছুটা কমেছে। বলল—হ্যাঁ, আর কোন ভয় নেই, শুধু মুর্চ্ছা গিয়েছিল। চোখ বন্ধ হল, ঠোঁটের নীলচে ভাব কাটতে লাগল।

সদনের এমন আনন্দ হল যে সেখানে ঠাকুরের কোন মূর্তি থাকলে তাঁর পায়ে মাথা রাখত। বলল—তুমি আমার যে উপকার করলে তা সারাজীবন মনে থাকবে। যদি অন্য কিছু ঘটে যেত তো এই লাশের সঙ্গে আমার লাশও বের হত।

সুমন—ছিঃ! এমন কথা কি বলতে আছে? ঈশ্বরের ইচ্ছে ও বিনা ওষুধেই সেরে উঠবে আর তোমরা চিরদিন সুখে জীবন কাটাবে। তুমিই ওর ওষুধ আর তোমার ভালবাসাই ওর প্রাণ। তোমাকে পেয়ে ও আর কিছু চায় না। কিন্তু তুমি ভুলেও যদি ওকে অনাদর কি অপমান করো তাহলে আবার ওর এই দশা হবে আর তুমি ওকে চিরদিনের মতো হারাবে।

এই সময় শান্তা পাশ ফিরে জল চাইল। সুমন তার মুখে জলের গেলাস ধরলে সে দু'তিন ঢোক জল খেয়ে আবার শুয়ে পড়ল। চারপাশে অবাক হয়ে দেখতে লাগল যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না। হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে বসে সুমনের দিকে চেয়ে বলল—কি? এটা আমার ঘর না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইটেই তো। আর কোথায় আমার স্বামী, আমার জীবন সর্বস্ব? তাকে ডাকো, একবার চোখে দেখি, অনেক জ্বালিয়েছে, এবার জ্বালা নিভিয়ে দিক। আমি ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করব। ও আসছে না কেন? বেশ, আমিই যাচ্ছি। আজ দুজনে ঝগড়া হবে। না, আমি ঝগড়া করব না, শুধু বলব আমাকে ছেড়ে যেয়ো না। গলার হার করে রাখো কিম্বা পায়ের বেড়ি করে রাখো, কিন্তু সঙ্গেই রেখো। বিয়োগ-ব্যথা আর সইতে পারি না। জানি তুমি আমায় ভালবাসো। আচ্ছা, না হয় তুমি আমায় চাও না, কিন্তু আমি তো তোমায় চাই। আচ্ছা, তাও যদি না হয় তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে তো! না, হয়নি! বেশ, নাই বা হল কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে থাকবো। তুমি যদি চোখ ফিরিয়ে নাও তো ভাল হবে না। হ্যাঁ, সত্যি ভাল হবে না, আমি সংসারে শুধু কাঁদতে আসিনি। ওগো রাগ কোরো না। দু'চার জন না হয় হাসবে, নিন্দে করবে। আমার জন্যে সেটা সহ্য কোরো। মা-বাপ ত্যাগ করবে? কি যা তা বলছ? মা-বাপ কখনো নিজের ছেলেকে ত্যাগ করে না। তুমি দেখো আমি তাঁদের মানিয়ে নেব। শ্বাশুড়ীর পা ধোয়া জল খাবো, শ্বশুরের পা টিপে দেব, তবু কি তাঁরা আমায় দয়া করবেনা না?—বলতে বলতে শান্তার চোখ আবার বন্ধ হয়ে গেল।

সুমন সদনকে বলল—এবার ঘুমিয়ে পড়েছে, ঘুমিয়েই থাক। এক ঘুম হয়ে গেলে ওর শরীর ঠিক হয়ে যাবে। অনেক রাত হয়েছে, এবার তুমি বাড়ী যাও ; শর্মাজী কতো ভাবছেন।

সদন—আজ যাবো না।

সুমন—না-না, ও'রা চিন্তা করবেন। শান্তা এখন ভাল আছে। কেমন আরামে ঘুমোচ্ছে। এতদিন বাদে আজই ওকে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে দেখছি।

সদন শুনল না, বারান্দায় গিয়ে খাটে শুয়ে ভাবতে লাগল।

৪৯

বাবু বিঠলদাস ন্যায়নিষ্ঠ সরল মানুষ ছিলেন। যেদিকে ন্যায় দেখতেন সেই পক্ষেই যোগ দিতেন। তাতে তাঁর লেশমাত্র সঙ্কোচ হত না। পদ্মসিংহকে ন্যায়ের পথ থেকে সরে যেতে দেখে তাঁর সঙ্গ ছেড়েছিলেন, কয়েকমাস তাঁর বাড়ীতে দেখা করতে যান নি ; কিন্তু প্রভাকররাও যখন আশ্রমের বিরুদ্ধে লিখতে শুরু করলেন আর সুমনবাঈ সম্বন্ধে কিছু গুপ্ত রহস্যের উল্লেখ করলেন তখন বিঠলদাস তাঁর উপরেও চটে গেলেন। সারা শহরে তাঁর এখন কোন বন্ধুই রইল না। এখন তিনি বুঝলেন যে যে সংস্থা অপরের সাহায্য ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে তার অধ্যক্ষের কোন পক্ষেই যোগ দেওয়া উচিত নয়। আশ্রমের মঙ্গলের জন্য দলাদলির মধ্যে না গিয়ে সকলের সঙ্গে মিলে মিশে থাকাই ভাল। আমার পক্ষে এই পথই ভাল। সন্ধ্যার সময় বসে বসে ভাবছিলেন প্রভাকররাওয়ের লেখার কি উত্তর দেওয়া যায়। কথাটা তো সত্যি, 'সুমন আসলে বেশ্যা ছিল আর আমি তা জেনেও তাকে আশ্রমে এনেছি'। এ বিষয়ে প্রবন্ধকারিনী সভায় কিছু জানাইনি, কোন প্রস্তাব উত্থাপন করিনি। আমি আশ্রমটাকে আমার নিজের সংস্থা মনে করে কাজ করেছি। উদ্দেশ্য যত ভালোই হোক গোপন রাখা একেবারে অনুচিত হয়েছে।

বিঠলদাস কিছুই স্থির করতে পারছিলেন না, এমন সময় আশ্রমের অধ্যক্ষা এসে বললেন—আনন্দী, রাজকুমারী আর গৌরী বাড়ী ফিরে যাবার জন্যে তৈরী হয়ে বসে আছে। কতো করে বোঝালাম, কিছুতেই শুনছে না।

বিঠলদাস ঝাঁজের সঙ্গে বললেন—চলে যেত বলে দাও। আমি এতে ভয় পাই না। ওদের জন্যে আমি সুমন আর শান্তাকে বের করে দিতে পারি না।

অধ্যক্ষা ফিরে গেলে বিঠলদাস আবার চিন্তা করতে লাগলেন। এ মেয়েরা নিজেদের কী ভাবে, সুমন কি এমন উচ্ছন্নে গেছে যে তার সঙ্গে থাকাও যায়

না? তাদের বক্তব্য আশ্রমের বদনাম হচ্ছে আর এখানে থাকলে তাদেরও বদনাম হবে। যাও, আমি তোমাদের আটকাচ্ছি না।

এই সময় ডাকপিয়ন চিঠি দিয়ে গেল। বিঠলদাসের নামে পাঁচটা চিঠি। একটায় লিখেছে, আমি আমার মেয়ে বিদ্যাবতীকে আশ্রমে রাখা উচিত মনে করি না। তাকে ফিরিয়ে আনতে যাব। দ্বিতীয় ভদ্রলোক ধমকেছেন যে যদি বেশ্যাদের আশ্রম থেকে বের করে না দেওয়া হয় তবে তিনি চাঁদা দেওয়া বন্ধ করে দেবেন। তৃতীয় চিঠির বিষয় একই। শেষ চিঠি দুটো তিনি খুললেন না। এ সব ধমকানিতে তিনি ভয় পেলেন না, বরং তাঁর জেদ বেড়ে গেল। এরা ভাবে যে এসব ফাঁকা চমকানিতে আমি ভয়ে কাঁপতে থাকব। বোঝে না যে বিঠলদাস কারো ধার ধারে না। আশ্রম উঠে যায় তো যাক শান্তা আর সুমনকে কখনই সরিয়ে দেব না। তাঁর সদ্‌বুদ্ধি অহঙ্কারের কাছে হার মানল। সদুৎসাহ এবং দুঃসাহস দুটোর স্রোত একই, পার্থক্য শুধু তাদের ব্যবহারে।

সুমন দেখল শুধু তার জন্যেই এই সব গণ্ডগোলের সৃষ্টি হচ্ছে। এখানে আসার জন্যে তার দুঃখ হল। কতো শ্রদ্ধার সঙ্গে সে বিধবাদের সেবা করেছে আর ফল এই! সে জানত বিঠলদাস কখনো তাকে সেখান থেকে যেতে দেবেন না। তাই সে ঠিক করল লুকিয়েই পালিয়ে যাবে। তিনজন মহিলা চলে গেছেন, দুতিন জন যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছেন। তাঁদের যাবার জায়গা নেই, কিন্তু তারাও সুমনকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন।

সুমন এ অপমান সইতে পারল না। শান্তার সঙ্গে পরামর্শ করল। শান্তা পড়ল সংকটে। পদ্মসিংহের আদেশ না পেলে তার আশ্রম ছেড়ে যাওয়া উচিত নয়। শুধু তাই নয় যে একটা ক্ষীণ আশাসূত্র তাকে বেঁধে রেখেছে; বরং এটাকে সে ধর্মের বন্ধন বলে মনে করত। তার ধারণা,—আমি যখন আমার সব ভার পদ্মসিংহের হাতে সঁপে দিয়েছি তখন স্বেচ্ছায় অন্য কোথাও যাবার অধিকার নেই। কিন্তু সুমন যখন বলল, তোমার ইচ্ছে হয় থাকো আমি কিন্তু কোন ক্রমেই এখানে থাকব না, তখন শান্তার এখানে একলা পড়ে থাকা অসম্ভব মনে হল। জঙ্গলে পথহারা মানুষ অন্য কাউকে দেখলে শুধু এই ভেবে তার সঙ্গ নেয় যে একজন থেকে দুজন হয়ে যাব। শান্তাও তার বোনের সঙ্গে যাবার জন্যে তৈরী হল।

সুমন জিজ্ঞাসা করল—এতে যদি পদ্মসিংহ অসন্তুষ্ট হন?

শান্তা—তাঁকে চিঠি লিখে ব্যাপারটা জানিয়ে দেব।

সুমন—আর সদন সিংহ যদি রাগ করে?

শান্তা—যে জন্য দেবেন মাথা পেতে নেব!

সুমন—বেশ করে ভেবে দ্যাখো; শেষে যেন পস্তাতে না হয়।

শান্তা—আমার এখানেই তো থাকা উচিত কিন্তু তুমি না থাকলে আমি থাকতে পারবো না। ভালো কথা, বলতো যাবে কোথায়?

সুমন—তোমাকে অমোলা পেঁছে দেব।

শান্তা—আর তুমি?

সুমন—নারায়ণ আমার ভরসা, কোন তীর্থের পথে চলে যাবো।

দুই বোন অনেকক্ষণ ধরে কথা হল। দুজনেই কাঁদল। যেই আটটা বাজল, বিঠলদাস খাবার জন্যে নিজের বাড়ী গেলেন, অমনি দুই বোন সকলের চোখ এড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল।

রাতে এ খবর কেউ জানল না। সকালে চৌকিদার এসে বিঠলদাসকে খবরটা দিল। ভয় পেয়ে তিনি সুমনের ঘরে গেলেন। সব জিনিষ পড়ে আছে শুধু দুই বোনের খোঁজ নেই। বড় চিন্তায় পড়লেন তিনি, কি করে পদ্মসিংহকে মুখ দেখাব? সুমনের উপর খুব রাগ হচ্ছিল তাঁর। এ সব ওরই কাজ, ওই শান্তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছে। এমন সময় সুমনের খাটে একটা চিঠি পড়ে আছে দেখতে পেলেন। তাড়াতাড়ি সেটা নিয়ে পড়তে লাগলেন। সুমন যাবার সময় চিঠিটা লিখে রেখে গিয়েছিল। চিঠি পড়ে বিঠলদাস একটু শান্ত হলেন। সেইসঙ্গে দুঃখ পেলেন এই ভেবে যে সুমনের জন্যেই আমাকে নিচু হতে হল। তিনি ঠিক করেছিলেন যারা তাঁকে ধমকাচ্ছিল তাদের মাথা নিচু করাবেন। কিন্তু সে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল, এখন লোকে ভাববে আমি ভয় পেয়েছি। এ কথা ভেবে তাঁর খুব দুঃখ হল।

শেষে ঘর থেকে বের হয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়ে সোজা পদ্মসিংহের বাড়ী গেলেন। পদ্মসিংহ খবরটা শুনেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন, বললেন—এখন কি হবে?

বিঠল—ওরা বোধ হয় অমোলা পেঁছে গেছে।

শর্মা—হ্যাঁ, তা সম্ভব।

বিঠল—সুমন এতটা পথ অনায়াসেই যেতে পারে।

শর্মা—হ্যাঁ, সে তো বোকা হাঁদা নয়।

বিঠল—সুমন হয়তো অমোলা যাবে না।

শর্মা—কে জানে, দুজনে ডুবে মরতেও পারে।

বিঠল—একটা তার পাঠিয়ে জেনে নিলে কেমন হয়?

শর্মা—কোন মুখে জানতো চাইব? আমি তো তাকে রক্ষা করতেই পারলাম না। এখন ওর বিষয়ে খোঁজ খবর করা আমার পক্ষে লজ্জার ব্যাপার। আপনার উপর আমার বিশ্বাস ছিল। আপনি এমন অসাবধান হবেন জানলে ওকে আমার ঘরেই রাখতাম।

বিঠল—আপনি এমন করে বলেছেন যেন আমি দেখে শুনে ওকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

শর্মা—আপনি যদি ওকে আশা ভরসা দিতেন তো ও কখনও যেত না। আপনি এমন সময়ে আমাকে জানালেন যখন আর কিছু করবার নেই।

বিঠল—সমস্ত দায়িত্ব আপনি আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছেন?

পদ্ম—না তো আর কার উপর দেব? আশ্রমের দায়িত্ব আপনার না অন্য কারুর?

বিঠল—তিন মাসের উপর শান্তা এখানে রয়েছে, আপনি ভুলেও কোনদিন আশ্রমে এসেছেন? আপনি মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে তার খোঁজ খবর করলে সে আশ্বস্ত হত। যখন আপনিই তার সঙ্গে একটা কথা পর্যন্ত বলে খোঁজ নেননি তখন সে কার ভরসায় এখানে পড়ে থাকবে? আমার দায়িত্ব আমি স্বীকার করছি কিন্তু আপনি নির্দোষ নন।

পদ্মসিংহ আজকাল বিঠলদাসের উপর চটে ছিলেন। তাঁর অনুরোধেই তিনি বেশ্যাদের উদ্ধারের কাজে হাত দিয়েছিলেন কিন্তু ঠিক কাজের সময় তিনি সরে পড়েছিলেন। আবার বেশ্যাদের উপর পদ্মসিংহের সহানুভূতি দেখে বিঠলদাস তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখছিলেন। তাঁরা এ সময় নিজেদের মনের কথা স্পষ্ট করে না বলে শুধু পরস্পরের উপর দোষারোপ করলেন। পদ্মসিংহ তাঁকে খুব কথা শোনাতে চাইছিলেন কিন্তু তাঁর প্রত্যুত্তরে নিজের মুখ বন্ধ করতে হল। বললেন—হ্যাঁ, এতে আমারাও নিশ্চয় অন্যায় হয়েছে।

বিঠল—না, আপানাকে দোষ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। সব দোষ তো আমার। আপনি যখন সব ভার আমার উপরেই দিলেন তখন আপনার নিশ্চিন্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

শর্মা—না, বাস্তবপক্ষে এটা আমার ভীরুতা ও আলস্যের ফল। আপনি তো ওকে জোর করে আটকে রাখতে পারতেন না।

পদ্মসিংহ নিজের দোষ স্বীকার করে বাজি পালটে দিলেন। আমরা নিজে নত হয়ে অপরকে নত করতে পারি, চাপ দিয়ে অপরকে নতি স্বীকার করানো কঠিন।

বিঠল—সদন সিংহ হয়তো কিছু জানতে পারে। তাকে একবার ডাকুন।

শর্মা—সে তো রাত থেকেই বেপাত্তা। সে গঙ্গার ধারে একটা ঝুপড়ি তৈরী করিয়েছে। সেখানে জনকয়েক মাল্লা রেখে একটা নৌকা চালায়। রাতে হয়তো সেখানেই রয়ে গেছে।

বিঠল—হয়তো দু বোন সেখানেই গিয়েছে। কি বলেন? যাবো?

শর্মা—না না, আপনি কোন জগতে আছেন? ও এতটা 'লিবারেল' নয়। ওদের ছায়া পর্যন্ত মাড়ায় না।

কথা শেষ হতেই সদন সেই ঘরে এল। পদ্মসিংহ প্রশ্ন করলেন—রাতে কোথায় রয়ে গেলে? সারারাত তোমার অপেক্ষা করছিলাম।

সদন মাথা নিচু করে বলল—এ জন্যে আমি লজ্জিত। এমন কাজ পড়ে গেল যে বাধ্য হয়ে থাকতে হল। আপনাদের বলে যাবার সময়টুকুও পেলাম না। লজ্জায় আপনাকে বলি নি, কয়েকমাস থেকে আমি একটা নৌকা চালাচ্ছি। নদীর ধারেই একটা ঝুপড়ি করিয়েছি। আমার ইচ্ছে কাজটাতে ভালো করে লেগে যাই। তাই আপনার কাছে ঝুপড়িতে থাকার অনুমতি চাই।

শর্মা—এ কথাটা আমি লালা ভগতরামের মুখে আগেই শুনেছি। বড়ই দুঃখের কথা যে তুমি এতদিন কথাটা আমার কাছে লুকিয়েছ, না হলে আমিও কিছু সাহায্য করতাম। যাক্ আমি একে খারাপ বলি না বরং কাজে তোমার মন দেখে খুশিই হয়েছি। কিন্তু নিজের বাড়ী থাকতে তুমি যে অন্য জায়গায় থেকে আলাদা রেঁধে খাবে এতে আমি রাজি নই। আচ্ছা, আর একটা নৌকা হলে তো বেশী লাভ হবে?

সদন—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি সেই চেষ্টায় আছি। কিন্তু এ সবের জন্যে আমার ঘাটে থাকা দরকার।

শর্মা—কথাটা আমার খুব খারাপ লাগছে। এক শহরে তুমি আলাদা হয়ে থাকবে সেটা আমি পছন্দ করি না। এতে তোমার ক্ষতি হলেও আমি শুনবো না।

সদন—না কাকা, আপনি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করুন। নিরুপায় হয়েই আপনাকে বলতে হচ্ছে।

শর্মা—এমন কি ব্যাপার যে তুমি নিরুপায় হয়েছ। সব কথা খুলে বলছ না কেন?

সদন—আমি এখানে থাকলে আপনার বদনাম হবে। আমি এখন আমার কর্ত্তব্য করবো ঠিক করেছি। এতদিন অজ্ঞান ছিলাম বলে আর কিছুটা নিন্দের ভয়ে কর্ত্তব্য পালন করতে পারিনি। আমি আপনার ছেলে। কোন কষ্ট হলে আপনার আশ্রয় নেব, কিছু দরকার পড়লে আপনাকে জানা'ব। কিন্তু আলাদা থাকব আমি, আর আমার বিশ্বাস আপনিও প্রস্তাবটা পছন্দ করবেন।

বিঠলদাস ব্যাপারটা আঁচ করে নিলেন। বললেন—কাল সুমন আর শান্তার সঙ্গে দেখা হয়েছে না?

সদন লজ্জায় লাল হয়ে—যেন নববধূর মুখের ঘোমটা সরে গেছে—চাপা গলায় বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

পদ্মসিংহ উভয় সংকটে পড়লেন। হ্যাঁ-ও বলতে পারেন না না-ও বলতে বাধে। এতকাল শান্তার ব্যাপারে নিজেকে নির্দোষ ভেবে আসছিলেন। অন্যায়ের সমস্ত দোষ দাদার ঘাড়েই চাপিয়েছিলেন আর সদনকে ভাবতেন কাঠের পুতুল। কিন্তু এখন এই জালে আটকা পড়ে নিজে উদ্ধারের চেষ্টা করতে লাগলেন। সমাজের জন্যে তাঁর ভয় ছিল না। ভয় এই যে দাদা না মনে করেন যে এ সব

আমার পরামর্শে হয়েছে আর আমিই সদনকে প্রশ্রয় দিয়েছি। তাঁর মনে এ রকম সন্দেহ হলে তিনি আমায় কখনও ক্ষমা করবেন না।

পদ্মসিংহ কয়েকমিনিট ধরে সমস্যাটা ভাবলেন। শেষে বললেন, সমস্যাটা এত কঠিন যে আমি নিজের ভরসায় কিছু করতে পারি না। দাদার মত না নিয়ে আমি 'হ্যাঁ' বা 'না' কি করে বলি? তুমি তো আমার মত জানো। আমি তোমার প্রশংসা করি, ঈশ্বর তোমায় সুবুদ্ধি দিয়েছেন দেখে আমি খুশী। কিন্তু দাদার ইচ্ছেকেই আমি শেষ কথা মনে করি। এখন দু বোনকে অন্য জায়গায় রাখার বন্দোবস্ত করে সেখানে তাদের যাতে কোন কষ্ট না হয় তা দেখা যেতে পারে। ব্যস্, এই পর্যন্ত। এর বেশী কিছু করবার সামর্থ্য আমার নেই। দাদার ইচ্ছেমতই কাজ করো।

সদন—আপনি কি জানেন না তিনি কি উত্তর দেবেন?

পদ্ম—হ্যাঁ, তা তো জানি।

সদন—তা হলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা নিরর্থক। মা বাপের আদেশে আমি তাঁদের দেওয়া প্রাণ অনায়াসে দিতে পারি; কিন্তু কোন অপরাধকে কেটে ফেলতে পারি না।

পদ্ম—দুই বোনকে অন্য জায়গায় রাখতে তোমার আপত্তি কিসের?

সদন রাগের ভাব দেখিয়ে বলল—আমি বলল—আমি যদি লুকোতে চাই তবেই ঐভাবে কাজ করবো, আমি তো কোন পাপ করতে যাচ্ছি না যে লুকিয়ে করতে হবে। জীবনে যেটা পরম কর্তব্য সেটা লুকিয়ে করবার দরকার নেই। বিয়ের যে কাজটুকু বাকী আছে কাল গঙ্গাতীরে সেটা সেরে ফেলব। যদি আপনি কৃপা করে সেখানে যান তো আমার সৌভাগ্য ভাবব; না হলে ঈশ্বরের দরবারে বিনা সাক্ষীতেও প্রতিজ্ঞা করা যায়।

এই বলে সদন উঠে বাড়ীর ভিতরে চলে গেল। সুভদ্রা বলল—বাঃ, বেশ! কোথায় গিয়েছিলে? সারা রাত ভেবে মরি। কোথায় ছিলে?

সদন কাকীকে রাতের সব ঘটনা জানাল। কাকার সঙ্গে কথা বলতে তার যে সঙ্কোচ হত, কাকীর কাছে তা হত না। সুভদ্রা তার সাহসের খুব প্রশংসা করল, বলল—মা বাপের ভয়ে কেউ কি নিজের বিয়ে করা বৌ ছাড়ে? লোক হাসবে তো হাসুক। সেই ভয়ে কি ঘরের মানুষটাকে প্রাণে মারতে হবে? তোমার মাকেই ভয়, নয়তো তাকে এখানে রাখতাম।

সদন উত্তর দিল—আমি বাপ-মায়ের ভয় করি না।

সুভদ্রা—অনেক তো করেছ। এতদিন ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বেচারাকে মেরে ফেলেছ। অন্য ছেলে হলে প্রথম দিনেই আপত্তি করত। তুমি বলেই এত সইছ।

সুভদ্রা এই কথাগুলো যদি সরল মনে বলত আমরা তার প্রশংসা করতাম। কিন্তু তার মনে এখন শুধু ঈর্ষা। সে সদনকে মাথায় তুলে নিজের বড় জায়ের

মাথা নিচু করতে চাইছে। মায়ের বুকে আঘাত করে আনন্দ অনুভব করছে।

সদন চলে গেলে বিঠলদাস পদ্মসিংহকে বললেন—আপনার মনের মতো কাজই তো হল। তবে আপনি ইতস্ততঃ করছেন কেন?

শর্মাজী কোন উত্তর দিলেন না।

বিঠলদাস আবার বললেন—এ প্রস্তাব আপনারই করা উচিত ছিল, কিন্তু এখন সেটা মেনে নিতেও এত সংকোচ হচ্ছে!

শর্মাজী এর উত্তরও দিলেন না।

বিঠলদাস—সে যদি নিজের স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা থাকে তো ক্ষতি কি? আপনি না নিজের কাছে রাখবেন, না আলাদা থাকতে দেবেন। এ কেমন ধারা নীতি?

পদ্মসিংহ ব্যঙ্গ করে বললেন—ভাই সাহেব, বিপদ যখন নিজের মাথায় পড়ে তখন লোকে জানে। যেমন করে আজ আপনি আমায় পথ দেখাচ্ছেন, আমিও সেভাবে অপরকে পথ দেখাই। আপনিই তো একদিন বেশ্যাদের উদ্ধারের জন্যে লম্বা চওড়া বুলি ঝাড়তেন, কিন্তু যখন কাজের সময় এল নিঃশব্দে কেটে পড়লেন। অপরেও তাই করে জেনে রাখুন। আমি সব কাজ করতে পারি কিন্তু নিজের দাদাকে অসন্তুষ্ট করতে পারি না। তাঁর ইচ্ছায় ত্যাগ করতে পারি না আমার এমন কোনও নীতি বা মত নেই।

বিঠল—আমি তো কোনদিন বলিনি যে বেশ্যাদের দেবী করে দেব। আপনি কি মনে করেন যে মেয়েরা ঘরের লোকের অত্যাচারে বা দুর্জনের প্রলোভনে পতিতা হয়েছে আর যারা জন্মাবধি বেশ্যা, তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই? সাধ্য ও অসাধ্য রোগের মধ্যে যেমন পার্থক্য থাকে তাদের মধ্যেও তেমনি পার্থক্য আছে বলে আমি মনে করি। যে আগুন এখনই লেগেছে, ভিতরে পৌঁছতে পারে নি তাকে আপনি শান্ত করতে পারেন, কিন্তু জ্বালামুখী পর্বতকে শান্ত করবার চেষ্টা পাগলে করতে পারে, বুদ্ধিমানে কখনও করে না।

শর্মা—আপনি আমাকে একটু সাহায্য করতে পারতেন। আপনি যদি আমার সঙ্গে এক ঘণ্টা দালমণ্ডীতে যান তো বুঝতে পারবেন যাকে আপনি জ্বালামুখী পর্বত ভাবছেন সে শুধু ভস্মস্তূপ। ভালো আর মন্দ লোক সর্বত্র আছে। বেশ্যারাও এ নিয়মের বাইরে নয়। আপনি দেখে অবাক হবেন তাদের মধ্যে ধর্মের প্রতি কতোশ্রদ্ধা, পাপের প্রতি কতো ঘৃণা আর সৎপথে থাকার কতো ইচ্ছে রয়েছে। আমি নিজেই অবাক হয়ে গেছি। ওদের শুধু একটা অবলম্বন চাই যা ধরে তারা বেরিয়ে আসবে। প্রথমে তো ওরা আমার সঙ্গে কথাই বলত না কিন্তু আমি যখন ওদের বোঝালাম, আমি এ প্রস্তাব তোমাদের ভালোর জন্যেই করেছি, যাতে দুরাচারী, দুষ্ট আর বিপথগামী লোকেরা তোমাদের কাছে আসতে না পারে তখন আমার কথায় ওদের কিছুটা বিশ্বাস হল। নাম বলব

না, কয়েকজন ধনী বেশ্যা টাকা দিয়ে আমায় সাহায্য করতে রাজী। কয়েকজন নিজের নিজের মেয়ের বিয়ে দিতে চায়। অবশ্য যারা ভোগ বিলাসের জীবন ছাড়তে চায় না তাদের সংখ্যাই এখন বেশী। আশা করি স্বামী গজানন্দের সদুপদেশের কিছু ফল নিশ্চয় হবে। দুঃখের ব্যাপার এই যে আমায় সাহায্য করবার কেউ নেই। তবে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করবার লোক অনেক। এখন এমন এক অনাথালয় দরকার যেখানে বেশ্যাদের মেয়েদের রাখা যেতে পারে আর তাদের শিক্ষার জন্যে ভালো বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু আমার কথা শুনেছে কে?

বিঠলদাস মন দিয়ে সব কথা শুনলেন। পদ্মসিংহ যা বললেন তা তিনিও জানতেন আর সেটা বিশ্বাস করতেন। বিঠলদাস বুঝলেন, আমি যে কাজ অসাধ্য ভাবতাম, আসলে সেটা তা নয়; বললেন—অনিরুদ্ধ সিংহকে এ বিষয়ে কিছু বলেছেন কি?

শর্মা—তাঁর কাছে শ্রুতি মধুর বাক্য আর তীব্র সমালোচনা ছাড়া আর কি আছে?

৫০

সদনসিংহের বিয়ের বাকী কাজ শেষ হল। ঝুপড়ি সাজানো হয়েছিল, সেইটাই মণ্ডপের কাজ দিল; লোকজনের ভিড় ছিল না।

পদ্মসিংহ সেই দিনই গ্রামে গিয়ে মদনসিংহকে সব খবর দিলেন। তিনি রেগে আগুন হয়ে বললেন—ছোকরার মাথা কেটে ফেলব, নিজেকে ভেবেছে কি? বৌদি বলল—আমি আজই যাচ্ছি ওকে বুঝিয়ে আমার সঙ্গে নিয়ে আসবো। অবুঝ ছেলে, ঐ কুটনী সুমনের ফাঁদে পড়েছে। আমার কথা কক্ষনো ফেলতে পারবে না।

কিন্তু মদন সিংহ ভামাকে ধমকে বললেন—ওখানে যাবার নাম করছে তো আমি তোমার গলা টিপে মেরে নিজেও মরব। ও আগুনে ঝাঁপ দ্যায় তো দিক। ঝিনুকে দুধ খাওয়া ছেলে তো নয়। এ সব ওর জিদ, একগুয়েমি। ছোঁড়াকে যদি ভিক্ষে না করাই তো বোলো।। ভাবছে বাবা মরলে মজা লুটবো। মুখ ধুয়ে বসে থাকবে। এটা মৌসরী জমিদারি নয়। আমার নিজের রোজগার এসব। সব দেবোত্তর করে দেব। একটা কানাকড়িও পা[illegible] না।

কথাটা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ল। লালা বৈজনাথ নিশ্চিত হলেন যে সংসার থেকে ধর্ম লোপ পেয়েছে। লোকে যখন এমন হীন কাজ করছে তখন ধর্ম

থাকবে কি করে? নবাবী যদি না থাকত তো আজ বাবুর কেচ্ছা ছড়িয়ে যেত। দেখি কোন মুখে গাঁয়ে আসে।

পদ্মসিংহ রাত্রে অনেকক্ষণ দাদার কাছে বসে রইলেন, কিন্তু যখনই সদনের প্রসঙ্গ তুলতে যান, তখন সদন সিংহ এমন আগ্নেয় দৃষ্টি দিয়ে তাঁর দিকে তাকান যে কথা বলার সাহস উপে যায়। শেষে শুতে যাবার সময় পদ্মসিংহ হতাশ হয়ে বললেন—দাদা, সদন আলাদা থাকলেও লোকে তাকে আপনার ছেলেই বলবে। তার কুকাজের জন্যে আমাদেরও বদনাম হবে। অবশ্য যারা সারা ব্যাপারটা জানে তারা আমাদের নির্দোষ বুঝবে, কিন্তু সাধারণ মানুষে তো সদনকে আমাদের থেকে আলাদা মনে করবে না। এতে আর লাভটা কি? সাপও মরবে না শুধু লাঠি ভাঙবে। একদিকে দুটো ক্ষতি, বদনামও হবে আর ছেলে হাতছাড়া হবে। অন্যদিকে একটাই ক্ষতি, বদনাম হবে কিন্তু ছেলে হাতে থাকবে। তাই আমার মনে হয় আমরা সদনকে বোঝাবার চেষ্টা করি, আর যদি না শোনে……

মদনসিংহ কথার মাঝে বলে উঠলেন—তো ঐ ডাইনীর সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে দি? কী? এই তো বলতো চাও? আমাকে দিয়ে তা হবে না, না, না, হাজার বললেও না।

এই বলে তিনি চুপ করলেন। একটু পরে পদ্মসিংহকে ভৎসনা করে বললেন—কি আশ্চর্য! এ সব কাণ্ড তোমার সামনে হল আর তুমি কিছু জানতে পারলে না। সে নৌকা কিনল, ঝুপড়ি তৈরী করল, ডাইনি দুটোর সঙ্গে ফন্দি ফিকির করল আর তুমি চোখ বুজে বসে রইলে। তাকে তো তোমার ভরসাতেই পাঠিয়েছিলাম। আমি কি জানি তুমি কানে তেল দিয়ে বসে থাক? একটু বুদ্ধি খাটিয়ে যদি কাজ করতে তো এমনটা হত না। তুমি আমায় একটু খবর পর্যন্ত দিলে না, নইলে আমি নিজে গিয়ে কোন উপায়ে সামলে নিতাম। আর যখন সব গুটি মারা পড়েছে, খেলা বন্ধ হয়েছে, তখন এসেছেন পরামর্শ নিতে। তুমি ইচ্ছে করেই চুপ করে বসেছিলে বলে তোমার ওপরেও আমার সন্দেহ হচ্ছে। তুমি জেনে শুনেই তাকে আগুনে ঝাঁপ দিতে দিয়েছে। তোমার অনেক অনিষ্ট করেছিলাম, তার শোধ নিলে যাক, কাল সকালে একটা দানপত্র লেখ। তিন পয়সার অংশের যে মৌরসী জমি আছে সেটা ছেড়ে বাকী সব সম্পত্তি দেবোত্তর করে দিচ্ছি। এখানে লিখতে না পারো ওখানে গিয়ে লিখে পাঠিয়ে দিও। আমি দস্তখত করে দেব আর ওটা রেজিস্ট্রি করা হবে।

এই বলে মদনসিংহ শুতে চলে গেলেন, কিন্তু পদ্মসিংহকে এমন সব মর্মান্তিক শুনিয়ে গেলেন যে তিনি সারারাত ছটফট করে কাটালেন। যে অপরাধ থেকে বাঁচবার জন্যে তিনি ধর্মের দিকে তাকাননি, সহকর্মীদের কাছে অপযশ পেলেন সে দোষ শেষ পর্যন্ত তাঁর ঘাড়েই পড়ল, শুধু তাই নয়, দাদাও তাঁকে নিষ্কলঙ্ক

ভাবছেন না। এখন তিনি নিজের ভুল দেখতে পেলেন, সত্যিই তো, বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করলে এ সমস্যা উঠতোই না। এত দুঃখের মধ্যেও তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা ছিল যে যাই হোক না কেন, একটা অবলার উদ্ধার হল।

সকালে যখন খাবার সময় হল, তখন ভামা কাঁদতে কাঁদতে এসে বলল—ভাই, ওঁর জেদ তো দেখতে পাচ্ছ, ছেলেটাকে মেরে ফেলার জন্যে উনি কোমর বেঁধেছেন, কিন্তু তুমি বুঝে সুঝে কাজ কোরো। কতো বড়ো-বড়ো লোকেদেরও তো ভুলচুক হয় আর ও তো একটা দুধের ছেলে, তুমি যেন তার ওপর রাগ কোরো না। সে কারুর বাঁকা কথা সইতে পারে না, দেখো, ছেলেটা যেন বিবাগী হয়ে না যায়, তাহলে আমার সর্বনাশ হবে। ওর খোঁজ খবর রেখো, খাওয়া পরার যেন কষ্ট না হয়। এখানে যখন থাকত তখন রোজ একটা মোষের দুধ খেয়ে ফেলত। ডালে ঘি খেতে চায় না কিন্তু আমি লুকিয়ে ডেলা ডেলা ঘি ডালে দিয়ে দিতাম। এমন সেবা যত্ন এখন কে করবে? না জানি কেমন ভাবে আছে, এখানে ঘরে খাওয়ার লোক নেই, ওখানে এসব জিনিষের জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আচ্ছা ভাই, ওকি নিজের হাতে নৌকা চালায়?

পদ্ম—না, দুজন মাল্লা রেখেছে।

ভামা—তা হলেও তাকে সারাদিন ঘোরাঘুরি তো করতেই হয়। দেখাশোনা না করলে মজুরেরা কাজ করতে চায় না। এখানে কোন ক্ষমতা নেই, ওকে তোমার হাতেই সঁপে দিলাম। অনাথ ভেবে ওর খোঁজ খবরটা নিয়ো। আমি প্রাণভরে তোমায় আশীর্বাদ করছি। এবার কার্তিক-স্নানের সময় নিশ্চয় ওকে দেখতে যাবো। বলে দিয়ো তোমার মা তোমার জন্যে খুব কাঁদে। শুনে একটু স্বস্তি তো পাবে। ওর মনটা বড় নরম। আমার কথা মনে করে রোজ হয়তো কাঁদে। এই টাকা ক'টা নিয়ে যাও, ওর কাছে পাঠিয়ে দিয়ো।

পদ্ম—এর দরকার কি? আমি তো ওখানেই রয়েছি। আমি থাকতে ওর কোন কষ্ট হতে দেব না।

ভামা—তাতে কি হয়েছে, তুমি নিয়ে যাও। এই হাঁড়িতে একটু ঘি আছে, এটাও পাঠিয়ে দিয়ো। বাজারের ঘিয়ে কি ঘরের ঘিয়ের মতো স্বাদ গন্ধ পাওয়া যায়? ও আমসত্ত্বের চাটনি খুব ভালবাসে; একটু আমসত্ত্বও এইসঙ্গে রাখছি। বাছাই করা মিষ্টি আমের রসে তৈরী। ওকে বুঝিয়ে বোলো—বাবা কোন চিন্তা করো না। যতদিন তোমার মা বেঁচে আছে তোমার কোন কষ্ট হতে দেব না। ওই তোমার অন্নের নাড়ি। ভালো হোক আর মন্দ হোক, আমারই তো। সমাজের কথায় যত দূরেই সরিয়ে রাখি না কেন, মন থেকে কি সরাতে পারি।

৫১

সুন্দর ভাবের সমাবেশ যেমন কবিতায় প্রাণ সঞ্চার হয়, সুন্দর রঙ এর সমন্বয়ে ছবি পায় প্রাণ, তেমনি দুই বোন এসে যেন ঝুপড়িতে জীবন সঞ্চার করল ; যেন অন্ধ আঁখি দৃষ্টি পেল।

ঝিমিয়ে পড়া শান্তা এখন ফুলের মতো ঝলমল করছে। মরা নদীতে বান ডেকেছে। গ্রীষ্মের দাবদাহের পর শ্রাবণের বর্ষায় মন যেমন স্নিগ্ধ হয় বিরহ সন্তাপিতা রমণীটির মন প্রেমে মগ্ন হয়ে তেমনি শান্ত হল।

প্রতিদিন ভোরে ঝুপড়ি থেকে দুটো তারা গঙ্গায় গিয়ে ডুব দেয়। তাদের মধ্যে একটা খুব সুন্দর আর দ্রুতগামী, অন্যটা মন্দগতি। একটা নদীতে নেচে বেড়ায়, অন্যটা নিজের বৃত্তের বাইরে যায় না। প্রভাতের সোনালী কিরণে তারা ম্লান না হয়ে আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

শান্তা গান গায় সুমন রান্না করে' শান্তা চুল বাধে, সুমন সেলাই করে। ক্ষুধার্তের মত শান্তা ভাতের থালায় ঝাঁপিয়ে পড়ে আর রোগীর মত সুমন ভাবে আমি সেরে উঠবো কি উঠবো না।

সদনের স্বভাব একেবারে পাল্টে গেল। সে এমন প্রেমের আকণ্ঠ সুখে নিমজ্জিত। আজকাল বেলা করে ওঠে, কয়েক ঘণ্টা কেটে যায় নাইতে, চুল আঁচড়াতে, কাপড় ছাড়তে আর সুগন্ধি মাখতে ! বেলা নটার আগে বসবার ঘরে আসে না আর এলেও সুস্থির হয়ে বসতে পারে না, মন যেন অন্য কোথায় পড়ে আছে। ক্ষণে ক্ষণে অন্দরে ছোটে, বাইরে কারো সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা বলতে হলে বিরক্ত হয়। শান্তা তার উপর বশীকরণ মন্ত্র প্রগোগ করেছে !

সুমন ঘরের সব কাজও করত আবার বাইরের কাজও করত। রাত থাকতে স্নান-পুজো সেরে সদনের জলখাবার তৈরী করত। তারপর নদীর ধারে গিয়ে নৌকা রওনা করিয়ে দিত, নটার সময় রাঁধতে বসত। এগারোটা নাগাদ ছুটি পেলে অন্য কোন কাজে লেগে পড়ত। রাত নটায় সকলে শুতে গেলে সে পড়তে বসত। তুলসীদাসের বিনয় পত্রিকা আর রামায়ণ ছিল তার অতি প্রিয়। কখনো ভক্তমাল পড়ত, কখনো বিবেকানন্দের ভাষণ, কখনো বা রামতীর্থের প্রবন্ধ। বিদুষী নারীদের জীবন চরিত বেশ আগ্রহভরে পড়ত। মীরার উপর তার অসীম শ্রদ্ধা, তবে ধর্মের বইগুলোই বেশী পড়ত। জ্ঞানের চেয়ে কিন্তু ভক্তিতে সে বেশী শান্তি পেত।

মাল্লাদের মেয়ে মহলে তার বড় আদর। সে তাদের ঝগড়া মিটিয়ে দেয়। কারো ছেলের জামাটুপি সেলাই করে দেয়, কারো জন্যে কাজল বা ওষুধ তৈরী করে দেয়। তাদের কারো অসুখ হলে তার বাড়ী গিয়ে ওষুধ পত্রের যোগাড় করে। ভাঙা দেওয়াল সে আবার দাঁড় করাতে চায়। সে পাড়ার সকলেই তার প্রশংসা করে, তার যশ গায়। তবে তার আদর নেই শুধু নিজের ঘরে। সুমন প্রাণপণে সংসারের সব দায় সামলায় কিন্তু সদনের মুখ দিয়ে কৃতজ্ঞতার একটা শব্দও শুনতে পায় না। শান্তা তার পরিশ্রমের মূল্য বোঝে না। দুজনেই ওর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত, যেন সে ঘরের চাকরানী আর সারাদিন কাজে লেগে থাকাই তার ধর্ম, মাঝে মাঝে তার মাথা ধরত, দৌড়-ঝাপের ফলে কখনো বা তার জ্বর হত, তবু সে ঘরের কাজ নিয়মমতই করে যেত। মাঝে মাঝে সে একলা বসে নিজের দুরবস্থার কথা ভেবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কাঁদত, কিন্তু তাকে সান্ত্বনা দিতে তার চোখের জল মোছাতে কেউ নেই।

সুমন স্বভাবতই মানিনী আর অহঙ্কারী ছিল। যেখানেই গিয়েছে রানীর মতই থেকেছে। স্বামীর ঘরে কষ্ট সয়েও সে রাণী ছিল। আবার বিলাস-নগরেও যতদিন ছিল সবার মাথার মণি হয়েই ছিল। আশ্রমে সেবা ও ধর্মের গুণে সকলে তাকে মানত। তাই এখানে এই অনাদরে থাকা তার অসহ্য মনে হচ্ছিল। সদন যদি মাঝে মধ্যে তার প্রশংসা করত, তার পরামর্শ চাইত, তাকে ঘরের গৃহিনী মনে করত বা শান্তা তার কাছে বসে তার কথায় সায় দিত, তাকে খুশি রাখত তো সুমন হাসিমুখে এর চেয়েও বেশী পরিশ্রম করত, কিন্তু নির্লজ্জ আবেগে প্রেমিক যুগলের আর কিছুই বোধগম্য হত না। লক্ষ্য ভেদ করতে হলে দৃষ্টি শুধু একটা জিনিসের উপরেই থাকে। প্রেমাসক্ত মানুষেরও একই অবস্থা।

কিন্তু শান্তা ও সদনের এই উদাসীনতা যে প্রেমলিপ্সার জন্যেই হয়েছে তাতে সন্দেহ আছে। সদন এমনভাবে সুমনকে এড়িয়ে চলত যেমন আমরা কুষ্ঠ রোগীকে এড়িয়ে চলি, তাদের দয়া করলেও কাছে যেতে সাহস হয় না। শান্তা তাকে অবিশ্বাস করত, তার রূপ লাবণ্য দেখে ভয় পেত। ভালের মধ্যে এইটুকুই সে সদন সুমনের ধারে কাছে যেত না, তাইলে তো শান্তা তার উপর জ্বলে উঠত। দুজনেই চাইছিল ঘরের কাল সাপ দূর হয়ে যাক কিন্তু সঙ্কোচ-বশে নিজেদের মধ্যেও এ নিয়ে আলোচনা করতে সাহস হত না।

ধীরে ধীরে সুমনের খবরটা ছড়িয়ে পড়ল।

একবার জীতন কহার শর্মাজীর বাড়ী থেকে সদনের জন্যে কিছু জিনিস নিয়ে এল। আগেও সে কয়েকবার এসেছে, কিন্তু সে এলেই সুমন লুকিয়ে পড়ত। এবার সে জীতনের চোখে পড়ে গেল। কথাটা কাউকে বলতে না পেরে তার পেট ফেঁপে উঠল। সে পাথর খেয়ে হজম করতে পারে কিন্তু কোন

কথা হজম করবার শক্তি তার নেই। মাল্লাদের পাণ্ডা চৌধুরীর কাছে তামাক খাবার ছুঁতো করে গিয়ে তাকে সুমনের সব খবর জানিয়ে দিল। আরে! এ তো বেশ্যা, স্বামী ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলে আমাদের ঘরে রাঁধতে লেগেছিল, সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলে চকে গিয়ে বেশ্যা হল; এখন দেখছি এখানে এসে হাজির হয়েছে। শুনে চৌধুরী স্তব্ধ হয়ে গেল, মেয়েদের মধ্যে কানাঘুষো শুরু হয়ে গেল। সেদিন থেকে কোন মাল্লা সদনের বাড়ীতে জল খেত না, তাদের মেয়েরা সুমনের কাছে যাওয়া আসা বন্ধ করে দিল। একদিন লালা ভগতরাম ইঁট আনবার হিসেব করবার জন্যে সদনের ঘরে এলেন। তেষ্টা পেলে এক মাল্লাকে জল আনতে বললেন। মাল্লা বাইরে কুঁয়ো থেকে জল নিয়ে এল, সদনের ঘরে বসে বাইরে থেকে জল এনে খাওয়ানো সদনের বুকে ছুরি মারার চেয়ে কম চোট লাগল না।

শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় বছরের শেষের দিকে অবস্থা এমন হলো যে সামান্য ব্যাপারেও সদন সুমনের উপর বিরক্ত হত, মুখে না বললেও মনের ভাব ফুটে বের হত।

সুমন বুঝতে পারছিল এখানে তার আর থাকা চলবে না। ভেবেছিল বোন-ভগ্নীপতির কাছে থেকেই জীবন কাটিয়ে দেবে। তাদের সেবা করবে, দুমুঠো খেয়ে একধারে পড়ে থাকবে। এর বেশী তার কোন আকাঙ্খা ছিল না। কিন্তু হায়! তার শেষ অবলম্বনও ঘুচে গিয়ে তাকে অথৈ জলে ফেলে দিল।

নিজের এই পরিস্থিতির জন্যে সুমনের যত দুঃখই হোক না কেন, সদন বা শান্তার উপর তার কোন অভিযোগ ছিল না। খানিকটা ধর্মের টান আর খানিকটা নিজের অবস্থা সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান তাকে নম্র বিনীত করে তুলেছিল। সে ভাবত এমন জায়গায় যাই যেখানে আমার জানা লোক কেউ নেই কিন্তু এমন কোন স্থান সে দেখতে পেত না। তার দুর্বল মন এখনও অবলম্বন খোঁজে। নিঃসহায় হয়ে সংসারে থাকার চিন্তায় তার বুক কেঁপে ওঠে। একলা অসহায় অবস্থায় সংসার সংগ্রামের সম্মুখীন হতে তার সাহস নেই। যে সংগ্রামে অতি বড় কৌশলী, ধর্মপ্রাণ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ লোকে হিমসিম খাচ্ছে সেখানে আমার কি উপায় হবে? কে আমায় সামলাবে? অবজ্ঞার পাত্রী হলেও এই সব ভয় তাকে নতুন পথে পা বাড়াতে বিরত করেছিল।

একদিন সদন বেলা দশটায় বাড়ী ফিরে বলল—রান্নার কত দেরী, তাড়াতাড়ি করো। পণ্ডিত উমানাথের সঙ্গে দেখা করতে যাব। কাকার বাড়ীতে এসেছেন?

শান্তা জিজ্ঞাসা করল—তিনি ওখানে এলেন কেন?

সদন—আমি তার কি জানি? জীতন এসে বলে গেল তিনি আজ এসেছেন আর আজই চলে যাবেন। এখানে আসবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু (সুমনের দিকে ইসারা করে) কোনও কারণে এলেন না।

শান্তা—একটু অপেক্ষা করো, ঘণ্টা খানেক দেরী হবে।

সুমন বিরক্ত হয়ে বলল—দেরী হবে কেন, সব তো রান্না হয়ে গিয়েছে। আসন পেতে জল দাও, এখনি ভাত বেড়ে দিচ্ছি।

শান্তা—আরে, একটু দেরী হলে কি হবে? কোন ডাকগাড়ী ছেড়ে যাচ্ছে? আধ সিদ্ধ খাওয়ার কি দরকার?

সদন—বুঝি না সারা দিনে কি হয়। একটু রান্না হতে এত দেরী হচ্ছে।

সদন খেয়ে চলে গেলে সুমন শান্তাকে বলল—শান্তা, সত্যি করে বল্ আমার এখানে থাকা কি তোর ভাল লাগছে না? তোর মনের কথা বুঝেছি, কিন্তু নিজের মুখে বলে যতদিন না তাড়িয়ে দিবি ততদিন যাবার নাম করব না। আমার কোথাও যাবার জায়গা নেই।

শান্তা—দিদি, এ সব কি বলছ? তুমি আছ বলেই ঘর দোর সব ঠিক আছে। না হলে আমাকে দিয়ে কি এমনটি হত?

সুমন—থাক্ আর মন রাখা কথা বলতে হবে না। আমি কচি খুকী নই, দেখে মনে হচ্ছে তোমরা দু'জনে আমায় সইতে পারছ না।

শান্তা—তোমার চোখের বাহাদুরী আছে। মনের কথাও দেখতে পায়।

সুমন—সোজা কথায় বলো। আমি যা বলছি তা কি মিথ্যে?

শান্তা—তুমি যখন জানই, তবে জিজ্ঞাসা করছ কেন?

সুমন—জিজ্ঞাসা করছি এই জন্যেই যে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। সংসার আমায় যত নীচু ভাবুক না কেন, তাতে আমার নালিশ নেই, তারা আমার মনের অবস্থা জানে না কিন্তু তোমরা সব কিছু দেখেও আমায় নীচ ভাবছ এইতেই আশ্চর্য হচ্ছি। তোমাদের সঙ্গে প্রায় দু' বছর আছি, এতদিনে আমার চরিত্রের পরিচয় ভালোভাবেই পেয়েছ।

শান্তা—না দিদি, পরমাত্মার নাম নিয়ে বলছি, এ কথা সত্যি নয়। আমাদের উপর এত বড় কলঙ্ক দিয়ো না। তুমি আমার যা উপকার করেছ তা কখনই ভুলব না। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে এই যে ও'র বদনাম হচ্ছে। লোকে যা তা কথা রটাচ্ছে। উনি (সদন সিংহ) বলছিলেন যে সুভদ্রা এখানে আসতে রাজী ছিলেন কিন্তু তুমি আছো শুনে এলেন না। আর দিদি, কিছু মনে করোনা, এটাই যখন সংসারের নিয়ম তখন আমরা কি করতে পারি?

সুমন আর তর্ক করল না, আদেশ মিলেছে। এখন বাধা শুধু একটাই। শান্তা অল্পদিনের মধ্যেই মা হবে। সুমন নিজের মনকে বোঝাল এ সময় যদি ছেড়ে চলে যাই তো ওর কষ্ট হবে। আর কয়েকটা দিন সহ্য করে থাকি। যেখানে এতদিন কাটল, সেখানে না হয় আর দু' এক মাস কাটুক। আমার জন্যেই তো ওরা এই বিপদে পড়েছে। এ অবস্থায় ওকে ছেড়ে যাওয়াটা আমার ধর্মে সইবে না।

এখানে সুমনের দিন কাটে না বছর কাটে, তবু সে ধৈর্য ধরে পড়ে রইল। ডানাকাটা পাখী পিঁজরেয় বন্ধ থাকাতেই তার মঙ্গল মনে করে।

৫২

পণ্ডিত পদ্মসিংহের চার পাঁচ মাসের সৎপ্রচেষ্টার এই ফল হল যে ২০—২৫ জন বেশ্যা তাদের মেয়েদের অনাথালয়ে পাঠাতে সম্মত হল। তিন জন বেশ্যা নিজেদের সমস্ত সম্পত্তি অনাথালয়ের জন্য দান করল, পাঁচটি বেশ্যা নিকা করতে রাজী হল। প্রকৃত হিতাকাঙ্খা কখনও নিষ্ফল হয় না। যদি সমাজ বিশ্বাস করে যে আপনি একজন প্রকৃত সেবক, আপনি তাকে উদ্ধার করতে চান, আপনি নিঃস্বার্থ তবে সে আপনার দেখানো পথে চলতে রাজী হবে। কিন্তু এ বিশ্বাস প্রকৃত সেবার আকাঙ্খা না থাকলে কখনই পাওয়া যায় না। যতক্ষণ না অন্তঃকরণ দিব্য আর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ততক্ষণ সে আলোর প্রতিবিম্ব অপরের অন্ধকার দূর করতে পারে না।

পদ্মসিংহের মনে সেবার আগ্রহ জেগে উঠেছিল। আমাদের মধ্যে এমন অনেক আছেন যাঁদের মনে দেশের সেবা করবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু বহুক্ষেত্রেই দেখা যায় এ ইচ্ছা জেগেছে খ্যাতি লাভের প্রেরণায়। আমরা ঐ সব কাজ করতে চাই যাতে আমাদের নাম সকলের মুখে শোনা যায়। এমন প্রবন্ধ বা গ্রন্থ লিখতে চাই যেটাকে লোকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করে, আর এই স্বার্থপ্রেমের প্রতিদান খানিকটা অন্ততঃ মেলে কিন্তু জনতার হৃদয়ে আমাদের স্থান হয় না। যত দুঃখই হোক না কেন, কোন লোকই নিজের প্রকৃত বন্ধু ছাড়া অপরের কাছে নিজের দুঃখ শোক প্রকাশ করতে চায় না।

পদ্মসিংহ আজকাল দালমণ্ডী যাবার প্রচুর অবসর পেতেন। বেশ্যাদের জীবন সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান যেমন বাড়ছিল দুঃখও তেমনি বাড়তে লাগল। এমন ফুলের মতো সুকোমল মেয়েদের ইন্দ্রিয় বিলাসের জন্যে সর্বস্ব খোয়াতে দেখে তাঁর হৃদয় করুণায় বিহ্বল হয়ে উঠত, চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসত। তিনি এখন বুঝতে পারলেন যে এই মেয়েরা ন্যায় অন্যায় ভাল মন্দ বোঝে তারা বুদ্ধিহীন নয়; শুধু মায়ার ফাঁদে পড়ে তাদের সদ্‌বৃত্তি গুলো উল্টো পথে যাচ্ছে; ভোগ তৃষ্ণা তাদের আত্মাকে দুর্বল, নিশ্চেষ্ট করে ফেলেছে। পদ্মসিংহ এই মায়াজাল ছিঁড়তে চাইছিলেন, তাদের সুপ্ত আত্মাকে সচেতন করতে চাইছিলেন, অজ্ঞানাবস্থা থেকে মুক্তি দিতে চাইছিলেন কিন্তু মায়াজাল এতই দৃঢ়, অজ্ঞানতার

বন্ধন এতই শক্ত যে প্রথম ছ মাসে তিনি খুব বেশী সফল হলেন না। এর উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। মদের নেশায় মানুষের যে অবস্থা হয়, বেশ্যাদেরও সেই দশা হয়েছে।

ওদিকে প্রভাকর রাও ও তাঁর বন্ধুরা প্রস্তাবের অবশিষ্ট অংশ গুলো আবার বোর্ডে তুললেন, শুধু পদ্মসিংহের প্রতি আক্রোশবশেই তাঁরা ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু এখন পদ্মসিংহের বেশ্যাপ্রীতি দেখে তাঁরা তাঁর তৈরী অস্ত্র দিয়ে তাঁকেই আঘাত করলেন। পদ্মসিংহ সেদিন বোর্ডে যাননি, ডাক্তার শ্যামাচরণ নৈনিতাল গিয়েছেন অতএব মন্তব্য দুটো নির্বিঘ্নে পাশ হয়ে গেল।

বোর্ডের তরফ থেকে অলইপুরের কাছে বেশ্যাদের জন্যে বাড়ী তৈরী হচ্ছিল। লালা ভগতরাম মন দিয়ে কাজ করছিলেন। কিছু ঘর কাঁচা, কিছু পাকা, কিছু দোতালা, একটা ছোট বাজার, এক ছোট ঔষধালয় আর একটা মন্দির তৈরী হচ্ছে। দীনানাথ তিওয়ারী একটা বাগানের ভিত্তিস্থাপন করলেন। আশা ছিল যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভগতরাম কাজ শেষ করে দেবেন ; মিস্টার দত্ত, পণ্ডিত প্রভাকর রাও আর শাকিল বেগ তাঁকে নিশ্চিন্ত থাকতে দিতেন না। কিন্তু ছিল অনেক, তাড়াতাড়ি করেও এক বছর লাগল। পরের দিনই বেশ্যাদের দালমণ্ডী ছেড়ে নতুন বাড়ীতে বাস করবার জন্যে নোটিশ জারি হল।

লোকেদের ভয় ছিল যে বেশ্যারা এর বিরোধিতা করবে কিন্তু তাদের হাসিমুখে এই আদেশ মানতে দেখে খুশী হলেও অবাক হল। সারা দালমণ্ডী একদিনে খালি হয়ে গেল। যেখানে রাতদিন আলোয় ঝলমল করত সেখানে সন্ধ্যা হতেই অন্ধকার ছেয়ে গেল।

মহবুবজান এক ধনী বেশ্যা ছিল, অনাথালয়ের জন্যে সে সর্বস্ব দান করে দিয়েছে। সন্ধ্যায় সব বেশ্যা তার বাড়ীতে জড়ো হল। সেখানে এক সভা হল। শাহজাদী বলল—প্রিয় বোনেরা, আজ আমাদের জীবনে এক নতুন পথে যাত্রা শুরু হচ্ছে। খুদাতালা আমাদের শুভ প্রচেষ্টায় আশীর্বাদ দিন, আমাদের সৎপথে নিয়ে যান। আমরা অনেকদিন নির্লজ্জ, ঘৃণ্য, অপমানকর জীবন কাটিয়েছি। শয়তানের হাতে অনেকদিন বন্দী হয়ে রয়েছি। বহুদিন ধরে নিজেকে আর ধর্মকে খুন করেছি। অনেকদিন ধরে লালসা আর বিলাস ব্যসনে মত্ত থেকেছি। এই দালমণ্ডীর মাটি আমাদের কুকর্মে কালো হয়ে যাচ্ছে। করুণাময় পরমেশ্বর আমাদের অবস্থা দেখে দয়া করে এই বন্দী জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এই জন্যে তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। সন্দেহ নেই আমাদের কিছু বোনেরা এখান থেকে নির্বাসিত হবার জন্যে অস্বস্তি বোধ করছেন এবং নিশ্চয়ই তাঁদের কাছে ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় মনে হচ্ছে। তাঁদের এই বলে আশ্বাস দিতে পারি যে ঈশ্বর কারুর জীবিকার দরজা বন্ধ করেন নি।

আপনাদের এমন বিদ্যে রয়েছে যার কদর চিরকাল থাকবে। কিন্তু যদি ভবিষ্যতে আমাদের কষ্টও হয় তবু আমাদের দৃঢ় ও শান্ত হয়ে থাকতে হবে। ভবিষ্যৎ জীবনে কষ্ট যত বাড়বে আমাদের পাপের বোঝা ততই কমে যাবে। আমি আবার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন তাঁর আলোয় আমাদের হৃদয় আলোকিত করবেন, নিজেদের সৎপথে নিয়ে যাবার সামর্থ্য দেন।

রাম ভোলী বাঈ বলল—পদ্মসিংহকে আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। তিনি আমাদের ধর্মের পথ দেখিয়েছেন। পরমাত্মা তাঁকে সদা সুখী রাখুন।

জোহরাজান বলল—আমি আমার বোনেদের বলতে চাই যে ভবিষ্যতে তারা যেন ন্যায় অন্যায়ের দিকে খেয়াল রাখে। গান-বাজনা আমাদের ন্যায় সঙ্গত কাজ। এই বিদ্যায় পারদর্শী হও। দুশ্চরিত্র, কামাতুর ধনীদের খেলার পুতুল হওয়া ছেড়ে দিতে হবে। অনেকদিন পাপের গোলামি করেছি। এখন নিজেদের মুক্ত করতে হবে। ঈশ্বর কি আমাদের এইজন্যে সৃষ্টি করেছেন যে নিজের সৌন্দর্য, যৌবন, নিজের আত্মা, ধর্ম, নিজের লজ্জা হায়া এই অসৎ, কামুক লোকদের ভেট দেব? যদি কোন উৎসাহী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমাদের জন্যে পাগল হয়ে ওঠে তখন আমরা কত খুশি হই। আমাদের দাদালদের আনন্দ ধরে না। সঙ্গী ঝি পর্যন্ত বগল বাজাতে থাকে আর আমাদের তো মনে হয় যেন সোনার চিড়িয়া ফাঁদে পড়েছে; কিন্তু এ আমাদের ভুল। আমরা তাদের ফাঁদে ফেলিনি বরং নিজেরাই জালে আটকা পড়েছি। তারাই সোনা রুপো দিয়ে আমাদের কিনে নিয়েছে। পবিত্রতার মত অমূল্য জিনিষ আমরা খুইয়ে ফেলি। ভবিষ্যতে আমাদের এমন নিয়ম হওয়া উচিত যে যদি আমাদের মধ্যে কাউকে খারাপ কাজ করতে দেখা যায় তবে তৎক্ষণাৎ তাকে আমাদের সমাজ থেকে খারিজ করা হবে।

সুন্দর বাঈ বলল—জোহরা বোন খুব ভালো প্রস্তাব করেছেন। আমিও তাই চাই। যদি আমাদের কাছে কেউ যাওয়া আসা করে তবে প্রথমে দেখতে হবে লোকটা কেমন। যদি সে আমাকে ভালবাসে আর আমার মনও তাকে চায় তবে বিয়ে করা উচিত। কিন্তু বিয়ে না করে সে যদি শুধু কাম চরিতার্থ করবার আশায় আসে তো তাকে তৎক্ষণাৎ দূর করে দেওয়া উচিত। পয়সার লোভে নিজেদের ইজ্জত বেচা উচিত নয়।

রামপ্যারী বলল—স্বামী গজানন্দ আমায় একটা বই দিয়েছেন, তাতে লেখা আছে যে রূপ আমাদের গতজন্মের ভালো কাজের ফল; কিন্তু আমরা গতজন্মের উপার্জন এই জন্মে নষ্ট করে ফেলছি। যে বোনেরা জোহরার মত পছন্দ করেন, তারা হাত তুলুন।

তখন বিশ পঁচিশ জন বেশ্যা হাত তুলল।

রামপ্যারী আবার বলল—যাঁরা এটা পছন্দ করেন না তাঁরা হাত তুলুন।

এবার একটি হাতও উঠল না।

রামপ্যারী—কেউ হাত তোলে নি। তাহলে এর অর্থ হচ্ছে যে আমরা জোহরার কথা মেনে নিয়েছি। আজকের দিনের জয় হোক।

বৃদ্ধা মহবুব জান বলল—আমার বলতে ভয় লাগছে যে তোমরা হয়তো বলবে, 'সত্তর চুহা খাকর কে বিল্লী চলী হজ কো।' কিন্তু আজ থেকে সাতদিনের দিন আমি সত্যিই হজ করতে চলে যাব। আমার জীবন তো যেমন কাটার কথা তেমন ভাবেই কেটেছে, কিন্তু তোমাদের এই ইচ্ছে দেখে আমি যে কতো খুশী হয়েছি তা বলে বোঝাতে পারি না। মঙ্গলময় ঈশ্বর তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

কয়েকজন বেশ্যা নিজেদের মধ্যে কানাকানি করছিল। তাদের চেহারায় বোঝা যায় এ সব কথা তাদের পছন্দ হয়নি, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলবার সাহস নেই। হীন চিন্তা পবিত্র ভাবের সামনে চাপা পড়ে যায়।

এরপর সভার কাজ শেষ হল আর বেশ্যার দল পায়ে হেঁটে অলইপুরের পথে রওনা হল, যেন যাত্রীরা কোন ধাম দর্শন করতে যাচ্ছে।

সারা দালমণ্ডী অন্ধকার। তবলার বোল ফুটছে না, সারেঙ্গীর আলাপ বন্ধ! কানে আসে না মধুর সুরে গান। নেই রসিক লোকের আনাগোনা।

৫৩

কয়েকমাস পর্যন্ত মদনসিংহের এমন অবস্থা হল যে কেউ তাঁর কাছে এলেই তার কাছে সদনের নিন্দে করতেন—কুপুত্র! ভ্রষ্টা! লুচ্চা! চরিত্রহীন! একটা কাণা কড়িও দেব না। দোরে দোরে ভিক্ষে করতে হবে, তখন বুঝবে কত ধানে কত চাল। দানপত্র তৈরী করে পাঠাবার জন্যে পদ্মসিংহকে কয়েকবার লিখলেন। ভামা কখনও সদনের কথা তুললে ভীষণ রেগে যেতেন তার উপর, গৃহত্যাগের ভয় দেখাতেন. বলতেন, যোগী হয়ে যাবো, সন্ন্যাসী হয়ে যাবো সেও ভালো কিন্তু ও ছোঁড়ার মুখ দর্শন করবো না।

এরপর তাঁর মানসিক অবস্থার পরিবর্তন দেখা গেল। সদনের চর্চা করাই ছেড়ে দিলেন। কেউ সদনের নিন্দে করলে আনমরা হয়ে যেতেন। বলতেন ওকে আর শাপ মন্যি করছ কেন? যেমন করেছে নিজেই তার ফল ভুগবে। ভালো হোক আর মন্দ হোক, আমার কাছ থেকে তো দূরে আছে। নিজে, চার পয়সা রোজগার করছে, খাচ্ছে; একধারে পড়ে আছে, পড়ে থাকতে দাও।

লালা বৈজনাথ তাঁর খুব অন্তরঙ্গ ছিলেন। একদিন তিনি খবর আনলেন, উমানাথ নাকি সদনকে কয়েক হাজার টাকা দিয়েছে, নদীর ওপারে বাড়ী তৈরী

হচ্ছে, একটা বাগান করা হচ্ছে। ডাল ভাঙবার কল কিনেছে, খুব টাকা রোজগার করছে আর ওড়াচ্ছে। মদনসিংহ ফোঁস করে বলে উঠলেন—তবে কি চাও যে ও ভিক্ষে করে, অন্যের রুটিতে ভাগ বসায়? উমানাথ ওকে কি টাকা দেবে, এই তো চাঁদা তুলে একটার বিয়ে দিয়েছে, নিজেই এখন টাকা টাকা করে ঘুরে মরছে। সদন যা করেছে সব নিজের রোজগারেই করেছে। যত খারাপই হোক, ও তো নিষ্কর্মা নয়, ঠুঁটো নয়। এখন জোয়ান বয়সে নিজে রোজগার করে যদি ওড়ায় তো লোকের খারাপ লাগে কেন? তোমার এই গাঁয়েই তো কতো ছেলে রয়েছে, এক পয়সা রোজগার করে না কিন্তু ঘরের পয়সা চুরি করে চামারানীর পেট ভরায়। সদন ওদের চেয়ে তো ভালো। মুন্সী বৈজনাথ লজ্জিত হলেন।

আরো কিছুদিন পরে মদন সিংহের মনোবৃত্তিতে পরিবর্তন হল। চোখের সামনে যেন সদনের মূর্তি ভেসে ওঠে, তার কথা খালি মনে পড়ে যায়; বলেন, কেমন নিষ্ঠুর দেখেছ আমার উপর রাগ দেখাচ্ছে, আমি যেন এই সব জমি জায়গা জিনিষপত্র সব নিজের মাথায় করে নিয়ে যাবো। এখানে একবার আসতে পারে না, পায়ে মেহেদী মাখিয়ে বসে আছে। পাপী কোথাকার! আমায় তেজ দেখাচ্ছে? শোকে দুঃখে মরে যাবো তখন আমার নাম ধরে কাঁদবে, তখন এখানে ছুটে আসবে, এখন আসতে পারে না; আচ্ছা দেখি তুমি কোথায় পালিয়ে যাও সেখানে গিয়েই তোমায় মজা দেখাব।

খাওয়ার পর বিশ্রাম করবার সময় ভামার কাছে সদনের কথা তুলতেন—ছেলেটা ছেলেবেলা থেকেই জেদী। যে জিনিষের জন্যে জেদ ধরবে সেটা নিয়ে তবে ছাড়বে। তোমার বোধ হয় মনে আছে একবার আমার পুজোর ঝুলিটা নেবার জন্যে কি রকম বায়না ধরল আর শেষ পর্যন্ত সেটা নিয়ে তবে চুপ করে। ভীষণ একগুঁয়ে। কেমন নিষ্ঠুর দ্যাখো, একটা চিঠি পর্যন্ত লেখে না। কানে তেল দিয়ে চুপচাপ বসে আছে। আমরা যেন মরে গেছি।

ভামা এসব শুনে কাঁদত। মদন সিংহেব আত্মভিমান পুত্রস্নেহের কাছে হার মানল।

এইভাবে একবছরের বেশী কেটে গেল। মদনসিংহ সদনের কাছে যাবার জন্যে বারবার স্থির করতেন কিন্তু কার্যত তা হয়ে উঠত না। একবার জিনিষ-পত্র বাঁধাবাঁধি হল কিন্তু একটু পরে সব খুলে ফেললেন। একবার তো স্টেশনে গিয়েও ফিরে এলেন। তাঁর হৃদয় যেন স্নেহ আর অভিমানের খেলনা হয়ে গিয়েছে।

এখন ঘর সংসারের কাজে তাঁর মনে বসে না। ক্ষেতে সময়মতো জল দেওয়া হয় না। ফসল নষ্ট হয়। খাতকদের কাছ থেকে আগাম দেওয়া টাকা উসুল হয় না। তারা টাকা দিতে আসে কিন্তু টাকা নিয়ে রসিদ দেওয়া মদন-

সিংহের ভারী ঠেকে। বললেন, ভাই এখন যাও, পরে এসো। ঘরে রাখা গড়ে থেকে থেকে গলে গেল, বেচবার চেষ্টা হল না। ভামা কিছু বললে রাগ করে বলতেন, চুলোয় যাক ঘর-দোর যার জন্যে করতাম সেই যখন নেই তখন এই ঘর সংসার আমার কোন কাজে লাগবে? এখন তিনি বুঝলেন তাঁর সারা জীবন, সমস্ত ধর্মনিষ্ঠা, সমস্ত কর্মশীলতা, সারা আনন্দ কেবল একটা কেন্দ্রবিন্দুকে অবলম্বন করেছিল। আর সে কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সদন।

এদিকে বেশ কিছুদিন পদ্মসিংহও আসেন নি। একটা বড় কাজ শেষ করার পর মনে যেমন অবসাদ আসে, পদ্মসিংহের অবস্থা সেইরকম। পদ্মসিংহও তাঁকে বিশেষ চিঠিপত্র দেন না। তবে তাঁর চিঠি এলে মদন সিংহ উৎসুক হয়ে পড়েন কিন্তু সদনের কোন খবর নেই দেখে উদাস হয়ে পড়েন।

একদিন মদনসিংহ বারান্দায় বসে 'প্রেমসাগর' পড়ছিলেন। কৃষ্ণের বাল্যলীলা পড়ে ছোট ছেলের মতই আনন্দ হচ্ছিল। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। অক্ষর বুঝতে পারা যাচ্ছে না, কিন্তু এমন মন বসে গেছে যে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না। হঠাৎ কুকুরদের চিৎকারে বুঝলেন গাঁয়ে কোন নতুন লোক এসেছে। মদন সিংহের বুক কেঁপে উঠল, তবে কি সদন আসছে? বই বন্ধ করে উঠেই পদ্মসিংহকে আসতে দেখলেন। পদ্মসিংহ তাঁকে প্রণাম করলেন। দুই ভাইয়ে কথাবার্তা হতে লাগল।

মদন—সব কুশল তো?

পদ্ম—আজ্ঞে হ্যাঁ, সবই ঈশ্বরের দয়া।

মদন—তা, ওই বেইমানটারও কিছু খোঁজ খবর পেলে?

পদ্ম—আজ্ঞে হ্যাঁ, ভালই আছে। পাঁচ দশদিন বাদবাদ আমার এখানে আসে। আমিও মাঝে মাঝে তার খোঁজ খবর নিই। চিন্তার কিছু নেই।

মদন—আচ্ছা, ঐ পাপীটা কখনো কি আমাদের কথা বলে, না আমরা মরে গিয়েছি ধরে নিয়েছে? ও কি প্রতিজ্ঞা করেছে যে এখানে আসবে না? আমরা মরে গেলে তবে কি আসবে? যদি তার এই ইচ্ছে হয় তো আমরা অন্য কোথাও চলে যাই। নিজের ঘরবাড়ী নিক, সংসার সামলাক। শুনেছি ওখানে নাকি ঘর তৈরী করাচ্ছে। তবে তো ও সেখানে থাকবে। আর এখানে তাহলে কে থাকবে? এ ঘর কার জন্য ছাড়বে?

পদ্ম—আজ্ঞে না, ঘরটর তো কিছু তৈরী হচ্ছে না। কেউ আপনাকে মিথ্যে খবর দিয়েছে, হ্যাঁ, একটা চুনের কল করিয়েছে আর নদীর ওপারে কিছু জমি কিনতে চায় শুনেছি।

মদন—তবে তাকে বলে দিয়ো যে প্রথমে এখানে এ ঘরে আগুন লাগিয়ে দিক, তারপর ওখানে যেন জায়গা-জমি কেনে।

পদ্ম—এ আপনি কি বলছেন? আপনারা অসন্তুষ্ট হবেন এই ভয়েই সে

আসে না। আজ যদি জানতে পারে আপনি তাকে ক্ষমা করেছেন তো এখনই ছুটে আসবে। আমার কাছে এলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু আপনাদের কথাই বলতে থাকে। আপনার ইচ্ছে হলে কালই চলে আসে।

মদন—না, আমি ওকে ডাকবো না। আমি ওর কে হই যে এখানে আসবে? কিন্তু এখানে যদি আসে তো যেন পিঠ শক্ত করে রাখে। ওকে দেখলেই আমার মাথার শয়তান ভর করবে আর আমি ডাণ্ডা বসিয়ে দেব। মূর্খ আমার রাগের ভয়ে মরছে! পুজোর সময় যখন পুঁথির ওপর নাল ফেলত, খাওয়ার থালার কাছে পেচ্ছাপ করতো তখন তো, রাগিনি। ওর জ্বালায় কাপড় পরিষ্কার থাকত না। পরিষ্কার কাপড়ের উপরেই টান বেশি, আমায় ফর্সা জামা কাপড় পরা দেখলেই গায়ে ধুলোমাটি মেখে এসে কাঁধে চড়ে বসত। তখন কেন রাগ করিনি? আজ রাগ করতে যাচ্ছি। এখন সামনে পেলে এমন কসে কান মলে দিই যে আঁতুড়ের দুধ উঠে আসবে।

দু'ভাই ঘরে এলেন। ভামা বসে গরুকে ভুষি খাওয়াচ্ছিল আর সদনের দুই বোন রান্নার কাজে ব্যস্ত। ভামা দেবরকে দেখে দাঁড়িয়ে উঠে বলল—বাবা! আজ তোমার দর্শন মিলল। চার পা দূরে থাকো, মাসে একবার এসে দেখে যেতেও পারো না যে ঘরের লোকগুলো মরেছে কি বেঁচে আছে। যাক্ সব কুশল তো?

পদ্ম—হ্যাঁ, সবই তোমার আশীর্বাদে, তা কি রান্না হচ্ছে? আমাকে এখন ক্ষীর, হালুয়া আর মালাই খাওয়াও তো এমন সুখবর শোনাই যে লাফিয়ে ওঠো। নাতি হয়েছে!

ভামার মলিন মুখ আনন্দে ভরে গেল, চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল—চলো, তোমায় ঘি চিনির হাঁড়িতে ডুবিয়ে রাখি। যত ইচ্ছে হয় খাও।

মদনসিংহ মুখ ভার করে বললেন—এ তো খারাপ খবর শোনালে, ঈশ্বরের কাছে কি উলটো বিচার হয়? আমার ছেলে ছিনিয়ে নিল আর ওকে ছেলে দিয়ে দিল। এখন তো ও একের বদলে দুই হয়ে গেল, ওর সঙ্গে কি আর জিততে পারি? হারতেই হোল। সে নিশ্চয় আমায় টেনে নিয়ে যাবে। সত্যি ঈশ্বরের কাছে মন্দ করলে ভালো হয়, সবই উলটো নয় কি? কিন্তু আর আমার চিন্তা নেই। সদন যেখানে খুশি যাক, ঈশ্বর আমার কথা শুনেছেন। ক'দিনের হলো?

পদ্ম—আজ নিয়ে চার দিন। আমি ছুটি পেলাম না, না হলে প্রথম দিনেই আসতাম।

মদন—তাতে কি, ষষ্ঠীর দিন পৌঁছে যাবো, ধুমধাম করে ষষ্ঠীপুজো হবে। কালই চলো।

ভামার আনন্দ ধরে না, মনে পুলকের জোয়ার। মনে হচ্ছে কাকে কি দিই,

কোন জিনিষ লুটিয়ে দিই। ইচ্ছে হচ্ছে ঘরে মঙ্গলগীত হতে থাক, দরজায় শানাই বাজুক, পড়শীদের ডেকে আনি। গান বাজনায় সারা গাঁ মেতে উঠুক। তার ধারণা হলো যেন সংসারে আজ এক অসাধারণ ব্যাপার ঘটেছে, যেন সারা সংসার সন্তানহীন, আর একমাত্র সেই পুত্র-পৌত্রবতী।

এক মজুর এসে বললে—ভৌজী, দরজায় এক সাধু এসেছে।

ভামা তৎক্ষণাৎ এত জিনিস পাঠিয়ে দিল যে চার সাধুও খেয়ে শেষ করতে পারবে না।

রাতের খাওয়া সারা হলে ভামা দুই মেয়েকে নিয়ে ঢোল নিয়ে বসে গেল আর মাঝ রাত পর্যন্ত গান গাইল।

৫৪

লোভে পড়ে লোকে যেমন গয়না চুরি করে কিন্তু বিবেক বুদ্ধি জেগে উঠলে পরে সেটাকে দেখলেও লজ্জা হয়, সদনও তেমনিভাবে সুমনের নজর এড়িয়ে চলত। শুধু তাই নয় সে তাকে ছোট নজরে দেখত, তাকে তাচ্ছিল্য করত। সারাদিন খাটার ফলে ব্যবসার উপর রাগ হত, বিশেষ করে চুণের কাজের জন্য তাকে বড় পরিশ্রম করতে হত। তার মনে হত এই সুমনের জন্যেই তাকে ঘর ছাড়তে হয়েছে। এর জন্যেই আমার এই বনবাস। ঘরে কি আরামে ছিলাম। না ছিল চিন্তা, না ছিল ঝঞ্ঝাট ; খাও, দাও আর ফুর্তি করো। এর জন্যেই আমার এই দুর্দশা। প্রেমের প্রথম জোয়ারে সে তার হাতের রান্না খেয়ে নিত কিন্তু এখন সে জন্যে সে বড় অনুতপ্ত। চাইছিল যে কোনও প্রকারে সে এখান থেকে বিদায় হোক। এ সেই সদন যে সুমনের জন্যে সব করতে পারত, যার মিষ্টি কথা, কৃপা কটাক্ষের জন্যে প্রাণ দিতেও তৈরী ছিল। কিন্তু সুমন আজ তার চোখে এত নেমে গেছে। সে নিজেও ভুলে গেছে যে মানব-প্রকৃতি কতো চঞ্চল।

কয়েক বছর যাবৎ সদন লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে আর যবে থেকে চুনের কল বসিয়েছে তো দৈনিক কাগজ পড়বার অবসরও পায় না। বুঝতে পেরেছে এ সব পড়াশোনা তাদেরই সাজে যাদের সারাদিন বসে বসে মাছি মারা ছাড়া কোন কাজ নেই। কিন্তু জানিনা কেমন করে চুনের যন্ত্র নিতে আর হারমোনিয়ম বাজাতে সে ঠিক অবসর পেত।

মাঝে মাঝে বিগত দিনের কথা স্মরণ করে ভাবত, আমি তখন কত বোকা ছিলাম, এই সুমনের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরতাম। সেই সুমন এখন চরিত্রের

গর্ব করে। নদীর ধারে রোজ অন্য স্ত্রীলোক দেখে এখন তার মনে কোন কুভাব জাগে না, সদনের মনে হল এটা তার চরিত্র বল।

কিন্তু যখন গর্ভিনী শান্তার প্রসবের সময় ঘনিয়ে এল আর সে প্রায়ই নিজের ঘরে বন্দিনীর মত শিথিল, মলিন হয়ে পড়ে রইল তখন সদন বুঝল তার ধারণা কত ভুল। যাকে সে চরিত্রবল মনে করেছিল সেটা শুধু তৃষ্ণা মিটে যাওয়ার ফল। আজকাল সে ঘরে ফিরলে মধুর হাসি হেসে শান্তা তাকে অভ্যর্থনা করে না, নিজের খাটে পড়ে থাকে। তার কখনো মাথায় ব্যথা, কখনো জ্বর, কখনো গা বমির ভাব গেলেই আছে। মুখ কান্তিহীন, মনে হয় যেন শরীরে রক্ত নেই।

তার দশা দেখে সদনের দুঃখ হত, অনেকক্ষণ তার পাশে বসে তার মন ভালো করবার চেষ্টা করত, কিন্তু সদনের চেহারা দেখলে বোঝা যেত যে এটা তার ভাল লাগছে না। কোন ছুতোয় সে সেখান থেকে উঠে যেত। ভোগ লালসায় তার মন আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে। মাল্লাদের যুবতী স্ত্রীদের সঙ্গে এখন সে হাসি ঠাট্টা করে, গঙ্গাতীরে গেলে সেখানে স্নানরতা মেয়েদের দিকে কুদৃষ্টি দেয়। শেষে একদিন সে বাসনায় বিহ্বল হয়ে দালমণ্ডীর দিকে রওনা হল। অনেকদিন সে এদিকে আসেনি। আটটা বেজে গেছে। কাম-ভোগের প্রবল ইচ্ছা তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। তার জ্ঞান বিবেক এই আবেগের নিচে চাপা পড়েছে। সে দুপা এগোয়, আবার দাঁড়িয়ে কিছু ভেবে পিছু হাঁটে, দু তিন পা গিয়ে আবার ঘুরে এগিয়ে যায়, সে যেন একটা রোগী যে সামনে মিষ্টান্ন দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে, পথ্যাপথ্য বিচার করে না।

সে দালমণ্ডী পৌঁছে গলিতে আর আগের মতন শোরগোল দেখতে পেল না। দু' চারটে পানের দোকান ছিল, কিন্তু রুটির ও মিষ্টির দোকান বন্ধ। কোঠায় বেশ্যাদের উঁকি মারতে দেখা গেল না, সারেঙ্গী, তবলার আওয়াজ নেই। এইবার তার মনে পড়ল বেশ্যারা এখান থেকে চলে গেছে। মন প্রথমে ক্ষুন্ন হল কিন্তু একটু পরেই বিচিত্র আনন্দ অনুভব করল। সে তার কাম প্রবৃত্তি জয় করেছে। যেন সে এক কড়া সেপাইয়ের হাত থেকে ছাড়া পেয়েছে। সেপাইটা তাকে নিচে নিয়ে যাচ্ছিল, তার হাত থেকে পালাবার সামর্থ নেই ; কিন্তু থানায় পৌঁছে সেপাই দেখে থানা বন্ধ, থানাদার নেই, কনস্টেবল নেই, চৌকিদার নেই। নিজের মনের দুর্বলতা দেখে সদন লজ্জা পেল। নিজের মনোবল নিয়ে তার যে অহঙ্কার ছিল তা চুরমার হয়ে গেল।

ফিরেই যাচ্ছিল, কিন্তু মনে হল যখন এসেই পড়েছি তখন ভালো করে ঘুরে বেড়াই না কেন ? এগিয়ে গেলে সুমন যে বাড়ীতে থাকত সেটা দেখা গেল। সেখান থেকে গানের সুর ভেসে আসছে। আশ্চর্য হয়ে উপরে তাকিয়ে এক বড় সাইনবোর্ড দেখতে পেল। তাতে লেখা 'সঙ্গীত পাঠাশালা'। সদন উপরে

উঠে গেল। এই ঘরেই-মাসের পর মাস সে সুমনের পাশে বসত। মনে অনেক পুরনো স্মৃতি জেগে ওঠে। একটা বেঞ্চে বসে সে গান শুনতে লাগল। বিশ পঁচিশজন লোক বসে গান বাজনা অভ্যাস করছে। কেউ সেতার বাজাচ্ছে, কেউ সারেঙ্গী, কেউ বা তবলা, আর একজন বুড়ো ভদ্রলোক তাদের এক এক করে শেখাচ্ছেন। তাঁকে সঙ্গীত বিদ্যায় নিপুণ মনে হল। গান শুনতে এত ভাল লাগল যে সে পনেরো মিনিট সেখানে বসে রইল। এখানে এসে গান শেখাবার প্রবল ইচ্ছা হল, কিন্তু একে তো তার বাড়ী এখান থেকে অনেক দূরে আর তার উপর বাড়ীতে মেয়েদের একলা ফেলে রাতে আসা অনুচিত। সে উঠতে যাচ্ছিল, এমন সময় গায়নাচার্য সেতারে গান ধরলেন—

দয়াময়ি ভারতকো অপনাও।
তব বিয়োগসে ব্যাকুল হুঁয় মাঁ, সত্বর ধৈর্য ধরাও।
প্রিয়লাল্লন কহ কর পুচকারো, হঁস কর গলে লগাও॥
দয়াময়ি ভারত কো অপনাও।
সোয়ে হুয়ে জাতিকে গৌরব, জননি! ফের জগাও।
দুখরা পরাধীনতা রূপী বেড়ী কাট বহাও॥
দয়াময়ি ভারতকো অপনাও।*

* যার অর্থ—(দয়াময়ি, ভারতকে আপন করে নাও। তোমার বিয়োগে ব্যাকুল হয়েছি, শীঘ্র সান্ত্বনা দাও, প্রিয় সন্তান বলে আদর করে হেসে গলা জড়িয়ে ধর। জননী, জাতির সুপ্ত গৌরব আবার জাগাও। দুঃখজনক পরাধীনতার বেড়ী কেটে ফেল।)

গানটা শুনে সদনের মনে উঁচু ভাবের বন্যা বয়ে গেল। দেশোপকার জাতি-সেবা, রাষ্ট্রীয় গৌরবের পবিত্র চিন্তা মন তোলপাড় করতে লাগল। সঙ্গীতের ধ্বনি তার অন্তরেও এক প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করল। জগৎজননীর দয়াময়ী মূর্তি তার মানস-নেত্রে সামনে এসে দাঁড়াল। এক দরিদ্র, দুঃখী, দীন, ক্ষীণ বালক দীনভাবে দেবীর দিকে তাকিয়ে আছে আর হাত জোড় করে সজল চোখে দেখতে দেখতে বলছে, 'দয়াময়ি ভারত কো অপনাও। কল্পনায় সে নিজেকে দীন কৃষকের সেবা করছে দেখতে পেল। সে জমিদারের পেয়াদাকে বিনয় করে বলছে এইসব দীন দরিদ্রকে দয়া করো। কৃষকেরা তার পায়ে এসে পড়ছে, তাদের মেয়েরা তাকে আশীর্বাদ করছে। কল্পনায় দেখতে পেল যেন এক বিরাট বরযাত্রার আয়োজনে বরের মতো সে প্রধান দেশসেবক হয়ে উঠেছে। দেশ সেবার সঙ্কল্প করে সদন সেখান থেকে উঠে এল।

নিজের চিন্তায় মগ্ন হয়ে কারুর সঙ্গে কথা বলল না। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেল সুন্দরবাঈ-এর বাড়ীর সামনে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। এক-জনকে জিজ্ঞাসা করল; এত লোক জমেছে কেন? শুনল আজ কুমার অনিরুদ্ধ

সিংহ এখানে এক 'কৃষি সহায়ক সভা' খুলবেন। সভার উদ্দেশ্য হবে গরীব চাষীদের জমিদারের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচানো। একটু আগে কৃষকের জন্যে সদনের মনে যে সহানুভূতি জেগেছিল তা কমে গেল। সে নিজে জমিদার হয়ে চাষীদের দয়া দেখাতে চায় বটে কিন্তু অপরে তাকে চাপ দেবে আর জমিদারের বিরুদ্ধে চাষীদের দাঁড় করাবে এটা সে সহ্য করতে পারে না। সে মনে মনে বলল, এরা জমিদারী প্রথা তুলে দিতে চায়। ঈর্ষার বশে এরা যেমন এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা করবে বলে স্থির করেছে। আমাদেরও তেমনি সতর্ক হয়ে নিজেদের রক্ষা করা উচিত। মানব প্রকৃতি চাপ দেওয়াকে কত ঘৃণা করে। সদনের মনে হল এখানে থেকে লাভ নেই। ন'টা বেজে গেছে, সে ঘরে ফিরে গেল।

৫৫

সন্ধ্যেবেলা গোধূলির আকাশ লাল। মৃদুমন্দ হাওয়া ঢেউয়ের সঙ্গে খেলা করছে। একবার সে যেন করুণ চোখে মুচকি হাসি হাসছে আবার থেকে থেকে কলকণ্ঠে হেসে উঠেছে; তখন তার মুক্তোর মত দাঁত ঝকমক করছে। সদনের সুন্দর ঝুপড়ি আজ ফুল পাতায় সাজানো। দরজায় মাল্লাদের ভিড়। অন্দরে মেয়েরা বসে সোহর (মঙ্গল গীত) গাইছে। উঠোনে খোঁড়া উনুনে বড় বড় হাঁড়ি চাপানো হয়েছে। আজ সদনের নবজাত পুত্রের ষষ্ঠী পুজো। এ তারই উৎসব।

কিন্তু সদনকে উদাস মনে হচ্ছে। সামনের চবুতরায় বসে সে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে আছে। তার মনেও অসংখ্য চিন্তার আনাগোনা, না! ও'রা আসবেন না। ছ'দিন কেটে গেল, আসার হলে কি আর এসে এসে পড়ত না? যদি জানতাম যে ও'রা আসবেন না তবে কাকাকেও এ খবর দিতাম না। তাঁদের কাছে আমি মরে গিয়েছি, তাঁরা আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চায় না। আমার বাঁচায় কি মরায় তাঁদের কিছু আসে যায় না। এ সময়ে লোকে শত্রুর বাড়ীতেও যায়। ভালবেসে না আসুক লোক দেখাতে আসে, নিয়ম রক্ষা করতে আসে—আমি তো জানতে পারতাম সংসারে আমারও কেউ আছে। আচ্ছা না আসুক, এ কাজ চুকে গেলে নিজেই একবার যাবো আর চিরকালের মতো সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে আসবো।

ছেলেটা কি সুন্দর হয়েছে, কেমন লাল লাল ঠোঁট। ঠিক আমার মতন।

হ্যাঁ, তবে চোখ পেয়েছে শাস্তার। আমাকে কেমন পিটপিট করে দেখছিল। বাবার কথা জানি না, তবে মা ওকে দেখলে নিশ্চয় কোলে নেবে। সদনের হঠাৎ মনে এল, যদি আমি মরে যাই তবে কি হবে? বাচ্চাটাকে কে দেখবে? কেউ নেই। না, আমি মরে গেলে বাবার নিশ্চয় ওর উপর দয়া হবে। তিনি এত নিষ্ঠুর হতে পারেন না। দেখি তো পাশ বইয়ে কত টাকা জমা আছে। এখনো হাজার পেরোয় নি। বেশি না, মাসে যদি ৫0 টাকা জমাতে পারি তো বছরে ৬00 টাকা হয়ে যাবে। যেই দু' হাজার হবে, ঘর তৈরী করতে আরম্ভ করব। সামনে দুটো ঘর, ভেতরে পাঁচটা ঘর, দরজার সামনে ঢেউ-খেলানো ঢাকা বারান্দা থাকবে। দুটো ঘর টালি ছাওয়া হলে ভাল হয়। মেজে উঁচু হলে বাড়ীর শোভা বাড়ে। আমি অন্ততঃ পাঁচ ফুট উঁচু মেজে করাব।

এই সব কল্পনা সদনের খুব ভাল লাগছিল। চারপাশে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, এমন সময় রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ী আসছে দেখা গেল। গাড়ীর আলো দুটো বেরালের চোখের মতো জ্বলছে। কে আসে? কাকা ছাড়া আর কে হবে? আমার আর আছেই বা কে? এমন সময় গাড়ী কাছে এসে থামল, মদন সিংহ নামলেন। এ গাড়ীটার পিছনে আর একটা গাড়ী ছিল। সুভদ্রা আর ভামা সেটা থেকে নেমে এল, সদনের দুই বোনও এসেছে। জীতন কোচবাক্স থেকে নেমে আলোয় পথ দেখাতে লাগল।

এতলোক নামতে দেখে সদন বুঝল বাড়ীর লোকেরা এসেছে; কিন্তু সে তাদের কাছে ছুটে গেল না। তাদের মান ভাঙাতে যাবার সময় পার হয়ে গিয়েছে। এখন তার মান করবার পালা এসেছে। চবুতরা থেকে উঠে সে ঝুপড়িতে চলে গেল—যেন কাউকে দেখতেই পায় নি। নিজের মনে সে বলল ওঁরা ভাবছেন তো তাঁরা নেই বলে আমি অক্ষম হয়ে পড়েছি, কিন্তু ওঁরা যেমন আমার কথা ভাবেন না আমিও তেমনি ওঁদের ধার ধারি না।

সদন ঘরে ঢুকে দেখছিল এরা এবার কি করে। এই সময় জীতন দরজার কাছে এসে ডাকতে লাগল। মাল্লারা ছোটাছুটি করতে লাগল। সদন বাইরে এসে দূর থেকেই মাকে প্রণাম করে একপাশে দাঁড়াল।

মদনসিংহ বললেন—তুমি এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছ যেন আমাদের চেনই না। আমার না হোক মায়ের পা ছুঁয়ে আশীর্বাদটা তো নিয়ে নাও।

সদন—আমি ছুঁয়ে দিলে তো আপনাদের ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে।

মদন সিংহ ভাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন—শুনছ তো ওর কথা। আমি তো তোমায় বলেছিলাম ও আমাদের ভুলে গেছে, কিন্তু তুমিই টেনে আনলে। নিজের বাপ মাকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেও ওর দয়া হয় না।

ভামা এগিয়ে এসে বলল—বাবা সদন! বাপের পা ছুঁয়ে প্রণাম করো, তুমি বুদ্ধিমান হয়ে এমন সব কথা বলছো?

সদন আর মান করে থাকতে পারল না। জলভরা চোখে বাপের পায়ে পড়ল। মদন সিংহ কাঁদতে লাগলেন।

এর পর সে মায়ের পায়ে পড়ল। ভামা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করল।

প্রেম, ভক্তি, ক্ষমার কি সুন্দর, দিব্য, আনন্দময় দৃশ্য! মা বাপের হৃদয় প্রেমে পুলকিত হচ্ছে, ছেলের হৃদয়ে ভক্তি তরঙ্গ। এই প্রেম আর ভক্তির নির্মল জ্যোতিতে হৃদয়ের অন্ধকার আলো হয়ে উঠল। মিথ্যাভিমান, লোকলজ্জা বা ভয় রূপী কীটপতঙ্গ সেখান থেকে বেরিয়ে গেছে। সেখানে এখন ন্যায়, প্রেম আর সদ্ব্যবহার এসে বসেছে।

আনন্দে সদনের মাটিতে পা পড়ে না। সে এখন মাল্লাদের কোন না কোন কাজের হুকুম দিয়ে জানাতে চায় এখানে তার কতো খাতির। কেউ চারপাই বের করছে, কেউ বাজারে ছুটছে। মদন সিংহের আনন্দ ধরে না, ভাইয়ের কানে কানে বলেন, সদন তো বেশ চালাক চতুর হয়েছে। আমি তো ভেবেছিলাম সে কোন ক্রমে দিন কাটায় কিন্তু দেখছি সে বেশ জাঁকিয়ে আছে।

এদিকে সুভদ্রা আর ভামা অন্দরে গেল। ভামা অবাক হয়ে চারদিকে দেখছিল। কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! সব জিনিস গুছিয়ে রাখা, এর বোনের গুণ আছে দেখছি।

তারা আঁতুড় ঘরে গেলে শান্তা দুই শ্বাশুড়ীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। ভামা ছেলে কোলে তুলে নিল। তার মনে হ'ল শিশুটি যেন কৃষ্ণের অবতার। আনন্দে চোখের জল পড়তে লাগল।

একটু পরে মদনসিংহের কাছে এসে বলল—আর যাই হোক তুমি খুব রূপবতী বৌ পেয়েছ। ঠিক যেন গোলাপ ফুল আর ছেলে হয়েছে সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার।

মদন—এমন তেজ না থাকলে কি আর মদনসিংহকে টেনে আনাত পারত?

ভামা—বৌ খুব সুশীলা মনে হচ্ছে!

মদন—সেই জন্যেই তো সদন তার জন্যে বাপ মাকে ত্যাগ করেছিল।

সকলেই নিজেদের আলোচনায় মগ্ন, অভাগিনী সুমন কোথায় সে খোঁজ কেউ রাখে না।

সুমন গঙ্গার ধারে সন্ধ্যাহ্নিক করতে গিয়েছিল। ফেরবার সময় দেখল ঝুপড়ির দরজার গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। দরজার কাছে কয়েকজন বসে রয়েছে। পদ্মসিংহকে চিনতে পারল। বুঝে নিল যে সদনের মা বাবা এসে গেছে, পায়ে যেন বেড়ী পড়ল, আর এগোনা হল না। সে বুঝল এখানে তার ঠাঁই আর হবে না, এখানকার সম্বন্ধ চুকে গেল। পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, কোথায় যাবো?

এদিকে মাসখানেক থেকে সুমনের সঙ্গে শান্তার বেশ মন কষাকষি চলছিল। যে শান্তাকে বিধবাশ্রমে দয়া ও শান্তির প্রতিমূর্তি বলে মনে হত, সেই শান্তাই এখন সুমনকে জ্বালাতে কাঁদাতে তৎপর হয়ে উঠেছে। উমেদারি করবার সময় আমরা যত বিনয়ী আর কর্ত্তব্যপরায়ণ হই, কাজ পাবার পরেও যদি সেই রকম থাকি তবে আমরা দেবতুল্য হতে পারি। সে সময় শান্তার সহানুভূতির দরকার ছিল, প্রেমের আকাঙ্খায় তার মন উদার, কোমল, নম্র হয়েছিল, কিন্তু প্রেমরত্ন হাতে পেয়ে হঠাৎ ধনী হওয়া দরিদ্রের মত হৃদয় কঠোর হয়ে পড়েছে। পাছে সদন সুমনের ফাঁদে পড়ে যায় এই ভয় শান্তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। সুমনের পুজোপাঠ, শ্রদ্ধাভক্তি তার চোখে একেবারে মূল্যহীন। শান্তা তাকে পাষণ্ড মনে করত। মাথায় তেল মাখতে আর পরিষ্কার জামা কাপড় পরায় সুমনের আগ্রহের ব্যাপার শান্তার অজানা নয়। সুমনের আচার ব্যবহারের উপর তার কড়া নজর। সদনকে কিছু বলতে হলে সুমন শান্তাকে জানায়। এমন কি খাওয়ার সময়েও শান্তা কোন না কোন ছুতোয় রান্নাঘরে এসে বসত। প্রসবের আগেই সে যে কোন উপায়ে সুমনকে সরাতে চাইছিল কারণ আঁতুড়ে বন্ধ হলে সুমনের উপর নজর রাখতে পারবে না। সব কষ্ট সে সইতে রাজী কিন্তু এ জ্বালা অসহ্য।

সুমন কিন্তু এসব দেখেও দেখেনা, শুনেও শুনে না। যে লোক নদীতে ডুবে যাচ্ছে তারই মতো সে এই কুটোর অবলম্বন ছাড়তে পারে না। সে নিজের জীবনের কোন পথ দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু এখন সদনের বাপ মাকে এখানে দেখে বুঝল যে কুটোর ভরসাও এবার ছাড়তে হল। স্বেচ্ছায় যা করতে পারছিল না, এখন পরিস্থিতি তাই করে দিল।

পা টিপে ধীরে ধীরে সে ঝুপড়ির পিছন দিকে গিয়ে কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করল, দেখি ওরা আমার কথা কিছু বলাবলি করছে কি না। আধ ঘণ্টা ঠায় সে দাঁড়িয়ে রইল। ভামা আর সুভদ্রা নানা কথা বলছে। শেষে ভামা বলল—ওর বোন কি এখন এখানে থাকে না?

সুভদ্রা—থাকবে না তো যাবে কোথায়?

ভামা—দেখতে পাচ্ছি না।

সুভদ্রা—কোন কাজে গেছে হয়তো, ঘরের সব কাজ তো ওই সামলায়।

ভামা—এলে বলে দিয়ো যেন বাইরে কোথাও শোয়। সদন তো ওরই রান্না খেত?

শান্তা আঁতুড় ঘর থেকে বলল—না, এতদিন তো আমিই রাঁধতুম। এখন ও নিজে রেঁধে খায়।

ভামা—তা হলে ও ঘড়া বাসন এসব ছুঁতো। ঘড়া ফেলে দাও, বাসনপত্র আবার ধুয়ে নিতে হবে।

সুভদ্রা—বাইরে কি শোবার জায়গা আছে ?

ভামা—থাক না থাক, ওকে এখানে শুতে দেব না। অমন মেয়েকে বিশ্বাস কি ?

সুভদ্রা—ও আর সে রকম নেই। খুব নিয়ম ধর্ম মেনে চলে।

ভামা—রাখো তোমার নিয়ম ধর্ম মানা মেয়ে। সাত ঘাটের জল খেয়ে আজ ধর্মিষ্ঠা হয়েছেন। দেবতার মূর্তি ভাঙলে আর জোড়া লাগে না। এখন ও দেবী হয়ে গেলেও ওকে বিশ্বাস করি না।

সুমন এর চেয়ে বেশী আর শুনতে পারল না। মনে হল কে যেন লোহা লাল করে বুকে গেঁথে দিচ্ছে। উল্টোমুখো হয়ে অন্ধকারে একদিকে রওনা হল।

গাঢ় অন্ধকার, পথ ভালো করে দেখা যায় না তবু সুমন হোঁচট খেতে খেতে চলল। কোথায় কোন দিকে যাচ্ছে তার জ্ঞান নেই। লাঠির ঘা খাওয়া কুকুরের মতো জ্ঞান হারা হয়ে টলতে টলতে চলেছে। নিজেকে যেন সামলাতে পারছে না। এর পর পায়ে একটা বড় কাঁটা ফুটে গেল। পাটা ধরে বসে পড়ল। আর চলবার শক্তি নেই।

জ্ঞান ফিরে আসা অজ্ঞান হওয়া মানুষের মতো সে এদিক ওদিক অবাক হয়ে দেখছিল। চারিদিক নিস্তব্ধ, ঘোর অন্ধকার। শুধু শেয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছে। এখানে আমি একলা রয়েছি মনে হতেই তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। নিঃসঙ্গতা কাকে বলে সেটা আজ উপলব্ধি হল। এখানে কেউ নেই, শুধু আমি একলা আছি, এটা নিশ্চিত জেনেও সে যেন দেখতে গেল চারপাশে উপরে নিচে আকাশে নানারকম জীব ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভয়ে তার চোখ বন্ধ হয়ে গেল। নির্জনতায় কল্পনার রচনা শক্তি বাড়িয়ে তোলে।

সুমন ভাবতে লাগল, আমি কত অভাগিনী। অপরের কথা দূরে থাক্ একমাত্র পেটের বোন পর্যন্ত এখন আমার মুখ দেখতে চায় না। তাকে আপন করবার মত চেষ্টা করলাম কিন্তু সে আপন হল না। আমার মাথায় যে কলঙ্কের দাগ লেগেছে তা এখন ধুলেও উঠবে না। ওর বা অপরের কি দোষ দেব ? এ সবই আমার কর্মফল। আঃ! পায়ে কি ব্যথাই না লাগছে, এ কাঁটা কি করে বের হবে ? ভেতরে একটা টুকরো ভেঙে রয়ে গিয়েছে, কত রক্ত বের হচ্ছে ? না, আমি কাউকে দোষ দিতে পারি না। কুকাজ করলাম আমি, তার ফল ভুগবে কে ? সুখের লোভের জন্যেই আমার এই দুর্গতি। আমি কতটা অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম যে শুধু ইন্দ্রিয় সুখের জন্যে নিজের সর্বনাশ করে বসলাম ! আমার কষ্ট অবশ্য ছিল। আমি কাপড় গয়নার জন্যে লালায়িত ছিলাম, ভালো খাবারের জন্যে উতলা হতাম, প্রেমের জন্যে পাগল ছিলাম। সে সময় আমার জীবন দুঃখময় মনে হত কিন্তু সে অবস্থাও তো আমার পূর্বজন্মের কর্মফল।

আর অন্য মেয়েরা কি নেই যারা আমার চেয়েও বেশী কষ্ট সহ্য করে নিজেদের আত্মাকে রক্ষা করছে? দময়ন্তীকে কত দুঃখ ভোগ করতে হল, সীতাকে রামচন্দ্র ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলেন আর তাঁকে অনেক বছর বনে নানাপ্রকার কষ্ট সহ্য করতে হয়, সাবিত্রীকে কত কষ্ট সহ্য করতে হল কিন্তু তাঁরা ধর্মে দৃঢ় ছিলেন। অতো দূরের কথার দরকার কি, আমাদের পাড়ায় কত মেয়ে কেঁদে কেঁদে দিন কাটাচ্ছে। অমৌলাতে সেই গয়লা বৌ কত কষ্টেই না ছিল। তার স্বামী বিদেশ থেকে অনেক বছর আসত না, বেচারী উপোস করে পড়ে থাকত। হায়! সুন্দর হওয়ার জন্যেই আমার কপাল পুড়েছে। সৌন্দর্যের অহঙ্কারেই আজ আমার এই দশা।

হে প্রভো! তুমি সৌন্দর্য দিয়ে মনকে চঞ্চল করে তোল কেন? আমি তো সুন্দরী স্ত্রীদের প্রায়ই চঞ্চল দেখতে পাই। হয়তো ঈশ্বর এমন ভাবেই আমাদের পরীক্ষা করেন, অথবা জীবন পথে সৌন্দর্যের বাধা সামনে রেখে আমাদের আত্মাকে বলবান করতে চান। সুন্দরতার আগুনে পুড়িয়ে তাকে আরো উজ্জ্বল করতে চান। কিন্তু হায়! অজ্ঞান বলে আমরা কিছু বুঝতে পারি না। সে আগুন আমাদের পুড়িয়ে মারে, আমাদের বিচলিত করে দেয়।

রক্ত কি করে বন্ধ হবে, কিসের কাঁটা কে জানে। কেউ যদি এসে আমায় ধরে তো চিৎকার করলে কে শুনবে? না, না, এ আমার বিলাস-প্রেমের দোষ নয়, আমার সৌন্দর্যের দোষ নয়, এ সব হচ্ছে আমার অজ্ঞানতার দোষ। ভগবান! আমায় জ্ঞান দাও। তুমিই এখন আমায় উদ্ধার করতে পারো, আমি বিধবাশ্রমে গিয়ে ভুল করেছি। সদনের ঘরে থেকেও ভুল করেছি। মানুষের কাছে আমার উদ্ধারের আশা বৃথা। তারা আমার মতই অজ্ঞান। আমায় উদ্ধার করবে কি করে? আমি তাঁরই শরণ নেব। কিন্তু যাব কি করে? কোন পথে যাব? দু'বছর ধরে ধর্মগ্রন্থ পড়ছি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারি না, ঈশ্বর, কি করে তোমায় পাব? আমায় এ অন্ধকার থেকে মুক্তি দাও। তুমি তো দিব্য পুরুষ, জ্ঞানময়, তোমার প্রকাশে হয়তো এ অন্ধকার দূর হবে। পাতার খড়খড় শব্দ হচ্ছে কেন? কোন জানোয়ার আসছে না তো? কেউ নিশ্চয় আসছে।

সুমন সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার মন দৃঢ় হয়েছে। সে নির্ভয় হয়েছে।

সে অনেকক্ষণ এই সব চিন্তায় ডুবে রইল। এতে সে প্রাণে শান্তি পাচ্ছিল না, আজ পর্যন্ত এভাবে সে কখনো আত্মবিশ্লেষণ করে নি। সংকটে পড়ে তার মনে সদিচ্ছা জেগেছে।

রাত বেশ গভীর। বসন্তের ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। সুমন শাড়ী সামলে নিয়ে হাঁটুতে মাথা রেখে বসল। আজ তার সেদিনের কথা মনে পড়ল। এই ঋতুতে এই সময়ে সে স্বামীর ঘরের দরজায় বসে ভাবছিল কোথায় যাই? সেদিন

সে ক্রোধের আগুনে জ্বলছিল। আজ ভক্তির শীতল ছায়া তাকে আশ্রয় দিয়েছে।

অজান্তেই তার চোখ মুদে এল। সে দেখল স্বামী গজানন্দ মৃগচর্ম ধারণ করে তার সামনে দাঁড়িয়ে করুণাভরা চোখে তাকে দেখছেন। সুমন তাঁর পায়ে পড়ে দীনভাবে বললে—স্বামী আমায় উদ্ধার করুন।

সুমন দেখল স্বামীজী তার মাথায় দয়া করে হাত বুলিয়ে বলছেন—ঈশ্বর এই জন্যেই আমায় তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। বলো, কি চাও, ধন?

সুমন—না মহারাজ, ধন চাই না।

স্বামী—সম্মান?

সুমন—না মহারাজ, সম্মানও চাই না।

স্বামী—ভোগ-বিলাস?

সুমন—মহারাজ ও নাম করবেন না। আমায় জ্ঞান দিন।

স্বামী—আচ্ছা শোন, সত্যযুগে জ্ঞানে মানুষের মুক্তি হত, ত্রেতাতে হত সত্যে, দ্বাপরে হত ভক্তিতে, কিন্তু কলিযুগে শুধু একটাই পথ আছে আর তা হচ্ছে সেবা। এই পথেই চলো, তাতেই তোমার উদ্ধার হবে। যারা তোমার চেয়েও দীন, দুঃখী, দলিত, তাদের কাছেই যাও আর তাদের আশীর্বাদই তোমায় উদ্ধার করবে। কলিযুগে ভগবান এই দুঃখ সাগরে থাকেন।

সুমনের চোখ খুলে গেল। এদিক ওদিক তাকাল, তার নিশ্চিত ধারণা সে জেগেই আছে। এত শীঘ্র স্বামীজী কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। হঠাৎ তার মনে হল সামনে গাছের নিচে স্বামীজী আলো হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। সে উঠে দাঁড়িয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে তাঁর দিকে এগোতে লাগল। তার অনুমান গাছগুলো একশো গজ দূরে আছে, কিন্তু সে যখন একশোর জায়গায় দুশো, তিনশো, চারশো গজ এগিয়ে গেল তবুও সেই গাছ আর তার নিচে আলো হাতে স্বামীজী সেই একশো গজ দূরেই রইলেন।

সুমনের সন্দেহ হল, আমি ঘুমিয়ে নেই তো? আমি স্বপ্ন দেখছি না তো? এতটা হাঁটার পরও তিনি ততো দূরেই রয়ে গেলেন। সে জোরে চেঁচিয়ে বলল—মহারাজ, আমি আসছি, আপনি একটু দাঁড়ান।

সে যেন শুনতে পেল, চলে এসো, আমি দাঁড়িয়ে আছি।

সুমন এগোল, কিন্তু দুশো পা যাবার পর ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল। সেই সব গাছ আর স্বামীজী আগের মতোই একশো গজ দূরে দাঁড়িয়ে।

ভয়ে সুমনের গায়ে কাঁটা দিল। বুক ধড়ফড় করতে লাগল, পা থরথর করে কাঁপতে লাগল। চেঁচাতে গেল, গলা দিয়ে আওয়াজ বের হল না।

সুমন সাবধানে বিচার করে জানতে চাইছিল এর মধ্যে কি রহস্য আছে, নাকি এটা একটা ভুতুড়ে কাণ্ড; কিন্তু কোন অজ্ঞাত শক্তি তাকে সেদিকে টেনে নিয়ে

চলেছে যেন তার ইচ্ছাশক্তি মনকে সরিয়ে সেই রহস্যের পিছনে ছুটে চলেছে।

সুমন আবার এগোল। এবার সে শহরের কাছে এসে পড়েছে। সে দেখল স্বামীজী এক ছোট ঝুপড়িতে ঢুকে গেলেন আর গাছপালা সব অদৃশ্য হয়ে গেল। সুমন বুঝল এটা তাঁর কুটী। সে বেশ নিশ্চিন্ত হল। এবার স্বামীজীর সঙ্গে নিশ্চয় দেখা হবে। তাঁর কাছেই রহস্য ভেদ হবে।

সে কুটীর দরজায় দাঁড়িয়ে বলল—স্বামীজী, আমি সুমন।

কুটী গজানন্দেরই বটে তবে তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন। সুমন কোন উত্তর পেল না।

সুমন সাহস করে কুটীর মধ্যে উঁকি মেরে দেখল। আগুন জ্বলছে আর গজানন্দ কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। সুমন অবাক হল; এই তো এলেন, এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন আর লণ্ঠনটাও কোথায় গেল? জোরে ডাকল—স্বামীজী।

গজানন্দ উঠে বসলেন আর বিস্মিত চোখে সুমনকে দেখতে লাগলেন। মিনিট খানেক ভালো করে দেখে বললেন—কে? সুমন?

সুমন—হ্যাঁ, মহারাজ, আমি।

গজানন্দ—আমি এইমাত্র তোমায় স্বপ্নে দেখছিলাম।

সুমন চমকে উঠে বলল—আপনি তো এখনই কুটীতে এলেন।

গজানন্দ—আমি তো অনেকক্ষণ কুটীতে শুয়ে আছি। আমি তো কুটী থেকে বাইরে যাই নি। এইমাত্র স্বপ্নে তোমাকেই দেখছিলাম।

সুমন—আর আমি যে আপনারই পিছনে গঙ্গার ধার থেকে চলে আসছি। আপনি লণ্ঠন হাতে আমার আগে আগে চলে আসছিলেন।

গজানন্দ মৃদু হেসে বললেন—তোমার ভুল হয়েছে।

সুমন—ভুল হলে আমি না জেনে শুনে কি করে এখানে পৌঁছে গেলাম? আমি তো নদীর ধারে একলা বসে ভাবছিলাম কি করে আমার উদ্ধার হবে? আমি ভগবানের কাছে মিনতি করছিলাম যে আমায় দয়া করো, আমায় নাও। সেই সময় আপনি এলেন আর আমায় সেবা ধর্মের উপদেশ দিলেন। আপনার কাছে কত কথা জানবার ছিল কিন্তু আপনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। একটু পরে আমি দেখলাম আপনি লণ্ঠন হাতে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। বস, আপনার পিছনে ছুটলাম। রহস্যটা বুঝতে পারলি না। কৃপা করে বুঝিয়ে দিন।

গজানন্দ—হয়তো সত্যিই এমন হয়েছে, কিন্তু সে সব কথা তুমি এখন বুঝতে পারবে না।

সুমন—কোন দেবতা নয় তো? যিনি আপনার বেশ ধরে আমায় আপনার আশ্রয়ে নিয়ে এলেন?

গজানন্দ—এও সম্ভব। তুমি যা সব বললে আমি স্বপ্নে তাই দেখছিলাম—

আর তোমায় সেবা ধর্মের উপদেশ দিচ্ছিলাম। সুমন, তুমি আমায় ভালোভাবেই জানো। আমার হাতে তুমি অনেক দুঃখ পেয়েছ, অনেক কষ্ট সয়েছ। তুমি তো জানো আমি কতো নীচ প্রকৃতির এক অধম জীব। কিন্তু নিজের সেই নীচতাব কথা মনে পড়লে আমার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তুমি ছিলে আদরের যোগ্য, আমি তোমায় অনাদর করেছি। এই হচ্ছে আমাদের দুরবস্থার, আমাদের দুঃখের মূল কারণ। ঈশ্বর কবে সেই দিন দেবেন যেদিন আমাদের সমাজ স্ত্রীলোকের আদর করবে। মেয়েরা ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে, গয়না না পরে, আধপেট শুকনো রুটি খেয়ে কুঁড়ে ঘরে থেকে, মজুরের কাজ করে, সব কষ্ট সহ্য করেও সুখে জীবন কাটাতে পারে। শুধু ঘরে সমাদর চাই, প্রেম চাই। প্রেম ভালবাসা না পেলে মেয়েরা মহলে থেকেও সুখী হয় না। আমি এসব জানতাম না। অজ্ঞানতার, অবিদ্যার অন্ধকারে পড়েছিলাম। নিজেকে উদ্ধার করবার উপায় আমার হাতে ছিল না। আমার না ছিল জ্ঞান, না ছিল বিদ্যা, না ছিল ভক্তি, না ছিল কর্মসামর্থ্য। আমি আমার বন্ধুদের সেবা করব স্থির করলাম। আমার পক্ষে এই পথই সবচেয়ে সোজা। তখন থেকে আমি যতটা সম্ভব এই পথেই চলছি। আমি বুঝতে পারছি আত্মোদ্ধারের বিভিন্ন পথ শুধু নামেই পৃথক। আমি এই পথেই শান্তি পেয়েছি আর তোমার জন্যেও আমি এই পথই সবচেয়ে ভালো মনে করি। আমি তোমায় আশ্রমে দেখেছি, সদনের ঘরেও দেখেছি, তুমি সেবাব্রতে মগ্ন ছিলে! তোমার জন্যে ঈশ্বরের কাছে সেই প্রার্থনাই করি। তোমার হৃদয়ে দয়া, প্রেম, সহানুভূতি আছে, আর সেবা ধর্মের জন্যে এসব হচ্ছে মুখ্য। তোমার জন্যে সে দরজা খোলা, তোমায় ডাকছে। তুমি ঐ পথেই যাও, ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করবেন।

গজানন্দের মুখমণ্ডলে বিমল জ্যোতির প্রকাশ দেখে সুমনের মনে এক অভূতপূর্ব শ্রদ্ধা ভক্তির ভাব উদয় হল। তার মনে হল এঁর প্রাণে কত প্রেম। আমি এমন লোককে অবহেলা করেছি। এঁর সেবা করলে জীবন সফল হয়ে যেত। বলল—মহারাজ, আপনি আমার কাছে ঈশ্বর, আপনাকে দিয়েই আমার উদ্ধার হতে পারে। আমার দেহ-মন আমি আপনার সেবায় অর্পণ করছি। এই প্রতিজ্ঞা আমি আগে একবার করেছিলাম কিন্তু অজ্ঞান ছিলাম বলে তা রাখতে পারি নি। সে প্রতিজ্ঞা আমার হৃদয় থেকে যায় নি। আজ আমি সত্যসত্যই খোলা মনে এই প্রতিজ্ঞা করছি। আপনি একবার আমার হাত ধরেছিলেন ; যদিও আমি এখন পতিতা তবু আপনিই উদার মনে আমায় ক্ষমা করুন আর আমায় সৎপথে নিয়ে চলুন।

সুমনের চেহারায় প্রেম ও পবিত্রতার আভা দেখে গজানন্দের মন ব্যাকুল হল। যে ভাব বছরের পর বছর চাপ ছিল আজ জেগে উঠল। সুখ আর আনন্দের ভাবনা চিন্তা নতুন করে দেখা দিল। নিজের জীবন শুষ্ক, নীরস,

নিরানন্দ বোধ হতে লাগল। এই সব কল্পনায় তিনি ভয় পেলেন। যদি এসব চিন্তা মনে শিকড় গেড়ে বসে, তবে তো আমার সংযম, বৈরাগ্য আর সেবাব্রত এই প্রবাহে খড়কুটোর মত ভেসে যাবে। তিনি বললেন—শুনেছো কি এখানে একটা অনাথালয় খোলা হয়েছে?

সুমন—হ্যাঁ, এ সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনেছিলাম।

গজানন্দ—এই অনাথালয়ে বিশেষ করে বেশ্যাদের ঘরের ছোট মেয়েরা রয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ জন মেয়ে আছে।

সুমন—এ সব আপনারই উপদেশের ফল।

গজানন্দ—না, তা নয়। এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব হচ্ছে পণ্ডিত পদ্মসিংহের। আমি তো শুধু তাঁর সেবক হয়ে কাজ করেছি। এই অনাথালয়ের জন্য একটা পবিত্র আত্মা দরকার, আর তুমিই সেই পবিত্র আত্মা। আমি অনেক খুঁজেছি কিন্তু এখন কোন মহিলা পেলাম না যিনি একাজ ভালবেসে করবেন, মেয়েদের মায়ের মতো করেই পালন করবেন। ওদের অসুখ হলে সেবা করবেন, তাদের ঘা-পাঁচড়া, মল মূত্র দেখে ঘৃণা করবেন না। নিজের ব্যবহারে তাদের মনে ধর্মভাব সঞ্চার করবেন যেন তাদের পুরনো কুসংস্কার কেটে যায় আর তাদের জীবন সুখে কাটে। বাৎসল্য না থাকলে এ উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। ঈশ্বর তোমায় জ্ঞান আর বিবেক দিয়েছেন, তোমার হৃদয়ে দয়া আছে, করুণা আছে, ধর্ম আছে আর তুমিই এই কর্ত্তব্যের ভার সামলাতে পারো। আমার প্রার্থনা মঞ্জুর তো?

সুমনের চোখে জল এল। তার সম্বন্ধে একজন জ্ঞানী সাধুর এ রকম ধারণা হয়েছে, এই ভেবেই তার চিত্ত বিহ্বল হয়ে গেল। স্বপ্নেও তার আশা ছিল না যে তাকে এতটা বিশ্বাস করা যাবে আর সেবা করবার মহান গৌরব সে পাবে। নিশ্চিত বুঝল যে পরমাত্মাই গজানন্দকে এই প্রেরণা দিয়েছেন। একটু আগেও সে যদি কোন ছেলেকে কাদা ঘাঁটতে দেখত তো তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিত, কিন্তু গজানন্দ তাকে বিশ্বাস করে সেই ঘৃণাকে দূর করে আর মনে প্রেমসঞ্চার করে দিয়েছেন। আমাদের যে বিশ্বাস করে আমরা তাকে কখনও নিরাশ করতে চাই না, তার কথায় অসাধ্য সাধন করতে এগিয়ে আসি। বিশ্বাসে বিশ্বাস জন্মায়।

সুমন অত্যন্ত বিনীতভাবে বলল—আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনারা আমায় এই কাজের যোগ্য মনে করছেন। অপরের কোন কাজে লাগবো, অপরের সেবা করবো, এই হচ্ছে আমার পরম কামনা। আপনার নির্দিষ্ট আদর্শ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবো না তবে আপনার আদেশ যথাসাধ্য পালন করব।

এই বলে সুমন মাথা নিচু করল। তার চোখে জল, তার কথায় যা সে বলতে পারে নি সেটা মুখের ভাব জানিয়ে দিল। যেন সে বলছে, আপনার

অসীম দয়া যে আপনি আমার এত বিশ্বাস করছেন। কোথায় আমার মতো নীচ, দুশ্চরিত্রা আর কোথায় এই মহান পদ! তবে ঈশ্বরের দয়া হলে আপনাকে এই বিশ্বাস করার জন্যে অনুতাপ করতে হবে না।

গজানন্দ বললেন—আমিও তোমার কাছে এই আশাই করছিলাম। ভগবান তোমার কল্যাণ করুন।

এই বলে গজানন্দ উঠে দাঁড়ালেন। ভোরের আলো ফুটছে, পাপিয়ার কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। তিনি কমণ্ডলু হাতে গঙ্গাস্নান করতে চলে গেলেন।

সুমন কুটী থেকে বাইরে এসে দেখতে লাগল, যেন সবে ঘুম থেকে উঠে এসেছে। এ সময় কত সুন্দর, কত শান্তিময়, কত উৎসাহে ভরা! তার ভবিষ্যৎ জীবন কি এমনই হবে? তার জীবনেও কি প্রভাত আসবে? তাতেও কি কখনো উষার ঝলক দেখা যাবে? কখনও সূর্যোদয় হবে? হ্যাঁ, হবে, আর এই সুন্দর শান্তিময় প্রভাত হচ্ছে আগামী দিনের জীবনের প্রভাত।

৫৬

এক বছর কেটে গেছে। পণ্ডিত মদনসিংহ প্রথমে তীর্থযাত্রা করবেন বলে সব ঠিক করে বলেছিলেন। মনে হচ্ছিল সদন ঘরে ফিরলেই একদিনও থাকবেন না, সোজা বদরীনাথ পৌঁছে দম নেবেন। কিন্তু যবে থেকে সদন এসে গেল তিনি ভুলেও আর তীর্থযাত্রার নাম নিলেন না। নাতিকে কোলে নিয়ে প্রজাদের হিসাবপত্র দেখেন, খেতখামারের দেখাশোনা করেন। মায়ার বন্ধন আরো চেয়ে ধরেছে। হ্যাঁ, ভামা এখন কিছু নিশ্চিন্ত হয়েছে। পাড়াপড়শীদের সঙ্গে গালগল্পের দায়িত্ব নিজের হাতেই রেখেছে। অন্য সব কাজের ভার শান্তার উপর ছেড়ে দিয়েছে।

পণ্ডিত পদ্মসিংহ ওকালতি ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি এখন মিউনিসিপ্যালিটির প্রধান কর্মচারী হয়েছেন। এ কাজ তাঁর খুব মনোমত। শহরের দিন দিন উন্নতি হতে লাগল। এক বছরের মধ্যে কয়েকটা নতুন রাস্তা, নতুন বাগান তৈরী হয়ে গেল। এখন তাঁর ইচ্ছে এক্কা আর গাড়ীওয়ালাদের জন্যে শহরের বাইরে একটা পাড়া তৈরী করাবেন। শর্মাজীর পুরোনো বন্ধুদের কয়েকজন বিরোধীপক্ষে গিয়েছেন আবার আগের বিরোধী পক্ষের অনেকের সঙ্গে মিল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মহাশয় বিঠলদাসের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা দিন দিন বাড়ছিল। তাঁর বড় ইচ্ছে যে বিঠলদাসকে মিউনিসিপ্যালিটির একটা বড় পদে বসাবেন কিন্তু

বিঠলদাস রাজী হলেননা। তিনি তাঁর নিঃস্বার্থ কর্মের প্রতিজ্ঞা ভাঙতে চান না। তাঁর ধারণা বাইরে থেকে এর যতটা ভালো করা যাবে অধিকারী হতে ততটা পারা যাবে না। তাঁর বিধবাশ্রমের দিন দিন উন্নতি হচ্ছে আর মিউনিসিপ্যালিটি থেকেও বিশেষ সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে। আজকাল তিনি কৃষকদের সহায়তার জন্যে একটা কোষ স্থাপিত করবার উদ্যোগ করছেন যেখান থেকে চাষীদের বীজ ও নাম মাত্র সুদে টাকা ধার দেওয়া যেতে পারবে। এ সৎকাজে সদনবাবু বিঠলদাসের ডান হাত হয়ে পড়েছে।

সদনের গাঁয়ে মন বসল না। শান্তাকে সেখানে রেখে সে গঙ্গাতীরের ঝুপড়িতে ফিরে এসেছে আর নিজের ব্যবসা খুব বাড়িয়ে চলেছে। এখন তার পাঁচটা নৌকা চলছে, প্রতি মাসে কয়েক শো টাকা লাভ হচ্ছে। এখন সে একটা স্টীমার কেনবার কথা ভাবছে।

স্বামী গজানন্দ প্রায়ই গ্রামে গ্রামে ঘোরেন, গরীব লোকের মেয়েদের উদ্ধারের জন্যে তিনি জীবন সমর্পণ করেছেন। শহরে এলে এখন দু'একদিনের বেশী থাকেন না।

৫৭

কার্তিক মাস। পদ্মসিংহ সুভদ্রাকে গঙ্গাস্নান করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ফেরবার সময় তাঁরা অলইপুরের পথে আসছিলেন। গাড়ির জানালা দিয়ে সুভদ্রা বাইরে দেখছে আর ভাবছে এমন নির্জন স্থানে লোক কি করে বাস করে। তাদের এখানে থাকতে কেমন লাগে। এই সময় সে একটা সুন্দর বাড়ী দেখতে পেল। ফটকে মোটা অক্ষরে লেখা—সেবাসদন।

সুভদ্রা শর্মাজীকে জিজ্ঞাসা করল—এই কি সুমন বাঈ-এর সেবাসদন?

শর্মাজী উদাস ভাবে বললেন—হ্যাঁ। তিনি পস্তাচ্ছিলেন, এপথে এলাম কেন? নিশ্চয় এখন এই আশ্রম দেখতে চাইবে। আমাকেও যেতে হবে। মহা ফ্যাসাদে পড়লাম। শর্মাজী একদিনও সেবাসদন দেখতে আসেন নি। গজানন্দ অনেকবার তাঁকে আনবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তিনি যে কোন উপায়ে এড়িয়ে গিয়েছেন। তিনি সব কিছু করতে পারেন কিন্তু সুমনের সামনে আসা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। পার্কে কাঁকণ ফেরৎ দেবার সময় সুমন তাঁকে যে সব কথা বলেছিল তা তিনি কখনও ভুলতে পারেন নি। সে সময় তাঁর লজ্জা হয়েছিল বলেই তিনি সুমনের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মন থেকে এ চিন্তা

কখনও দূর হত না যে স্ত্রীলোক এত সাধ্বী সচ্চরিত্রা হতে পারে সে শুধু আমার কুসংস্কারের জন্যেই কুপথগামিনী হল—আমিই তাকে কুঁয়োয় ঠেলে ফেলে দিয়েছি।

সুভদ্রা—গাড়ীটা একটু থামাও, এটা দেখবো।

পদ্মসিংহ—আজ অনেক দেরী হবে। অন্য সময় দেখো।

সুভদ্রা—এক বছর ধরে তো আসবো বলছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত আসা হয় নি, এখান থেকে ফিরে গেলে আবার কবে সুযোগ মিলবে কে জানে।

পদ্মসিংহ—তুমি নিজেই আসো নি। কেউ কি আটকে রেখেছিল?

সুভদ্রা—আচ্ছা, আগে না হয় আসি নি। এখন তো এসেছি। এখন কেন যাচ্ছ না?

পদ্ম—যেতে কি আমি আপত্তি করছি. শুধু দেরী হয়ে যাবার ভয় আছে। নটা বাজে।

সুভদ্রা—এমন কি দেরী হবে, দশ মিনিটেই ফিরে আসবো।

পদ্ম—জেদ করা তোমার স্বভাব। বলছি এখন আমার দেরী হয়ে যাবে, তা মানছ না।

সুভদ্রা—ঘোড়াকে একটু জোরে ছুটিয়ো, তা হলে ঠিক পুষিয়ে যাবে।

পদ্ম—বেশ, তুমি যাও। সন্ধ্যার আগে যখন ইচ্ছে হবে ফিরো। আমি গাড়ী রেখে যাচ্ছি। পথে আমি অন্য গাড়ী ভাড়া করে যাবো।

সুভদ্রা—তার দরকার কি? তুমি এখানেই বসে থাকো। আমি এখনই ফিরে আসবো।

পদ্ম—(গাড়ী থেকে নেমে) আমি যাচ্ছি। তোমার যা ইচ্ছে তাই করো।

এভাবে এড়িয়ে যাবার কারণ সুভদ্রা বুঝতে পারল। সে 'জগত' পত্রিকায় এই সেবাসদনের প্রশংসা অনেকবার পড়েছে। পণ্ডিত প্রভাকর রাও আজকাল সেবাসদনকে ভালো চোখে দেখেন। তাই সুভদ্রার এই আশ্রমের উপর একটা টান হয়েছিল আর সুমনের প্রতি একটা ভক্তির ভাব জেগেছিল। সুমনকে এই নূতন পরিস্থিতিতে সে দেখতে চায়। এতটা অধঃপতনের পরেও সে এমন বিদুষী হয়েছে যে কাগজে তার প্রশংসা ছাপা হয়েছে। এই দেখে সে অবাক হত। তার ইচ্ছে হল পণ্ডিতজীকে বেশ একচোট শোনায় কিন্তু সইস দাঁড়িয়ে ছিল বলে বলা হল না। গাড়ী থেকে নেমে আশ্রমে ঢুকে গেল।

বারান্দায় যেতেই একটি মেয়ে ভিতরে গিয়ে সুমনকে তার আসবার খবর দিল আর একটু পরেই সুমনকে আসতে দেখা গেল। কেশহীনা। আভূষণ বিহীনা সুমনকে দেখে সুভদ্রা হতচকিত হয়ে গেল, তার সেই কোমলতা নেই, সেই চপলতা নেই, চোখে ঠোঁটে হাসির আভাস নেই। রূপ লাবণ্যের বদলে পবিত্রতার জ্যোতি বের হচ্ছে।

সুমন কাছে এসে সুভদ্রার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে সজলনয়নে বলল—বহুজী, আমার বহুভাগ্য যে এখানে আপনার দেখা পেয়েছি।

সুভদ্রার চোখে জল এল। সে সুমনকে তুলে জড়িয়ে ধরে গদগদস্বরে বলল বোন, আসবার ইচ্ছে তো হতো খুব কিন্তু কুঁড়েমির জন্যে আসা হয়ে ওঠে নি।

সুমন—শর্মাজীও এসেছেন না আপনি একলা এলেন ?

সুভদ্রা—সঙ্গেই এসেছিলেন কিন্তু তার দেরী হয়ে যাচ্ছে বলে অন্য গাড়ী করে চলে গেলেন।

সুমন উদাসভাবে বলল—দেরী আর কতই হত, উনি এখানে আসতেই চান না। আমার দুর্ভাগ্য। দুঃখ শুধু এই জন্যে যে আশ্রমের তিনি জন্মদাতা শুধু আমার জন্যেই সেটার উপর তাঁর এত ঘৃণা। মনে বড় সাধ ছিল আপনারা দুজনে একসঙ্গে এখানে আসবেন। অর্ধেক আজ পূর্ণ হল, বাকীটাও কোন না কোন দিন পূর্ণ হবে। সেই দিন হবে আমার উদ্ধারের দিন।

এই বলে সুমন সুভদ্রাকে আশ্রম দেখাতে লাগল। আশ্রমে পাঁচটা বড় ঘর। প্রথম ঘরে প্রায় ত্রিশ জন মেয়ে বসে কিছু পড়ছিল। তাদের বয়স ১২ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে। অধ্যাপিকা সুভদ্রাকে দেখেই তাঁর কাছে এসে হাত মেলালেন। সুমন দুজনের পরিচয় করিয়ে দিল। সুভদ্রা শুনে অবাক হল যে ঐ মহিলা মিস্টার রুস্তম ভাই ব্যারিস্টারের সুযোগ্যা পত্নী। প্রতিদিন আশ্রমে এসে বড়ো মেয়েদের দু ঘণ্টা পড়িয়ে যান।

দ্বিতীয় ঘরেও প্রায় অতো মেয়েই ছিল। বয়স ৮ থেকে ১২ বছরের মধ্যে হবে। তাদের মধ্যে কেউ কাপড় কাটছে। কেউ সেলাই করছে আর কেউ পাশের মেয়েকে চিমটি কাটছে। এখানে কোন অধ্যাপিকা ছিল না। এক বুড়ো দরজী কাজ করছিল। সুমন মেয়েদের তৈরী কুর্তা, জ্যাকেট ইত্যাদি সুভদ্রাকে দেখাল।

তৃতীয় ঘরে ১৫-২০জন ছোট ছোট মেয়ে ছিল। কেউ পাঁচবছরের বেশী নয়। তাদের মধ্যে কেউ পুতুল খেলছে, কেউ দেয়ালে টাঙানো ছবি দেখছে। সুমন নিজে এখানকার অধ্যাপিকা।

সুভদ্রা এখান থেকে সামনের বাগানে এসে মেয়েদের লাগানো গাছপালা দেখতে লাগল। সেখানে মেয়েরা আলু কপির ক্ষেতে জল দিচ্ছে। তারা সুভদ্রাকে একটা সুন্দর ফুলের তোড়া উপহার দিল।

খাবার ঘরে কয়েকজন মেয়ে খাচ্ছিল সুমন মেয়েদের তৈরী আচার, মোরব্বা ইত্যাদি সুভদ্রাকে দেখাল।

সুভদ্রা এখানকার সুবন্দোবস্ত, শান্তি আর মেয়েদের আচার ব্যবহার দেখে খুব খুশী হল। ভাবল, এতবড় আশ্রম একা সুমন কি করে চালায়! আমি

তো কখনো পারতাম না। কোনও মেয়েকে অপরিষ্কার বা বিষণ্ন দেখা গেল না।

সুমন বলল—এই ভার আমি নিজের ঘাড়ে নিয়েছি বটে, তবে একে সামলাবার শক্তি আমার নেই। সকলের উপদেশ পরামর্শই আমার ভরসা। আপনি যে সব ত্রুটি দেখছেন, অনুগ্রহ করে তা বলে দিন। এতে আমার উপকার হবে।

সুভদ্রা হেসে বলল—বোন, আমায় লজ্জা দিয়ো না। যা দেখলাম তাতে আমি অবাক হয়ে গেছি। তোমায় আর কি পরামর্শ দেব? বস, শুধু এই বলতে পারি যে এত ভাল বন্দোবস্ত বিধবাশ্রমেও নেই।

সুমন—আপনি বাড়িয়ে বলেছেন।

সুভদ্রা—না, সত্যি বলছি। আমি যা শুনেছিলাম তার চেয়েও ভালো দেখছি। আচ্ছা, বল তো, এই মেয়েদের মায়েরা কি এদের দেখতে আসে?

সুমন—আসে; তবে মেলা মেশাটা আমি যথাসম্ভব কম করবার চেষ্টা করি।

সুভদ্রা—আচ্ছা, এদের কোথায় বিয়ে দেবে?

সুমন—সেটা তো কঠিন সমস্যা। আমার কর্ত্তব্য হচ্ছে এদের গৃহিনীর যোগ্য করে তৈরী করে দেওয়া। সমাজ তাদের গ্রহণ করবে কিনা, তা আমি বলতে পারি না।

সুভদ্রা—ব্যারিস্টার সাহেবের স্ত্রীর দেখছি একাজে খুব টান।

সুমন—সত্যি বলতে কি, উনিই আশ্রমের কর্ত্রী। আমি তো শুধু তাঁর কথামতো কাজ করে যাই।

সুভদ্রা—কি বলবো, আমার কোন যোগ্যতা নেই, না হলে আমিও এখানে কিছু কাজ করতাম।

সুমন—আসবো আসবো করে তো আপনি আজ এলেন, তাও আবার শর্মাজীকে অসন্তুষ্ট করে। শর্মাজী আপনাকে আবার এখানে আসতেই দেবেন না।

সুভদ্রা—না, আসছে রবিবার আমি নিশ্চয় তাঁকে ধরে নিয়ে আসবো। হ্যাঁ আমি মেয়েদের পান সাজা আর রান্না শেখাবো।

সুমন—(হেসে) এ কাজে অনেক মেয়েকে আপানার চেয়ে নিপুণ দেখতে পাবেন।

এই সময় দশটা মেয়ে সুন্দর কাপড় পরে এল আর সুভদ্রার সামনে দাঁড়িয়ে সুমধুর স্বরে গান ধরল :—

হে জগত পিতা, জগত প্রভু,
মুঝে আপনা প্রেমে ঔর প্যার দে।

তেরি ভক্তিমে লগে মন মেরা,
বিষম কামনা কো বিসার দে।

হে জগৎ পিতা, তোমার প্রেম, ভালবাসা আমায় দাও। বিষয় কামনা ভুলে যেন তোমায় ভক্তি করতে সদাই মন থাকে।

সুভদ্রা গান শুনে সন্তুষ্ট হয়ে মেয়েদের পাঁচ টাকা পুরস্কার দিল।

যাবার সময় সুমন করুণ স্বরে বলল—আসছে রবিবার আপনার প্রতীক্ষা করব।

সুভদ্রা—আমি নিশ্চয় আসবো।

সুমন—শান্তা ভাল আছে তো?

সুভদ্রা—হ্যাঁ, চিঠি পেয়েছি। সদন তো এখানে আসে নি?

সুমন—না, তবে মাসে মাসে ২ টাকা করে চাঁদা পাঠিয়ে দেন।

সুভদ্রা—আচ্ছা, আপনি বসুন, আমি তাহলে আজ উঠি।

সুমন—আপনার আসার জন্যে কৃতার্থ হয়েছি। আপনার প্রেম, আপনার কার্যকুশলতা, কতো বিষয়ের কথা বলি? আপনি প্রকৃতই স্ত্রীসমাজের আদর্শ। (সজল চোখে) আমি তো নিজেকে আপনার দাসী মনে করি। যতদিন বাঁচবো আপনাদের যশ গাইব। আমার হাত ধরে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচিয়েছেন। পরমাত্মা সদাই আপনাদের কল্যাণ করুণ।